স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে (নির্বাচিত) ইউরোপ প্রসঙ্গ

পি এইচ. ডি. ডিগ্রি উপাধি লাভের জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. গোপা দত্ত

সহ-তত্ত্বাবধায়ক

ড. সৌমিত্র বসু

গবেষক

স্বপন বর্মন

নিবন্ধভুক্তি সংখ্যা: A00BE1200516

বর্ষ: ২০১৫ - ২০১৬

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে

(নির্বাচিত) ইউরোপ প্রসঙ্গ

Certified that the Thesis entitled

“স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে (নির্বাচিত) ইউরোপ প্রসঙ্গ”

Submitted by me for award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under Supervision of Ex. Professor Dr. Gopa Datta, Department of Bengali, Jadavpur University and Co-Supervision Ex. Professor Dr. Soumitra Basu, Department of Drama, Rabindra Bharati University And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Countersigned by the

Gopa Datta 28.1.2022
Supervisor

Ex. Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Co-Supervisor 27/1/2022

DR. SOUMITRA BASU
Sisir Kumar Bhaduri Professor
[illegible], Dept. of Drama
Rabindra Bharati University

Swapan Barman
Candidate 28/1/22

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমাদের গবেষণার বিষয় "স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে (নির্বাচিত) ইউরোপ প্রসঙ্গ"। বিষয়টিতে আমার স্নাতকোত্তর পড়ার সময়েই কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার আগ্রহান্বিত করেন অধ্যাপক গোপা দত্ত ভৌমিক মহাশয়া। পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধ্যাপক ড. গোপা দত্ত ভৌমিক মহাশয়া ও অধ্যাপক ড. সৌমিত্র বসু মহাশয়ের নির্দেশনায় অভিসন্দর্ভটি রচিত হয়। গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই কাজটির সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁরা শুধু আমাকে নির্দেশ ও উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, সমালোচকের দৃষ্টিতে ভুল-ত্রুটির উল্লেখ করে আমাকে সদা সচেতন করে দিয়েছেন। কোনও কোনও বিষয়ে মত-পার্থক্য হওয়া সত্ত্বেও সহিষ্ণুতার সঙ্গে সেই পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়ে আমার প্রতি তাঁরা আস্থা প্রকাশ করেছেন এবং অভিসন্দর্ভটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে সাহায্য করেছেন। আমার গবেষণার প্রতি তাঁদের আগ্রহ ও আমার প্রতি তাঁদের স্নেহের কথা স্মরণ করে তাঁদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। গৌরমোহন শচীন মণ্ডল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অতিথি অধ্যাপক ড. নির্মাল্যকুমার ঘোষ মহাশয় গবেষণা কর্মের পরিকল্পনার সময়কাল থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজটি সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছেন। গবেষণা কর্মের পরিকল্পনা সম্পর্কে দীর্ঘ সুচিন্তিত অভিমত জানিয়ে আমাকে বহুবিধ উপকৃত করেছেন। বিভাগীয় প্রধান ড. রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা মহাশয় এবং ড. অন্যন্যা বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. বরেন্দু মণ্ডল, অধ্যাপক ড. জয়দীপ ঘোষ মহাশয়ের নিরন্তর উৎসাহ ও অনুসন্ধান আমাকে কর্তব্য সচেতন রেখেছে।

এছাড়াও অধ্যাপক ড. দেবদীপ ধীবর, অধ্যাপক ড. কৃষ্ণকুমার সরকার, অধ্যাপক সাহেব হেমব্রম এবং আরও অনেকে আমার কাজটি সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছেন। এঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আমার পূজনীয় পিতা বিষ্ণু বর্মন এবং মাতা ভারতী বর্মন ও দিদি অনিন্দিতা মণ্ডলের নিরন্তর প্রেরণা আমার অনেক পরিশ্রমের ভার লাঘব করেছে। আমার

সহধর্মিনী সীমা রায়ের তাগিদ কাজটি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অতৃপ্ত মনকে কর্মমুখী রেখেছে। এছাড়াও আমার অনেক বন্ধু ও আমার আত্মীয়ের প্রীতিদীপ্ত প্রসন্ন মুখ আমার কর্মপথকে সুগম করেছে। এত হিতৈষীর স্নেহ-প্রীতি-সহৃদয়তার কথা স্মরণ করে আনন্দিত বোধ করছি।

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের সহৃদয়তা ও সহয়তার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। এছাড়াও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার থেকে অশেষ সাহায্য পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট কর্মীগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে, বিভাগীয় গ্রন্থাগারের মধ্যমণি আইভি আদক এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বিদ্যুৎ মণ্ডল যাঁরা আনন্দের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

স্বপন বর্মন

<u>সূচিপত্র</u>

পৃষ্ঠা সংখ্যা

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়: **ঔপনিবেশিক কালপট**

বাঙালির সঙ্গে ইউরোপীয় সংযোগ সাধন ২ - ৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায়: **বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী**

বাংলা কথাসাহিত্যে ইউরোপীয় হাতছানি ৪৫ - ৯৬

তৃতীয় অধ্যায়: **রবীন্দ্র সমসাময়িক বাংলা কথাসাহিত্য**

অনুবাদের আস্বাদনে ইউরোপ ৯৭ - ১২৬

চতুর্থ অধ্যায়: **কল্লোলযুগের বাংলা কথাসাহিত্য**

মনস্তাত্ত্বিকতায় ইউরোপ ১২৭ - ১৬২

পঞ্চম অধ্যায়: **প্রমথ চৌধুরী ও প্রভাতকুমার**

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ইউরোপ ১৬৩ - ২১০

ষষ্ঠ অধ্যায়: **ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরাম**

ব্যঙ্গ-কৌতুকে ইউরোপ ২১১ - ২৩২

সপ্তম অধ্যায়: **দিলীপকুমার রায়** ২৩৩ - ২৯২

অষ্টম অধ্যায়: **অন্নদাশঙ্কর রায়** ২৯৩ - ৩২৭

উপসংহার ৩২৮ - ৩৩০

গ্রন্থপঞ্জি ৩৩১ - ৩৪২

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্য সমাজের নবজাগরণের মূলে আছে 'ইউরোপ'। চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ইতালিতে সূচনা হয়ে পরবর্তীকালে জার্মানীতে রিফরমেশন, ফরাসি বিপ্লব হয়ে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব, ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। এই সময় ইউরোপ বিভিন্ন মহাদেশের উপর আধিপত্য বিস্তারে মনোযোগী হয়, বিশেষ করে এশিয়া ভূখণ্ডের জাতিগণের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতির সম্বন্ধে জ্ঞান আরোহণ করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই 'এশিয়াটিক সোসাইটি'(১৭৮৪) 'ইউরোপীয় কাউন্টার পার্ট' হিসাবে প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীকালে 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' (১৮০০), 'হিন্দু কলেজ' (১৮১৭), প্রতিষ্ঠা ও ডিরোজিও–র মতো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব বঙ্গসংস্কৃতিকে পাশ্চাত্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের রক্ত সঞ্চার করেছিল। এতদিনের মধ্যযুগীয় জন্মপ্রদত্ত গণ্ডি অতিক্রম করে বঙ্গীয় তরুণ জাতকেরা সেদিন হতে চেয়েছিল বিশ্বসংস্কৃতির যাত্রী, মুক্তপথের পথিক। এইভাবে উনিশ শতকে বাংলার সাহিত্য ও সমাজে, কর্মে ও মননে বাঙালি যে অজস্র চরিতার্থতায় নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছিল তার মূল কারণ ছিল ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলন। বাংলা কথাসাহিত্যে বিভিন্ন লেখকের লেখায় প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপ কীভাবে এসেছে তা দেখানোই আমাদের গবেষণার অভিপ্রায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইউরোপ মহাদেশের ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির সঙ্গে বাঙালির যেভাবে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল আর অন্যত্র সেভাবে নয়। তাই আমরা আমাদের গবেষণা কর্মে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখেছি।

প্রথম অধ্যায়:

ঔপনিবেশিক কালপট

বাঙালির সঙ্গে ইউরোপীয় সংযোগ সাধন

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশ ছিল ধন, জন ও সম্পদে পরিপূর্ণ। কৃষকদের ক্ষেতভরা ফসল, গোলাভরা ধান এবং পুকুরভরা মাছের পাশাপাশি বাংলার মসলিন ও সাদা থান, রেশমবস্ত্র, সুতিবস্ত্র আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। বিভিন্ন মশলা যেমন লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, লঙ্কা, গোলমরিচ এবং দামী পাথর, হাতির দাঁতের নানান জিনিসপত্র ছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। বিশেষত আরব বণিকের সৌজন্যে সারা ইউরোপ তখন মসলার গন্ধে মাতাল হয়ে পড়েছিল। এছাড়াও বিভিন্ন দ্রব্য যেমন তসর, নীল, চুন, কার্পেট, বিছানার চাদর, রেশমের হাওদা প্রভৃতি সস্তা মূল্যেই বাংলায় সহজলভ্য ছিল—এই পণ্যদ্রব্যগুলি বাংলার বাইরে রপ্তানি করে লাভবান হতে একাধিক বণিকেরা সমুদ্র পথে বাংলায় বাণিজ্য করতে আসে।

আমরা স্থলপথ ও জলপথের বাণিজ্যের কালক্রম অনুসন্ধান করলে দেখতে পারব খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত রোমের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য চলত। এই সময় থেকেই ভারতীয় উপকূলভাগে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে একাধিক ইউরোপীয় বণিকের যাতায়াত শুরু হয়, কিন্তু ভারতে বাণিজ্যের চাবিকাঠি থাকে আরব মুসলমান বণিকদের হাতে। এরাই ভারতের বাণিজ্যিক সম্ভারকে মধ্য-প্রাচ্য থেকে ভেনিস পর্যন্ত রপ্তানি করত। এমনকি আমাদের প্রাচ্য থেকে যেসমস্ত মশলা ও গন্ধদ্রব্য ইউরোপের বাজারে ছেয়ে ফেলেছিল তার তুলাদণ্ড ছিল আরব বণিকদের করায়ত্ত। ফলে তারাই লভ্যাংশের সমস্তই কুক্ষিগত করত এবং ইচ্ছামতো দাম বাড়াত। পর্তুগীজ ঐতিহাসিক জোঅ্যাঁ-দে-বারোস তাঁর 'দা এসিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন যে, "পর্তুগীজদের চট্টগ্রামে আগমনের একশত বৎসর পূর্বেই একজন আরব বণিক দুইশত জন অনুচর লইয়া বাংলায় আসিয়া ছিলেন; নানা রকম কৌশল করিয়া তিনি ক্রমশ বাংলার সুলতানের বিশ্বাস ভাজন হন ও শেষ পর্যন্ত তাহাকে বধ করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন।"[১]

আরব বণিকদের পরবর্তীতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি দেশের একাধিক বণিক সম্প্রদায় ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান একক বা কখনও যৌথভাবে ভারতে পৌঁছানোর জন্য বিশেষ সচেষ্ট হয়েছিল। তবে পর্তুগীজরাই সর্বপ্রথম সাতসমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেছিল। এর পর ইউরোপীয় বণিকেরাও জলপথে স্বাধীনভাবে ভারতে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করতে থাকে।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই পর্তুগালের রাজারা ভারতে আরব বণিকদের একচেটিয়া ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে অভিহিত হয়। 'সোনার খনি ভারতবর্ষে' পৌঁছানোর জন্য নাবিক রাজকুমার হেনরি সমগ্র জীবনব্যাপী পর্তুগাল থেকে ভারতে আসার সমুদ্রপথ অনুসন্ধান করেন। ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে বার্থালমিউ দিয়াস নোভে জলপথে আফ্রিকা ভ্রমণ করার সময়েই ভারতে আসার বাস্তব পথ খুঁজে পান। এর অনেক পরে ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ভাস্কো-ডা-গামা জাহাজে ভারত সন্ধানে বেড়িয়ে পরে দীর্ঘ দশ মাস পরে ১৪৯৮ সালের ২০ মে ভারতের পশ্চিম উপকূল কালিকটের নিকটে পৌঁছান। ভারতে আসার সার্থক জলপথ আবিষ্কারের পর ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে আনন্দের সঙ্গে লিবসনে ফিরে যান। কিন্তু তারা বুঝতে পারে যে, খুব সহজেই ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তার করা সম্ভব নয়। কারণ তাদের জলপথে প্রধান শত্রু ছিল আরব মুসলমান বণিক এবং ভারতের মুসলমান রাজারা।

পর্তুগীজদের রাজপ্রতিনিধি হিসেবে পরবর্তীকালে একাধিক ব্যক্তি ভারতে এসেছিলেন। প্রথম এসেছিলেন দোম ফ্রান্সিস্কো আলমিদা, তিনি এদেশে (১৫০৫-১৫০৯) চার বছর সময় বাস করেছিলেন। তিনি দক্ষতার সঙ্গে সমুদ্রপথে আরব বণিকদের আধিপত্য দমন করেন। উল্লেখ্য, মুসলমান আরব বণিকদের সঙ্গে বিবাদকালে তাঁর এক পুত্র নিহত হলেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হননি। আলবুকার্ক্ দ্বিতীয় রাজপ্রতিভূ যিনি ভারতে এসেই পর্তুগীজ সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর বিচক্ষণতায় পর্তুগীজ জাতি ভারতের উপকূল বন্দরগুলির উপর কর্তৃত্ব স্থাপনে সমর্থ হয়েছিল। ১৫১০ সালে আলবুকার্ক্ গোয়া দ্বীপ দখল করেন। আর এটিই হল ভারতের মাটিতে ইউরোপীয়দের প্রথম রাজনৈতিক অধিকার এবং সেই সঙ্গে প্রথম

পর্তুগীজ বাণিজ্যিক উপনিবেশ স্থাপন। আলবুকার্ক্ এর পরামর্শেই পর্তুগালের রাজা মানোএল ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে ফার্নাও পেরেস দ' আন্দ্রেদকে বাংলার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পাঠান। এবং হোসেন শাহের রাজত্বকালেই বাংলাদেশের মাটিতে পর্তুগীজরা প্রথম পর্দাপণ করে।[২]

ষোড়শ শতাব্দী থেকে যে সমস্ত পর্তুগীজ বাংলাদেশে বাণিজ্য করতে আসতেন তারা প্রথমে সমুদ্রপথে চট্টগ্রামে প্রবেশ করত। এবং সেখান থেকে মেঘনা নদী ধরে প্রথমে গৌড় পরে ভাগীরথী ধরে সপ্তগ্রামে পৌঁচ্ছে যেত। এইভাবে তারা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকেই নানা ভাবে বাংলাদেশের মাটিতে বাণিজ্য করতে শুরু করে। পর্তুগীজ বণিক জোয়ায়োঁ সিলভেরা বাণিজ্যের জন্য প্রথমে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ নোঙর করলেও স্থানীয় সুবাদারের আনুকূল্য লাভ করতে পারেনি। পরে সিলভেরার নেতৃত্বে ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে একদল দুঃসাহসিক পর্তুগীজ নাবিক একাধিকবার চট্টগ্রামে বাণিজ্য করার ও একটি কুঠি নির্মাণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। আসলে চট্টগ্রামের শাসন কর্তা পর্তুগীজদের সেই সুযোগ দেননি, কারণ সিলভেরা এর পূর্বেই চট্টগ্রামের শাসন কর্তার এক আত্মীয়ের দুটি জাহাজ দখল করেছিল। তাই সিলভেরাদের অনুমতির পরিবর্তে তাদের জাহাজ লক্ষ্য করে কামান দাগেন চট্টগ্রামের শাসন কর্তা। এতে পর্তুগীজ বণিকেরা চট্টগ্রাম অবরোধ করে এবং বাংলার এতদিনের সামুদ্রিক বাণিজ্যকে প্রায় বিপর্যস্ত করে তোলে। ফলে চট্টগ্রামের শাসন কর্তা পর্তুগীজদের সঙ্গে আপাত সন্ধি করলেও সেই সন্ধির উদ্দেশ্য ছিল পর্তুগীজদের উপর আক্রমণ করা। আর সেই উদ্দেশ্য সাধন করতেই, পর্তুগীজদের জাহাজগুলি চট্টগ্রামে পৌঁছানো মাত্রই আক্রমণ পুনরায় আরম্ভ করে। তখন বাধ্য হয়ে সিলভেরা আরাকানে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই বাণিজ্য শুরু করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু আরাকানরাজ চট্টগ্রামের শাসন কর্তার মতোই উদ্দেশ্য সাধন করতেই তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে চায়। কিন্তু পূর্বের চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতা পর্তুগীজদের সতর্ক করে বহিঃদেশে পা ফেলতে শেখায়। তাই তারা আরাকানে বন্দী না হয়ে সেখান থেকে নিরাশ হয়ে সিংহলে চলে যায়।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে গোয়ায় প্রতিষ্ঠিত পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে বাণিজ্য করার অভিপ্রায়ে চারটি জাহাজ পাঠান, কিন্তু মাঝপথে প্রধান জাহাজটি অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হওয়ায় পর্তুগীজ প্রতিনিধি দল সে যাত্রায় বাংলা আসতে পারেনি। পরবর্তী নুসরৎ শাহের রাজত্বকালে (আনুমানিক ১৫২৯ খ্রিঃ) পর্তুগীজরা আরও একবার বাংলায় তাদের ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তবে সিলভেরা সিংহলে গমনের সময় থেকেই পর্তুগীজরা প্রায় প্রতি বৎসরই বাংলাদেশে একটি করে জাহাজ পাঠাত। এরকমই একটি জাহাজ ১৫২৬ খ্রিঃ রুই-ভাজ-পেরেরার অধিনায়কত্বে চট্টগ্রামে পৌঁছায় এবং চট্টগ্রাম বন্দরে খাজা শিহাবুদ্দীন নামে একজন ইরানী বণিকের পর্তুগীজ রীতিতে নির্মিত জাহাজকে কেড়ে নিয়ে যায়। আবার ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে মার্তিম-আফঙ্গো-দে-মেলোর পরিচালনাধীন একটি পর্তুগীজ জাহাজ ঝড়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বাংলার উপকূলের কাছে এসে পৌঁছায়। এখানকার কয়েকজন ধীবর ঐ জাহাজটিকে চট্টগ্রামে পৌছানোর নাম করে চকরিয়ার শাসনকর্তা খোদা বখ্‌শ্ খানের হাতে তুলে দেন। পরে খোদা বখ্‌শ্ খান প্রতিবেশী ভূস্বামীর সঙ্গে তাদের যুদ্ধে নিয়োজিত করেন এবং জয়লাভের পরও মুক্তি দেওয়ায় পরিবর্তে তাদের সোরে শহরে বন্দী করে রাখেন। পরবর্তীতে এদের উদ্ধারের জন্য আরও একদল পর্তুগীজ অন্য একটি জাহাজে করে চকরিয়ায় আসে এবং তাদের সমস্ত জিনিসপত্র খোদা বখ্‌স্ খানকে দিয়ে আফঙ্গো-দে-মেলোকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে খোদা বখ্‌স্ সন্তুষ্ট না হয়ে আরও অর্থ চান। এরপর পর্তুগীজদের হাতে কোন অর্থ না থাকায় তারা সদলবলে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত খাজা শিহাবুদ্দীনের মধ্যস্থতায় আফঙ্গো-দে-মেলো প্রচুর অর্থের বিনিময়ে মুক্ত হন। পরে শিহাবুদ্দীন বাংলার বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য ও ওরমুজ যাওয়ার জন্য পর্তুগীজ জাহাজের সাহায্য চান এবং তার বিনিময়ে পর্তুগীজদের বাংলায় বাণিজ্য করার ও চট্টগ্রামে দুর্গ নির্মাণ করার অনুমতি দিতে নসরৎ শাহকে সম্মত করাবেন বলে প্রতিশ্রুত হন। পর্তুগীজদের বিবরণ থেকে জানা যায়, ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে গোয়ার পর্তুগীজ গভর্নর নুনো-দা-কুনহা খাজা শিহাবুদ্দীনকে সাহায্য করার ও বাংলায় বাণিজ্য শুরু করার জন্য মাতিম-আফঙ্গো-দে-মেলোকে পাঠান। পাঁচটি জাহাজ ও দুশো লোক নিয়ে চটগ্রামে পৌঁছে দে-মেলো বাংলার সুলতানকে ১২০০ পাউন্ড মূল্যের

উপহার পাঠান। কিন্তু মাহ্মুদ শাহ পর্তুগীজদের বধ করার চিন্তা-ভাবনা করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বধ না করে তাদের বন্দী করেন। এবং অন্যান্য পর্তুগীজদের বন্দী করার জন্য একজন লোককে চট্টগ্রামে পাঠান। উল্লেখ্য এই লোকটি চট্টগ্রামে এসে মাতিম-আফন্সো-দে-মেলো ও তার অনুগামীদের নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করে। যদিও ভোজসভায় একদল সশস্ত্র মুসলমান পর্তুগীজদের আক্রমণ করে ও দে-মেলো বন্দী হয়। এবং তাঁর অনেক অনুচর যুদ্ধ করে নিহত হয়, অনেকে বন্দী হয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে "পর্তুগীজদের একলক্ষ মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া হতা বিশিষ্ট ত্রিশজন পর্তুগীজকে লইয়া মুসলমানেরা প্রথমে অন্ধকূপের মত ঘরে বিনা চিকিৎসায় আটক করিয়া রাখিল, তাহার পরে সারা রাত্রি হাটাইয়া মওয়া নামক স্থানে লইয়া গেল এবং তাহার পর তাহাদের গৌড়ে লইয়া গিয়া পশুর মতো ব্যবহার করিয়া নরকতুল্য স্থানে আটক করিয়া রাখিল।"[৩] গোয়ার পর্তুগীজ গভর্নর এই অবস্থায় বন্দী পর্তুগীজদের উদ্ধারের জন্য তাঁর দূত আন্তোনিও-দে-সিল্ভা-মেনেজেসকে ৯টি জাহাজ ও ৩৫০ জন লোকসহ চট্টগ্রামে পাঠান। কিন্তু মাহ্মদ শাহ বন্দীদের মুক্তি দেননি। তাই এর বদলা স্বরূপ মেনেজেস চট্টগ্রামের বৃহৎ এলাকায় আগুন ধরিয়ে দেয় এবং বহু লোককে বন্দী ও বধ করেন। অন্যদিকে দিয়াগও-রেবেলো নামে একজন পর্তুগীজ তিনটি জাহাজ নিয়ে গোয়া থেকে সপ্তগ্রামে এসে মাহ্মদ শাহকে পর্তুগীজ বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য ভয় দেখায় এবং সতর্ক করে তা না করা হলে সপ্তগ্রাম ধ্বংস হবে।

পর্তুগীজদের সঙ্গে মাহ্মদ শাহের যখন আঘাত পাল্টা আঘাত, বন্দী পাল্টা বন্দী চলছে ঠিক এই সময়েই শের খান সুর বাংলা আক্রমণ করেন। ফলত মাহ্মদ শাহ তখন অনেকটা বাধ্য হয়েই পর্তুগীজদের বন্দী বা বধ না করে ২১ জন বন্দী পর্তুগীজদের তিনি রেবেলো-র কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তাদের কাছে আসন্ন আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে উদ্ধার করার সলাপরামর্শ করে। গোয়ার গভর্নরের কাছে এব্যাপারে শাহ দূত পাঠিয়ে শের খানের বিরুদ্ধে সাহায্য চান এবং তার বিনিময়ে বাংলায় পর্তুগীজদের কুঠি ও দুর্গ নির্মাণ করতে দেওয়ায় কথা বলেন। দে-মেলোওঁ সুযোগ বুঝে সাহায্যের পত্র পাঠিয়ে দেয়। শের খানের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেলেও পর্তুগীজদের পরাক্রম দেখে মাহ্মদ শাহ খুবই খুশি হন; পুরস্কার স্বরূপ তিনি

পর্তুগীজদের অনেক জমি, বাড়ি, শুল্কগৃহ ও কুঠির নির্মাণের এবং চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে স্থানীয় অধিবাসীদের শুল্ক আদায় করার অনুমতি পর্যন্ত দিয়ে দেন। এর পরেই পর্তুগীজরা দলে দলে বাংলায় আসতে শুরু করে। ১৫৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর ভাগীরথী নদীর তীরে হুগলী নামক একটি নগণ্য গ্রামে কুঠির নির্মাণের অনুমতি দিলে তা ক্রমে সমৃদ্ধ শহর ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। এছাড়াও বাংলার হিজলী, শ্রীরামপুর, ঢাকা, যশোর, বরিশাল ও নোয়াখালি জেলার বহু স্থানে তারা বাণিজ্য করতে শুরু করে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষে চট্টগ্রাম ও ডিয়াঙ্গা এবং সপ্তদশ শতব্দীর প্রথমে সন্দ্বীপ, দক্ষিণ শাহবাজপুর প্রভৃতি স্থান পর্তুগীজদের অধিকারভুক্ত হলেও তাদের প্রভাব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ ইউরোপে প্রায় ষাট বৎসর কাল (১৫৮০-১৬৪০) পর্তুগাল স্পেনের পদানত হয়ে থাকার ফলে ভারতে পর্তুগীজদের বাণিজ্য বৃদ্ধি ও শাসন বিশেষ ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এছাড়াও তাদের সঙ্গে আরও দুটি জিনিস বাংলায় আমদানি হয়, তা হল খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারক এবং জলদস্যু—যা বাঙালির আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর চট্টগ্রাম ছিল মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রধান কেন্দ্র। এরা এখানে অনেক লোকদের বন্দী করে অকথ্য অত্যাচার চালাত। এমনও শোনা যেত যে, বন্দী লোকেদের হাত ছিদ্র করে তার মধ্য দিয়ে বেত চালাত, আবার অনেক সময় অনেককে একসঙ্গে বেঁধে নৌকার পাটাতনে নিচে ফেলে রেখে খাদ্য হিসেবে কিছু চাল ফেলে দিত। শুধু তাই নয় পর্তুগীজরা এদের সঙ্গে নির্মম ব্যবহার করত এবং বিভিন্ন শহরে তাদের বিক্রি করে দিত। এছাড়াও এদের আগ্নেয় অস্ত্র ও নৌবহর অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সবেমিলে পর্তুগীজরা দুধর্ষ হয়ে স্বাধীন জাতির মতো আচরণ করত।

শাহজাহান (১৬২৮-১৭০৭) হুগলী বন্দর থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করলে তারা বেগম মমতাজ মহলের দুজন বাঁদিকে ধরে নানা রকম অত্যাচার করতে থাকে। স্বাভাবিকভাবে শাহজাহান সম্রাট হওয়ার পরেই কাশিম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে হুগলী দখল করে পর্তুগীজদের শক্তি সমূলে ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে কাশিম খান হুগলী অধিকার করে ও ৪০০ ফিরিঙ্গি স্ত্রী-পুরুষ বন্দী করে আগ্রায় পাঠান। হুগলী পতনের সঙ্গে সঙ্গে

বাংলায় পর্তুগীজদের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আরাকানরাজ ডিয়াঙ্গ পর্তুগীজদের থেকে চট্টগ্রাম অধিকার করেছিল। শায়েস্তা খাঁ সেই চট্টগ্রাম দখল করতে প্রথমে সন্দীপ অধিকার করেন ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে। এই সময়ে মগ ও পর্তুগীজদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে শায়েস্তা খাঁ অর্থ ও আশ্রয় দিয়ে পর্তুগীজদের নিজের অধীনস্থ করেন। এবং বলা যায় তাদের সাহায্যেই ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জয় করেন। কিন্তু পরে নানা কারণে পর্তুগীজ বণিকদের সঙ্গে শায়েস্তা খানেরও বিবাদ হয়।

পর্তুগীজদের অনেকে বরিশালের পূর্বে, নোয়াখালির দক্ষিণে, চট্টগ্রামের পশ্চিমে ও বঙ্গোপাসাগরের উত্তর প্রান্তের সমুদয় দ্বীপে বসবাস করতে থাকে। কারণ এই দেশের ঐশ্বর্য, জীবন যাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য, জিনিস পত্রের সহজলভ্যতা ও মেয়েদের মধুর স্বভাবে এদেশে প্রবেশ করতে তাদের শুধু আকর্ষণই করেছে, কখনো বিকর্ষণ করেনি। পরবর্তীকালেও ওলন্দাজদের দ্বারা বিতাড়িত হওয়ার পরেও বহু পর্তুগীজ ও ট্যাঁস ফিরিঙ্গি বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। হুগলী শহরেই প্রায় আট-নয় হাজার পর্তুগীজ বাস করে। সন্দ্বীপ দ্বীপটি পর্তুগীজদের অধীনে ছিল, যেখানে এক হাজার পর্তুগীজ ও অন্যান্য সৈন্য, দুইশত ঘোড়-সওয়ার এবং আশি খানি কামান দ্বারা রক্ষিত রণতরী ছিল। হুগলী থেকে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত ভূ-ভাগ ছিল এদেরই অধীনে। বাংলাদেশের কোনো কোনো জমিদার আত্মরক্ষার্থে এদের সঙ্গে মিত্রতাও স্থাপন করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সৈনিক ও সেনানায়ক হিসেবে পর্তুগীজদের খুব খ্যাতি ছিল। ঠিক একারণেই মুঘল যুগেও নবাবেরা পর্তুগীজ সৈন্যদের পোষণ করতেন।

পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাঙালিদের জীবনযাত্রা বিপন্ন করে তুললেও বাংলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কিছুটা উন্নতি সাধন হয়েছিল। নতুন খাদ্য, পানীয়, কৃষিজাত দ্রব্য, আসবাব পত্র ও একাধিক নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের প্রচলন হয়। এরাই আমাদের দেশে প্রথম তামাকসহ একাধিক জিনিস— যেমন জামরুল, সবেদা, চীনাবাদাম, কমলালেবু, কেশুবাদাম, পেঁপে, আনারস, কামরাঙ্গা, পেয়ারা, আতা, নোনা প্রভৃতি আমদানি করে। এছাড়া চেয়ার, ছবি, ফিতা, আলমারি, চাবি, বোতাম, বোতল, পিস্তল, বালতি, পেরেক, সাবান, তোয়ালে,

আলপিন, ইস্ত্রি, আয়া, মিস্ত্রি, নিলাম, দরজা, জানালা প্রভৃতি শব্দ পর্তুগীজ থেকেই বাংলায় অনুপ্রবেশ ঘটে বাংলা শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

পর্তুগীজদের পরে বাংলায় ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার, ইংরেজ ইত্যাদি একাধিক ইউরোপীয় বণিকদল বাংলায় বাণিজ্য করতে আসে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে ওলন্দাজেরা ও ইংরেজ বণিকেরা ভারতসাগরে প্রাধান্য বিস্তার এবং ভারতে উপকূল ও অভ্যন্তরে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের ফলে পর্তুগীজদেরও প্রতিযোগিতায় পড়তে হয়। তাদের বাণিজ্যগুলি একে একে ওলন্দাজদের হস্তগত হতে থাকে এবং ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগেই পর্তুগীজদের গোয়ায় প্রাধান্য নগণ্য হয়ে পড়ল। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে চেন্নাইয়ের নিকট পুলিকটে প্রথম ওলন্দাজ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে মছলি পত্তন ও সুরাটেও ওলন্দাজ কেন্দ্র সম্প্রসারিত হয়। পরবর্তীতে প্রাচ্যের মশলা ও গন্ধদ্রব্যের বাণিজ্যে তাদের একচেটিয়া অধিকার জন্মায়। ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে হুগলীর নিকটবর্তী চুঁচুড়ায় তাদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র এবং কাশিমবাজার ও পাটনায় দুটি কুঠি স্থাপন করে বাংলায় বাণিজ্য করতে আরম্ভ করে। দিল্লীর বাদশাহ ফারুক শিয়র ওলন্দাজদের শতকরা আড়াই টাকার বিনিময়ে বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়। ফরাসী বণিকেরাও সম্রাটকে ৪০,০০০ টাকা এবং বাংলার নবাবকে ১০,০০০ টাকা ঘুষ দিয়ে এই সুবিধা লাভ করেন।

১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে দিনেমার ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয় এবং ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে চেন্নাইয়ের উপকূলে ট্রাংকোবরে তাদের প্রথম কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের পক্ষপুটেই ১৮০০ সালে উইলিয়াম কেরি সাহেবের নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ১৮৪৫ সালে শ্রীরামপুরের দিনেমার কেন্দ্র ইংরেজের কাছে বিক্রয় করার পর ভারত থেকে দিনেমার বাণিজ্য ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়।

১৫৮৩ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি রালফ ফিচ-এর নেতৃত্বে একদল ইংরেজ বণিক ফলমুথ থেকে টাইগার নামের জাহাজে চেপে পশ্চিম এশিয়ার অভিমুখে যাত্রা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারত থেকে আমদানি সুতির কাপড়, চিনের রেশমি কাপড়, ইন্দোনেশিয়ার মশলা প্রভৃতির

উৎস সন্ধান করা। পরে অবশ্য নানা কারণে দল ভাগ হয়ে যায়। ফিচ ব্যবস্থাদি করে নদীপথে বাংলার অভিমুখে যাত্রা করবেন বলে ঠিক করেন। তাদের সঙ্গী লীডস মোগল দরবারে চাকরি নিয়ে ভারতে থেকে গেলেন। ফিচ পরে আগ্রা থেকে কাশী এবং কাশী থেকে মধ্যযুগের প্রধান বন্দর সপ্তগ্রামে যান। পরে সপ্তগ্রাম থেকে সুন্দরবন পেরিয়ে সবশেষে পৌঁছান বার্মার পেগু শহরে। ফিচ তাঁর বর্ণনায় প্রত্যেক বন্দরের আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের বিশদ ফিরিস্তি দিয়েছিলেন। যেমন কোচিনের গোলমরিচ থেকে শুরু করে মলুক্কার লবঙ্গ, পেগুর চুনি, গোলকুণ্ডার হিরে, বাংলার বস্ত্র প্রভৃতি।[৪] পরে পেগু থেকে ফিচ ১৫৯১ সালের ২৯ শে এপ্রিল জাহাজে করে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে যায়। ইংরেজ বুঝতে পারে ভারতে তখন পুরোদমে পর্তুগীজেরা বাণিজ্য করে চলেছে। পরে জেমস ল্যাংকাস্টারের নেতৃত্বে আর একটি ব্রিটিশ জাহাজ ভারত, নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ ও পেনাং(মালয়) পরিক্রমণে জানতে পারে শুধু পর্তুগীজরাই নয়, ওলন্দাজ বণিকেরাও ইংরেজদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হবে। এইসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতে লক্ষ্মীলাভের আশায়, বাংলার মাটিতে রালফ ফিচের পদার্পনের প্রায় কুড়ি বছর পর ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখ কয়েকজন ইংরেজ বণিক মিলে লন্ডন শহরে 'The Governor and Company of Marchants of London Trading into the East India' নামে এক কোম্পানি গঠন করেন।

ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গোড়া পত্তনের পরে পরেই ১৬০০ থেকে ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোম্পানি বাণিজ্য করার জন্য তিনবার জাহাজ পাঠিয়েছিল। ইংরেজ বণিকেরা প্রথমদিকে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকদের প্রতিযোগিতায় বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারেনি। উইলিয়াম হকিন্স ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সু-সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা বা পরের বছর হেনরি মিডিলটনের স্থানীয় সুবাদারের সঙ্গে আনুকূল্য অবস্থার সৃষ্টি করলেও পর্তুগীজ বণিকেরা এক্ষেত্রে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। টমাস কেন্ট ১৬১৩ সালে মুঘল বাদশাহের কাছ থেকে ফারমান লাভ করে। আর এরপর থেকে ইংরেজ বণিকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্তুগীজ বণিকেরা পিছিয়ে পড়তে থাকে। ক্রমে সুরাট, আহমেদাবাদ, আগ্রা ও ভরোচে ইংরেজের স্থায়ী কুঠি নির্মিত হয়। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বিরোধে চতুর ইংরেজ প্রচুর মুনাফা

লুঠতে শুরু করে। এবং পরে ইংরেজ ও ওলন্দাজ সংঘর্ষ হলে ইংরেজরাই জয়লাভ করে। ক্রমে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও ইংরেজের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়ে। সতেরো শতক শেষ হওয়ার আগেই বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজে ইংরেজের প্রধান তিনটি কর্মক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এবং এর পর প্রায় একশ বছরের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ কোম্পানির অধীনে চলে আসে। কিন্তু ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে বালেশ্বরে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয় এবং এই সময়েই বাংলাদেশের হুগলীতেও তারা বাণিজ্য কুঠি স্থাপন ও কাশিমবাজারের কুঠিতে তারা বেশ দক্ষতার সঙ্গে কাজ পরিচালনা করতে থাকে। এরপরে অবশ্য কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য ও ঘরোয়া বিবাদের ফলে বেশ কিছুদিন কোম্পানিকে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে কাটাতে হয়।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে সুতিবস্ত্র সংগ্রহের জন্য প্রথম ঢাকায় এবং পরে রাজমহল ও মালদহে কুঠি নির্মাণ শুরু করে। এই সময় বাংলা থেকে নিয়মিত সোরা, রেশম ও সুতিবস্ত্র ইংল্যান্ডে রপ্তানির ফলে কোম্পানির দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। কিন্তু নিজেদের বুদ্ধি ও বিকাশ ব্যতীত যে অন্যের সহায়তায় টিকে থাকা সম্ভব নয় তা ইংরেজরা ক্রমশ বুঝেছিল। তাই তখন বাধ্য হয়ে তারা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির দ্বারা আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা করতে থাকে। আর এজন্যই কোম্পানির কর্মচারী জব চার্ণব গঙ্গার তীরে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বাংলার সুবাদারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মিটিয়ে ব্যবসা চালাতে লাগলেন। ১৬৯১ সালে জব চার্ণব মুঘল সুবাদরের কাছ থেকে ইংরেজদের বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে একটি ফরমানে বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে। পরবর্তীকালে ইংরেজ বণিকগণ শায়েস্তা খাঁ ও ঔরাঙ্গজেবের থেকে ফরমান আদায় করে, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু লাভ করতে পারেনি। কারণ মুঘল কর্মচারীরা নানা রকম অজুহাতে সুবিধাগুলি থেকে ইংরেজদের বঞ্চিত করত। আসলে মুঘল বাদশাহের কর্মচারীর সঙ্গে শুল্ক নিয়ে কোম্পানির বিবাদ নানা কারণে লেগেই থাকত। ইতিমধ্যে মুঘল শাসনকর্তা ইংরেজদের হুগলীর কুঠি আক্রমণ করলে জব চার্ণব হুগলী ছেড়ে প্রথমে সুতানুটি এবং পরে হিজলীতে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেন। হুগলীর কুঠি আক্রমণের প্রতিশোধ স্বরূপ কোম্পানি বালেশ্বর শহরটি পুড়িয়ে সেখানে কুঠি নির্মাণ করে।

এতে মুঘল সৈন্যরা হিজলি অবরোধ করলে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয় এবং ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা সুতানুটিতে পুনরায় ফিরে যায়। কিন্তু তারা বাংলায় সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত স্থান অধিকারের দ্বারা নিজেদের স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা করতে থাকে। আর এজন্যই তারা বাণিজ্য কেন্দ্র সুতানুটি থেকে তুলে আবার চট্টগ্রামে আক্রমণ করে ও ব্যর্থ হয়ে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে আবারও পূর্ব স্থানেই ফিরে এসে ঘরবাড়ী নির্মাণ শুরু করে। পরে ১৬৯৮ সালে মুঘল বাদশাহের কাছ থেকে বার্ষিক ১২০০ টাকা খাজনার বিনিময়ে কোম্পানি সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনখানি ইজারা নিয়ে জমিদারি শুরু করেন। এখানে কোম্পানির কর্মচারীদের জন্য পাকা কুঠির ও বিভিন্ন বিদ্রোহের উপলক্ষে ইংরেজরা কলকাতায় ফোর্টউইলিয়াম (ইংলন্ডেশ্বর তৃতীয় উইলিয়ামের নাম অনুসারে) দুর্গ নির্মাণ করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে এই তিনটি গ্রাম কলকাতা নাম নিয়ে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির নতুন রাজ্যপাটের শীর্ষ স্থানে পরিণত হয়। এরপর ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় কোম্পানি বাংলার হুগলীতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন এবং পরে কাশিম বাজার, ঢাকা, মালদহে কুঠি স্থাপন করে। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে রানী এলিজাবেথের কাছ থেকে কোম্পানির প্রথম পনেরো বছর প্রাচ্যদেশে একচেটিয়া বাণিজ্য করার সনদ লাভ, তাদের দৃঢ় ভিত্তি ভূমির উপর দাঁড় করিয়ে দেয়। এদিকে কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য খুব দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৭১১ থেকে ১৭৩৩ পর্যন্ত একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার প্রদান করে। এতে ইংল্যান্ডের অন্যান্য বণিকেরা ক্ষুদ্ধ হলেও পরে ১৭৩০ সালে মূল কোম্পানিকে আরও ১৭৬৯ সাল পর্যন্ত ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যের পুনরায় অধিকার দেওয়া হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট শুধু বাণিজ্যিক অধিকারই দেয়নি সেই সঙ্গে এদেশে কোম্পানির সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে রাজস্বের সন্ধান, ব্যাবসায়িক সুযোগ সুবিধার খোঁজ, জরুরী প্রয়োজনে সামরিক প্রয়াস ইত্যাদি সবই কোম্পানির ভিত গঠনে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। এভাবেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় ইংরেজ শক্তির উত্থানে অনুকূল পরিবেশ প্রস্তুত করে।

১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি সম্রাট ফারুক শিয়ারের কাছ থেকে আবার বার্ষিক তিনহাজার টাকার বিনিময়ে সারা বাংলায় বাণিজ্য করার, কলকাতার নিকট জমি কেনা ও যেখানে খুশি বসবাস করার অনুমতি নেয়। পরবর্তীতে কোম্পানির কর্মচারীরা এই

দস্তকের অপব্যবহার করতে থাকে। কারণ কোম্পানি বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পেলেও কর্মচারীরা নয়। এতে নবাব প্রচুর রাজস্ব হারায় আর অন্য দিকে সামগ্রিকভাবে কোম্পানি যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী হতে থাকে। তাই মুর্শিদকুলি খান এই বার্ষিক টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিল। এতে অবশ্য উভয়ের মধ্যে ঝামেলা হলেও তা কখনো চরমে পৌঁছায়নি কারণ ইংরেজরা জানতেন নবাবের সঙ্গে শত্রুতা করে বাণিজ্য সম্ভব নয়, আর নবাবও জানতেন ইংরেজ বাণিজ্য থেকে তার যথেষ্ট লাভ। এমনকি পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দীন ও আলিবর্দী খাঁ ইংরেজদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখেই চলতেন। তবে অভাবে নবাব মাঝে মাঝে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের জন্য কঠোরতাও অবলম্বন করতেন। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারী নিয়ে বাংলায় ফরাসী ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে তিক্ততা দেখা দিলেও তৎকালীন বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁ কিন্তু উভয়ের মধ্যে সমঝোতা বজায় রাখেন নিজের স্বার্থে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে সৈন্যের বেতন বাকি পড়লে ইংরেজদের নিকট ত্রিশ লক্ষ টাকাসহ কয়েকটি কুঠি আটক করেন। এমনকি আলিবর্দী খান বাংলায় ইংরেজদের কোনো দুর্গ নির্মাণ করার অনুমতি দিতেন না। তিনি বলতেন, “তোমরা বাংলায় বাণিজ্য করতে আসিয়াছ,- তোমাদের দুর্গের প্রয়োজন কি? তোমরা আমার রাজ্যে আছ, আমিই তোমাদের রক্ষা করিব”।[৫] উল্লেখ্য, নবাবের এহেন উক্তিতে কোম্পানি আশ্বস্ত হতে পারেনি। শুধু তাই নয়, ফরাসীসহ অন্যান্যদের সঙ্গে মেকাবিলা করতে নবাবের অনুমতি ব্যতীত তারা নিজেদেরকে আরও মজবুত করে তোলে। নবাবের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে ও দস্তকের অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে সংঘর্ষ চরমে পৌঁছায়। কারণ সিরাজ সেই ব্যক্তিগত বেআইনি ব্যবসা বন্ধ করতে সচেষ্ট হন। এবং কোম্পানির অভাবনীয় ধনসম্পদ বৃদ্ধির সুযোগগুলিও ধ্বংস করেছিলেন। পরবর্তীতে কোম্পানি সিরাজের কথা অমান্য করলে নবাব ইংরেজের কাশিমবাজারের কুঠি ও কলকাতা অধিকার করে নিজের শক্তির পরিচয় দেয়। ইংরেজের কাশিমবাজার পরাজয় ও নবাবের ফরাসীদের সঙ্গে হৃদ্যতা দেখে, ব্যবসায় একাধিপত্য খর্ব হতে পারে ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে মাদ্রাজ থেকে রবার্ট ক্লাইভ দলবল নিয়ে বাংলায় হাজির হন। আসলে সেদিন তরুণ স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্দাম গতিতে নতুন করে ক্ষমতার

বিন্যাস ঘটাতে চেয়েছিলেন– যা একদিকে যেমন কোম্পানি আবার অন্য দিকে নবাবের দরবারে ও ব্যবসায়ী, মহাজন, জমিদারদের মধ্যে যে একদল লোক অসন্তুষ্ট ছিল তারা মেনে নিতে পারেনি, শুধু তাই নয় তাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চক্রান্ত করতে থাকে। আর এই অশুভ আঁতাত ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন পলাশির যুদ্ধে সমাপ্ত হয়। সেই যুদ্ধে মীরজাফরের নেতৃত্বে বিশাল সেনাদল হাতগুটিয়ে থাকায় ক্লাইভ খুব সহজেই সিরাজকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। আর মীরজাফর ইংরেজের হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে নতুন নবাব হিসেবে বাংলার মসনদে বসেন। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পর ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজনৈতিকভাবে তার আধিপত্য শুরু করে। বাংলার জান-মান, ধন-দৌলত অধিকার, পীড়ন ও শোষনের মাধ্যমে ইংরেজ বণিকগণ তাদের সমৃদ্ধি ক্রমশ বৃদ্ধিই করেছিল।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন দৃঢ় ভিত্তিতে বাংলায় প্রায় প্রতিষ্ঠিত, ঠিক এসময়েই সর্বশেষ আগত ইউরোপীয় বণিক ফরাসিরা ভারতীয় উপমহাদেশে বাণিজ্য করতে আসে। ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে ফরাসিরা সকলের শেষে ভারতের মাটিতে আর্বিভূত হয়। তাদের সরকারি প্রতিষ্ঠান 'La Compagnie des Indes Orientales' ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে গঠন করেন ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ফরাসিরা সুরাটে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করলেও পরে ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার গঙ্গার তীরে চন্দননগর স্থানটিকে কিনে একটি শক্তিশালী সুরক্ষিত ফরাসি বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। কালক্রমে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি, ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো ফরাসিরাও এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে থাকে। ফলে প্রায় দুই সমশক্তির মধ্যে সংঘর্ষ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। অবশ্য ফরাসি কোম্পানি কখনও পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের মতো বাণিজ্যিক সফলতা অর্জন করতে পারেনি। কারণ এব্যাপারে তাদের স্বদেশ সরকারের কাছ থেকে উৎসাহ বা সাহায্য বিশেষ কিছু পায়নি। ফরাসিরা ক্রমে বাণিজ্য ছেড়ে দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে পারস্পারিক বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ইংরেজদের চতুরতা, ষড়যন্ত্র, কূটকৌশল, উন্নত রণনীতির কাছে ফরাসিরা সহজেই পরাজিত হয়। যদিও ফরাসিদের বুদ্ধি ও অস্ত্রসজ্জা কোনো দিক দিয়েই কম ছিল না। পরে এই ফরাসিরা বাংলার নবাবের পক্ষ অবলম্বন করার পরেও ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করে। ফলে বাংলায়

ফরাসি কুঠিগুলো ইংরেজের দখলে চলে যায় এবং ইংরেজরা ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বীশক্তিতে পরিণত হয় যা অব্যহত থাকে ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট পর্যন্ত। শেষলগ্নে ভারতে ডুপ্লের আগমন, দুর্ভাগ্য, দুর্ঘটনা, বুদ্ধিভ্রষ্টতা এবং সর্বোপরি ফরাসিদেশ থেকে সরকারি সাহায্য ও সমর্থনের অভাবে ফরাসি সূর্য ভারতের আকাশে একবার উঁকি দিয়েই চিরদিনের জন্য অস্তাচলে চলে যায়।

ভারতে পাশ্চত্য শিক্ষার প্রসার:

বণিকবেশে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে এসে বাণিজ্য বিস্তারের মাধ্যমে রাষ্ট্রশাসনের ক্ষমতা লাভ করে। স্বভাবতই সুশাসক অপেক্ষা অর্থনৈতিক শোষণই তারা অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েছিল। ফলে এই বিদেশি বণিকের শাসন ও সর্ববিধ অর্থনৈতিক শোষণ সুস্থ বাঙালি জাতিকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছিল। ১৭৬৫ সালে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ থেকে এর সূচনা হয়। এবং এরপর চলতে থাকে একের পর এক অমানুষিকতা ও সীমাহীন লোভ। দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্পকর্ম তথা অর্থনৈতিক ভিতকে দুর্বল করে দেয়। কারণ আমরা দেখি "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছর ব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের খরচ। .... রাজস্ব অক্ষুন্ন রাখতে জমিদারের ক্ষমতা বাড়াতে হয়, সাম্রাজ্য বিস্তার করতে বা বিলেতের জন্য পণ্য কিনতে বারংবার দেনা করতে হয় এবং শোধ দিতে হয় বাংলাকেই।"[৬] কোম্পানির কর্মচারীরা বাণিজ্য তথা রাষ্ট্রশাসনের ফলে প্রচুর ধনসম্পদসহ 'হোমে' ফিরলে তারা অভিজাত সম্প্রদায়ের মতোই আচারণ করে, ফলে তাদের চরিত্রে ব্রিটেন সুলভ আভিজাত্য ও সদাচার বিশেষভাবে খর্ব হয়ে পড়ে। যা আবার গ্রেট ব্রিটেনের আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ঐতিহ্য গর্বিত সামাজিক ব্যক্তিগণ কখনোই মেনে নিতে পারেননি। পরবর্তীকালে দেখা যায়, ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অপশাসন ও লোভ লালসাকে খর্ব করার জন্য গ্রেটব্রিটেনের পার্লামেন্ট অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম দশক থেকে শুরু করে গোটা ভারতের শাসনদণ্ডটি মহারানী ভিক্টোরিয়ার কর্তৃত্বে আনতে সমর্থ হয়।

কোম্পানি পার্লামেন্টের শাসন পদ্ধতির ফলে বাধ্য হয়ে মহারানীর কাছে সনদপত্র নিয়ে বাণিজ্য করতেন। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর রানি কোম্পানিকে একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদ দান করে। কোম্পানি এরপর দেড়শো বছর পূর্বভারতে বাণিজ্য করে প্রচুর মুনাফা লাভ করেছিল, যার সিংহ ভাগেই ছিল বাংলা ও বাঙালিদের মেরে-কেটে সংগৃহীত। এছাড়াও ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে মুঘল সম্রাটের কাছে কোম্পানির দেওয়ানি লাভ এবং দ্বৈত শাসনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে। আবার ইতিমধ্যে ব্রিটেনের লাইসেন্স নিয়ে ভারতে বাণিজ্য করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচারক ও শিক্ষক দলে দলে আসতে শুরু করে। ১৮১৩ সালের সনদে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য লোপ পায় এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় প্রজাদের ধর্মশিক্ষা ও কেতাবি শিক্ষাদানের জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ১৮১৩ থেকে ১৮২৩ সন পর্যন্ত ভারতীয়দের শিক্ষাদানের জন্য বার্ষিক সঞ্চিত অর্থের সামান্য কিছুও ব্যয় করেনি। অথচ এই সময়ই কলকাতায় হিন্দু কলেজ (১৮১৭), স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭), স্কুল সোসাইটি (১৮১৮) সবই প্রতিষ্ঠা হয় বেসরকারী উদ্যোগে। অবশেষে ১৮২৩ সালের ১৭ই জুলাই এদেশীয়দের শিক্ষার জন্য 'General Committee of Public Instruction' গঠিত হয়। এবং শেষ পর্যন্ত স্কুল কলেজ পরিচালনার জন্য এক লক্ষ টাকা ও বকেয়া টাকা শিক্ষা খাতে ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়। আরো বিশ বছর পরে ১৮৩৩ সালে আবার সনদের মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব উঠে। আর এই সময়ের মধ্যে কলকাতার চিত্র অনেকটাই পালটে যায়; প্রতিষ্ঠিত হয় বহু স্কুল, কলেজ; এবং বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে অনেক সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রতিষ্ঠা হয়।

১৮১৩ সালে কোম্পানির মেয়াদ বৃদ্ধি করার সময়ে কোম্পানির পরিচালকবর্গ মনে করেছিলেন এদেশে ভারতীয়দের জন্য সনাতন ধরণের শিক্ষাই যথোপযুক্ত হবে। আর সেকারণে তৎকালীন জেনারেল গভর্নরকে নির্দেশ দেন টোল চতুষ্পাঠীতেই ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা যে সংস্কৃত বিদ্যানুশীলন করাতেন সেখানেই অর্থ প্রদান করা যেতে পারে। পরবর্তীতে এই চিন্তা-ভাবনাকে কেন্দ্র করেই মার্শম্যান বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তার এই প্রস্তাব কলকাতায় অবস্থিত সকল শ্বেতাঙ্গ সমাজ অনুমোদন করলে খ্রিস্টান মিশনারীরাও নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে একাধিক

স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এদিকে দেশীয়দের সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ‘General Committee of Public Instruction’-এর প্রধান হোরেস হেম্যান উইলসন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু সেই সংবাদ পেয়ে দূরদর্শী ও বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন রামমোহন এর ঘোর বিরোধিতা করে ১৮২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বড়লাট আর্মহাস্টকে পত্র লেখেন। সেই পত্রের অনুবাদ করে রমেশচন্দ্র দত্ত লেখেন “এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে যুবক ছাত্রেরা নূতন কিছুই শিখিবে না। দুই হাজার বছর পূর্বেকার ব্যাকরণ ও ন্যায়, দর্শন, মীমাংসা ও বেদ বেদান্তের সূক্ষ্ম ও শুষ্ক বিচার– যাহা বহুকাল যাবৎ ও এখনও ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত- তাহারই টীকার টীকা প্রভৃতির আলোচনায় জীবনের শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত করিবে। যদি দেশবাসীর মানসিক উন্নতি ও উদার জ্ঞানলাভই গভর্ণমেন্টের লক্ষ্য ও আদর্শ হয় তাহা হইলে আধুনিকভাবে ও উন্নত পাশ্চাত্ত্য প্রণালীতে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, শরীর সংস্থান বিদ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান প্রভৃতি শিখাইবার জন্য উপযুক্ত ইউরোপীয় শিক্ষক পরিচালিত একটি কলেজ স্থাপন এবং ইহার সঙ্গে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হইবে।”[৭] রামমোহন সংস্কৃত বিদ্যাকে একপ্রকার ব্যঙ্গ করেই লিখেছিলেন “The sanskrit system of education would be the best calculated to keep the country in darkness, if such had been the policy of the British legislature.” [৮] তিনি বাঙালির উন্নতির জন্য বলেছেন ‘...improvement of the native population is the object of the Government it will consequently promote a liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematices, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with the other useful science, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentleman of telent and learning, educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, implements and other apparatus.’[৯] কিন্তু এর পরেও সংস্কৃত ভাষাবাহী প্রাচীনবিদ্যা চর্চার জন্য কলকাতায় ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি সরকারি ব্যয়ে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু সেদিন নাগরিক সমাজের পুরাতন গ্রন্থ ও পুরাতন শিক্ষা

পদ্ধতির প্রতি তেমন কোনো কৌতূহল দেখা গেল না। পরিবর্তে সকলেই ইংরেজি শিখতে চায়- কেউবা বৈষয়িক কারণে, কেউবা জীবিকা নির্বাহের তাড়নায়। বাংলার কিছু সম্ভ্রান্ত মানুষেরা (দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর) বা সাধারণ মানুষেরাও সেসময় ইংরেজি শিখে সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা করতেন। শহর কলকাতাকে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানি তাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র, বাণিজ্য কেন্দ্র, বিচারশালা এমনকি রাজ সংগ্রহশালা হিসেবে মনোনীত করায় কলকাতা দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে, বাড়তে থাকে শহরের জনসংখ্যা। এই অবস্থায় জীবনের নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় গ্রাম থেকে এসে অনেকেই ভীড় করতে লাগল। অনেকেই খুব সামান্য ইংরেজি শিখেই চাকরি প্রার্থী দরখাস্ত লেখা, মামলা-মোকদ্দমার প্রার্থীদের ও আদালতের আসামী-ফরিয়াদিদের সাহায্য করে, এমনকি ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি করেও জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। বাঙালির মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের টনক নড়ল, তারা উপলব্ধি করতে লাগল সমাজে টিকে থাকতে হলে প্রচলিত ফার্সি ভাষার পরিবর্তে নতুন রাজার রাজত্বে ইংরেজি ভাষা শিখতে হবে। এর প্রভাব যে কতটা পড়েছিল তা আমরা বুঝতে পারি কলকাতায় ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ‘স্কুল বুক সোইটি’র প্রতিষ্ঠার পরের বছর অর্থাৎ ১৭১৮-র বার্ষিক অধিবেশনে প্রদেয় তথ্যের পরিসংখ্যানে। অধিবেশনে বলা হয় ‘পুস্তক বিক্রি বাবদ যথেষ্ট আয় হয়েছে। ... অবশ্য এখান থেকে যে-সমস্ত সংস্কৃত-আরবি-ফার্সি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল তার অধিকাংশই ক্রেতার অভাবে গুদামজাত হয়ে পড়ে থাকত। বাংলা ও ইংরেজি পুস্তকের চাহিদাই ছিল সর্বাধিক। ১৮৩০ সনের হিসাব অনুসারে দেখা যাচ্ছে, এক বছরের মধ্যে ৯,৬১৭ খানি ইংরেজি এবং ১০,৭৪ খানি বাংলা পুস্তক বিক্রিত হয়েছিল। [১০] আর ১৮৩৪ সালের পাঠ্য বিষয়ে ছাত্র সংখ্যার পরিসংখ্যান অসিতকুমার ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ষষ্ঠ খণ্ড)’ দিয়েছেন তা হল: হিন্দু কলেজে ৩৩৮ জন, স্কুল সোসাইটির পাঠশালায় ৩০৩ জন, ডাফ সাহেবের স্কুল ৩৫০জন, চার্চ মিশনারি স্কুলে ২০০ জন, ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ২০০ জন, ইউনিয়ন স্কুলে ৭০ জন, হিন্দু জুভেনাইল স্কুলে ৯০ জন, নূতন হিন্দু স্কুলে ৪০ জন, হিন্দু বেনাভোলেন্ট স্কুলে ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন। এই হিসেব থেকে তিনি দেখিয়েছেন তখন কলকাতার বিভিন্ন পাঠশালা ও স্কুলে ইংরেজি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৮৬০ জন। এর

পরবর্তীকালে ইংরেজি শিক্ষা শুরু হলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতকের শুরুতে বাঙালিরা ইংরেজি ভাষা শেখার চেষ্টা করতে থাকে। আসলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বণিক স্বার্থ ছাড়া আর অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তাই কোম্পানি আশঙ্কা করে, দেশীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন ঘটালে আমেরিকার মতোই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। তাই কোম্পানির কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্বার্থ ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে, নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত শাসন-শোষনের উদ্দেশ্যে সর্বোপরি, তাদের সামাজিক স্থিতি বজায় রাখতেই দেশীয়দের সংস্কৃত নেশায় বুঁদ করে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোম্পানির শাসনে গড়ে ওঠা নতুন মধ্যবিত্ত বাঙালিদের চেষ্টাতেই ইংরেজি শিক্ষা নাগরিক সমাজে প্রাধান্য লাভ করেছিল।

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে সরকারি শিক্ষানীতিতে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনেন টমাস ব্যাবিংটন মেকলে। লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকালে (১৮২৮-১৮৩৫) গভর্নর জেনারেল সভার (১৮৩৪) সদস্য মেকলে শিক্ষা সচিব হিসেবে ভারতের আসেন এবং 'General Committee of Public Instruction' এর সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। আর এসময় এদেশীয়দের শিক্ষাদান নিয়ে কমিটি দুটি দলে- প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদীতে বিভক্ত হয়। শিক্ষা কমিটির প্রাচ্যপক্ষে হোরেস হেম্যান উইলসনের দল, যারা সংস্কৃত শিক্ষাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন আর একপক্ষে মেকলের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য পক্ষের দল, যারা শিক্ষায় ইংরেজিভাষাবাহী জ্ঞানবিজ্ঞান বিকাশের দ্বারা শিক্ষাদানের কথা বলেছিলেন। তাঁরা যুক্তি খাড়া করেছিলেন বিজ্ঞান আলোকিত পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে এদেশের অনগ্রসর, মধ্যযুগীয় বর্বরতা, অলস জাতি তাদের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাবে। পরে অবশ্য এই বিতর্কে উইলসনের দলে পরাভূত হয়ে মেকলের দল জয়ী হয়েছিল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি মেকলে তাঁর শিক্ষানীতি বিষয়ক বিখ্যাত প্রস্তাব (Minutes) ৩৬ টি সনদ আকারে বড় লর্ডের কাছে পেশ করেন। তাঁর এই প্রস্তাবগুলিতে তিনি প্রাচ্যের সভ্যতাকে কুসংস্কার, দুর্নীতি, অপবিত্রতা, নির্বুদ্ধিতা প্রভৃতির দ্বারা বিদ্ধ করে পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন শিক্ষিত ভারতীয় বলতে শুধু প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের বোঝায় না। তাঁর মতে "a native

who was familiar with the poetry of Milton, the metaphysics of Locke, and the physics of Newton;" [১১] অর্থাৎ মিলটনের কাব্য ও জন লকের দর্শন সম্পন্ন ভারতীয়ই হলেন প্রকৃত শিক্ষিত। শুধু তাই নয় তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার তুলনা করতে গিয়ে বলেন "I have never found one among them who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia." [১২] তিনি মনে করেন আরবীয় ও ভারতীয় জ্ঞান ভাণ্ডারের যে ঐশ্বর্য আছে তা ইউরোপের কোনো একটি ভালো গ্রন্থাগারের সামান্য অংশ। তাই ভারতীয়দের পুনরুজ্জীবন ও নৈতিক উন্নতির জন্যও পাশ্চাত্য জ্ঞান প্রয়োজন। তিনি লর্ডকে জানান পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার হবে 'ক্রম নিম্ন পরিস্রুত নীতি' অনুযায়ী অর্থাৎ উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে বিস্তৃত হলে তা ধীরে ধীরে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। তিনি লেখেন, "In India, English is the language spoken by the ruling class. It is spoken by the higher class of natives at the seats of Government. It is likely to become the language of commerce throughout the seas of the East."[১৩] ইংরেজি ভাষা শাসকের ভাষা, উচ্চবিত্তের ভাষা এবং বাণিজ্যের ভাষা। তাই সরকারের দায়িত্ব হবে উচ্চবিত্ত শ্রেণিকে শিক্ষিত করে তোলা। সর্বোপরি শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মেকলে বলেন যে, ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্য এমন একটি শ্রেণি তৈরি করা যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় থাকলেও প্রবৃত্তি, মতাদর্শ, নীতিবোধ ও বৃত্তিতে হবেন সম্পূর্ণ 'ইংরেজ'। তাঁর প্রস্তাবে আমরা সেই আদর্শক প্রতিফলিত হতে দেখতে পাই, "a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect. To that class we may leave it to refine the vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from the Western nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population." [১৪]

মেকলের মত অনুসারেই বেন্টিঙ্ক ইংরেজি ভাষাকেই আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের সরকারি নীতি বলে সিলমোহর প্রদান করেন। আমাদের মনে রাখতে হবে মেকলে বা গভর্নমেন্টের এই ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে কোম্পানির কেরানিকুল তৈরি করার কোনো উদ্দেশ্য না থাকলেও ইংরেজি শিক্ষার শুরুতে, কোম্পানির প্রয়োজনে কিন্তু একদল কেরানিই তৈরি হয়েছিল। কারণ ইংরেজ বণিকদের ব্যবসাবাণিজ্যের কাজ চালানোর জন্য প্রথমে ইংরেজি শিক্ষার কিছুটা প্রয়োজনীয়তা এবং পরে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর গুরুত্ব অনেকাংশেই বেড়ে যায়। অন্যদিকে, খ্রিস্টান মিশনারীরা নিজেদের ধর্ম প্রচারের জন্য প্রথমে নিজেরা বাংলা শিখে বাঙালিদের ইংরেজি শিক্ষা দিতেন। তবে কলকাতায় ‘প্রেসবাইটারিয়ান চার্চে’ ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দেই ইংরেজি শিক্ষার বিদ্যালয় এর অনেক আগেই খোলা হয়েছিল। যদিও এখানে কলকাতায় আগত পর্তুগীজ, ফিরিঙ্গি, ইংরেজ আর্মানিয়ান প্রভৃতি অবাঙালিদের শিক্ষা অধ্যয়ন করানোই ছিল মূল উদ্দেশ্য, এর সঙ্গে বাঙালির কোন সম্পর্ক ছিল না।

খ্রিস্টান মিশনারীরাই বাংলাদেশে প্রথম প্রাথমিক ইংরেজি স্কুল স্থাপন করে– যে স্কুলগুলিতে ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি মাতৃভাষা ও পাশ্চাত্য প্রণালীতে সাহিত্য, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি বিষয় শেখানো হত। পরে স্কুলের উপযোগী ইংরেজি ও বাংলা পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘স্কুল বুক সোসাইটি’। ইংরেজ ও বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের কিছু অভিজাত ব্যক্তির সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘হিন্দু কলেজ’; এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের ন্যায় উদার প্রণালীতে শিক্ষা দান করা। পরবর্তীতে ‘General Committee of Public Instruction’ প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু কলেজকে পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং কোম্পানি এই সময় থেকেই স্বহস্তে শিক্ষার ভার গ্রহণ করে। কিন্তু একথা আমাদের মনে রাখতেই হয় যে ‘শাসক নয়, শাসিত প্রজারাই এদেশের যাবতীয় শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করেছিল, অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছিল। বাংলাদেশে উনিশ শতকি শিক্ষার মূলে বাঙালী সমাজের দানই সর্বাধিক।’[১৫] কারণ হিন্দু কলেজের পরিকল্পনা, অর্থ, কলেজের চার্টারের ৩৪টি ধারা সবই ছিল হিন্দুদেরই। কলেজের পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে বর্ধমানের মহারাজা গোপিমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, পাইকপাড়ার সিংহরা। এরাই তাদের সন্তানদের ইংরেজি

ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তবে সাহেব বানাতে নয়। তাদের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ইংরেজি হলেও বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, রসায়ন ও অন্যান্য বিজ্ঞানের পাঠ নিত ইংরেজিতে।

বাংলার রেনেসাঁস:

ইংরেজি মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাংলাদেশের সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি ও সংস্কৃতির এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করে একথা স্বীকার্য। মানুষের মনে প্রচলিত মধ্যযুগীয় চিরাচরিত প্রথা, ধ্যান ধারণা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বদলে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান চেতনা দেখা যায়। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, "ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক চেতনা, দেশপ্রীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে সমুদয় উন্নতি বাঙ্গালীকে গৌরবের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠাইয়াছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার বিন্দুমাত্র সূচনা বা সম্ভাবনা দেখা যায় নাই। এই সমুদয় গুরুতর পরিবর্তনের ফলে বাঙ্গালী জাতীয় জীবনে যে নবজাগণের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং যাহা ক্রমে সমুদয় ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া নবীন ভারত গঠন করিয়াছে, পৃথিবীর যে-কোন দেশের ইতিহাসে তাহা এক গৌরবময় অধ্যায় বলিয়া পরিগণিত হইবে।"[১৬] রমেশচন্দ্র রায়ের মত অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তিরা সকলেই একে 'নবজাগরণ' বা 'রেনেসাঁস' বলে এক বাক্যে স্বীকার না করলেও বাংলা, বাঙালি তথা ভারতবর্ষের যে পরিবর্তন হয়েছিল তা সকলেই মানেন। এই 'রেনেসাঁস' বা 'নবজাগরণে'র চিন্তা-চেতনা কিন্তু কোন একদিনে হঠাৎ করে দেখা যায়নি। এর সূচনা হয়েছিল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে ইতালীর ফ্লোরেন্স শহরে– যেখানে চার্চের শাসনে ধর্মের নামে মানুষকে, তার আত্মবিশ্বাসকে, চেতনাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছিল। আর এর থেকে মুক্তি পেতেই সেই শাসনকে অস্বীকার করে মুক্তমনা, উদার গ্রীক সংস্কৃতির প্রতি ঝুঁকেছিল সেদিন। বাংলায় বা ভারতে ঠিক তেমন ঘটেছিল কিনা তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই। তবে একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে 'আমাদের রেনেসাঁস ইউরোপীয় রেনেসাঁসেরই মতো মধ্য যুগের অন্ধকার থেকে আধুনিক যুগের আলোক উত্তরণ'।[১৭] কিন্তু তার পরেও ইতালির রেনেসাঁসের

সঙ্গে ভারতের রেনেসাঁস এক নয়। কারণ বাংলার রেনেসাঁস গ্রীসের দিকে তাকায়নি, তাকিয়েছে আধুনিক ইউরোপের দিকে। "ওদের রেনেসাঁস এসেছিল প্রাচীন গ্রীস রোমের সঙ্গে ছিন্ন যোগসূত্র পুনরুদ্ধার করতে। আমাদের বেলা প্রাচীন ভারতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি, সুতরাং পুনরুদ্ধারের কথা ওঠে না। আমাদের রেনেসাঁস এসেছিল আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে নতুন করে যোগসূত্র স্থাপন করতে। মাঝখানে ছিল বহু সমুদ্রের তথা বহু শতাব্দীর ব্যবধান। সমুদ্র লঙ্ঘন করা তত কঠিন নয় শতাব্দী লঙ্ঘন করা যতটা কঠিন। একটা পিছিয়ে পড়া দেশকে এগিয়ে যাওয়া কালের সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে, এই ছিল আমাদের রেনেসাঁসের আহ্বান।"[১৮]

১৭৮৪ সালে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উইলিয়াম জোন্‌স, ম্যাক্স মুলার, কানিংহাম ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত একাধিক ব্যক্তিবর্গরা গবেষণা করে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে দেশবাসীর সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। ফলে উনিশ শতকে বাংলায় দেখা যায় একদিকে ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আর অন্যদিকে দেহ-মন-বুদ্ধির সর্বাত্মক জড়তা ও আবিলতা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা আর এর থেকেই 'নবজাগরণ' বা 'রেনেসাঁস'-এর উদ্ভব। আসলে "চলমান মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য, ইতালীর হিউম্যানিস্টরা যেমন প্রাচীন গ্রীক-লাতিন আদি অন্যতর সংস্কৃতির হাত ধরেছিল, বঙ্গীয় রেনেসাঁসেও প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা এবং আধুনিক জীবনবাদী ইওরোপীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করা– এই দুইয়ের মধ্য দিয়ে সেদিন বঙ্গসংস্কৃতিকে মধ্যযুগ থেকে সরিয়ে এনে আধুনিকতার মর্মকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত করে এবং বিশ্বমানে পৌঁছে দেয়।" [১৯]

'নবজাগণে'র অগ্রদূত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। প্রচলিত শাস্ত্রাচারের সংকীর্ণতা ও অন্ধতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির আলোকে পথ দেখে রামমোহন তাঁর জীবনের যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন। কারণ তিনি দেখেছিলেন হিন্দুধর্মের মধ্যে পৌত্তলিকতা, নানা কুসংস্কারাচ্ছন্নতা– যেমন গঙ্গা বক্ষে, সাগরে, জগন্নাথের রথের নীচে আত্মহনন করা এবং সতীদাহ ইত্যাদি হিন্দু ধর্ম তথা গোটা সমাজকে পচন ধরিয়েছিল। আর তাই তিনি নবজাগণের

আলোককে প্রজ্জ্বলিত করতে 'বেদান্ত গ্রন্থে'র ভূমিকা থেকে আরম্ভ করে উপনিষদের অনুবাদ প্রসঙ্গে বার বার 'লোক' শব্দের ব্যবহার করেছেন। যে 'লোক' অর্থে তিনি বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজকেই বুঝিয়েছিলেন যাদের সার্বিক উন্নতি ও বিকাশ সাধনে সচেষ্টই ছিল তার সমগ্র জীবন। তাই তিনি কোনো কিছুকে ন্যায্য মনে করলে তাতে উঠে দাঁড়াতে কোনো রকম কুণ্ঠিত বোধ করতেন না। সেজন্যই তাঁকে দেখি নারী-পুরুষের জন্য সমান আইনের কথা বলেছেন, সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য অন্দোলন ও আইন পেশ করেছেন, সমুদ্রযাত্রার মতো কুসংস্কারকে উপেক্ষা করে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। এবং ১৮৩১ সালের কোম্পানির রাজস্ব ও বিচার ব্যবস্থা ও রায়তদের অবস্থা তথা ভারতবর্ষের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে বিবৃতি পেশ করেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে। এছাড়া তাঁর সমুদ্রযাত্রা করে ইংল্যান্ড যাওয়ার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষায় ও সভ্যতায় উন্নত একটি দেশকে প্রত্যক্ষ করা। তাদের সংস্পর্শে এসে এদেশের অধিবাসীদের কুসংস্কার দূর হবে এবং ইউরোপীয়ানদের সাহায্যে দেশময় ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটবে। যা একদিন ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের একসূত্রে আবদ্ধ করতে পারবে বলে মনে করতেন। আসলে রেনেসাঁস এসেছিল মানুষকে শাস্ত্র থেকে, দেবতা থেকে, কুসংস্কার থেকে, কুপ্রথা থেকে, সব অসাম্য থেকে সর্বদেশে ও সর্বপ্রকারে মুক্ত করতে।

রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ভারতীয়দের মধ্যে যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বীজ রোপণ করেছিলেন তা পরিস্ফুট ও লালিত করে বড় করেছেন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)। তাঁর পাশ্চাত্য ও ভাষা সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বঙ্গ সংস্কৃতিতে নতুন রক্তের সঞ্চার করেছিল। আমরা দেখতে পাই তাঁর শিক্ষকতার সুবাদেই 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে একদল মননশীল ও যুক্তিবাদী ছাত্রের আবির্ভাব হয় - যারা সবকিছু প্রশ্নহীনভাবে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে সবকিছুতেই যুক্তি খোঁজে। আর এই বঙ্গীয় সংস্কৃতির তরুণ জাতকেরা সেদিন জাতি, ধর্ম, ভাষা, দেশ-কালের জন্ম প্রদত্ত গণ্ডিকে অতিক্রম করে বিশ্বসংস্কৃতির যাত্রী হয়েছিল। তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতীয় ছাত্ররা লক্, হিউম, বেকন, বার্কলে, রীড, টম পেইন, ভলতেয়ার, রুশো প্রমুখ দার্শনিক ও ফরাসী বিপ্লবের চিন্তা ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল।

ইউরোপের সঙ্গে বাংলার প্রথম পরিচয় হয়েছিল ব্যবসাবাণিজ্য সূত্রে। ক্রমে বাঙালিরা সেই বণিকদের জীবন-জীবিকা, সমর প্রণালী ও যুদ্ধকৌশলের মধ্যে দিয়ে তাদের নির্মমতার পরিচয় পেয়েছিল। বণিক ও রাষ্ট্রলোলুপ ইংরেজ মধ্যবিত্ত বাঙালি যুবককে যৎসামান্য ইংরেজি শিখিয়ে কেরানি তৈরি করে কাজ-কারবারে সুবিধা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ঘটনা ঘটল তার বিপরীত। কেরানী, মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, সৃষ্টি করল নিজস্ব শিপ সরকার। আর বাঙালি ইংরেজি ভাষার মারফতে নবজীবনের স্বপ্ন দেখল রাজনীতি। ইংরেজি ভাষাবাহী পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলেই বাংলাদেশ ও বাঙালির দর্শন, শিক্ষা, সমাজ ও সমাজ জীবনের আমূল সংস্কার নিয়ে এল।

বাঙালির ইউরোপ ভ্রমণের সূচনা:

প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালিরা ভ্রমণ পিপাসু। আমরা একাধিক শাস্ত্র ও ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ থেকে বাঙালিদের সমুদ্রযাত্রার নিদর্শন পেয়ে থাকি। কিন্তু পরবর্তীকালে পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে সমুদ্রযাত্রা ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বাঙালিদের সমুদ্রযাত্রা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নানা ধর্মীয় অনুষঙ্গ– যা কালাপানি পার হয়ে সমুদ্র যাত্রায় যাওয়া মানেই সমাজ নিষিদ্ধ কাজ বলে মনে করা হত। তবে এই বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই সমাজের আর্থিক দিক থেকে নিচুতলার কিছু মানুষ কিন্তু বিলেত যেতে আরম্ভ করে। কারণ এদের কাছে সমাজ ধর্মের মান্যতা করা বা না করার কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। যত সমস্যা ছিল সমাজের মধ্যবিত্ত মানুষজনের। আবার মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের যতটা সমস্যা ছিল, তার থেকে অনেক বেশি সমস্যা ছিল হিন্দু মধ্যবিত্তের। কিন্তু তার পরেও সমাজের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত উভয় শ্রেণির লোকেরাই সংখ্যায় খুব কম হলেও নিষিদ্ধ কালাপানি পেরিয়েছিল। আর উচ্চবিত্ত মানুষেরা সমাজের নিয়ম-নিষ্ঠার তোয়াক্কা না করেই সাতসমুদ্র পেরিয়ে ইউরোপ ভ্রমণ করতেন।

সপ্তদশ শতকে সমাজের নিচুতলার খেটে খাওয়া কিছু মানুষজন বাংলা থেকে বিলেত তথা ইউরোপে গিয়েছিলেন দাস হয়ে। শুধু বাংলা নয়, তখন সারা ভারতেই দাস প্রথার রীতিমত চল ছিল। আলু-পটলের মতোই সেদিন মানুষ কেনা-বেচা চলত। এর সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান-ইংরেজ-ফরাসি সকলেই যুক্ত ছিল; ইতিহাসে এর একাধিক তথ্য প্রমাণ মেলে। আসলে দাস বা ক্রীতদাসের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, মানুষ মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল কেবলমাত্র মুনাফার লোভে। আরও অর্থ, আরও সম্পদ, আরও সুখের জন্য – যে 'আরও'র কোনো দিন শেষ থাকে না, তার জন্য। একালের মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ বলেন, "দাসপ্রথার মূলে জাতিবিদ্বেষ নয়, বরং জাতিবিদ্বেষ দাস প্রথারই ফল।"[২০] তবে এদেশের দাস প্রথার ব্যাপারে পর্তুগীজরা পথিকৃৎ। কারণ আরাকান, চট্টগ্রাম, ঢাকা, সন্দ্বীপ, হুগলী, বজবজ সর্বত্র পর্তুগীজ হার্মাদ আর বোম্বেটেরা বছরের পর বছর মায়ের কোল, গৃহস্থের সংসার শ্মশান করে বেড়িয়েছিল। আমরা জানতে পারি ১৭৬০ সালে বজবজের কাছাকাছি আক্রাতে তাদের

একটা 'দাস গুদাম' তৈরি করেছিল।[২১] মগেরাও ছিল তাদের মতো। এরাও দক্ষিণ বাংলা থেকে ছেলে-মেয়ে ধরে আরাকানে নিয়ে যায়। তারা দেখল এই বেওয়ারিশ দেশে কোনো রকম হাঙ্গামা-হুজ্জত ছাড়াই দাস ব্যাবসা সম্ভব। এইসময় বাংলায় আগত নয়া নয়া সিভিলিয়ানদের হাতে তখন মুঠো মুঠো টাকা; ক্রেতার অভাব নেই। বাংলার সন্তানেরা কুড়ি থেকে সত্তর টাকায় সেদিন ইংল্যান্ডের প্রকাশ্য বাজারে বিক্রি হতে থাকে তাদের হাতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্যার উইলিয়াম জোন্স বলেছেন, "সম্ভবত আপনাদের অনেকেই দেখেছেন কলকাতার খোলা বাজারে বিক্রির জন্যে এমনই ছেলে-মেয়েতে ভরতি কত বিরাট নৌকো ভেড়ে নদীতে। অস্বীকার করার উপায় নেই, এদের অধিকাংশকেই তাদের মা-বাবা কাছ থেকে অপহরণ করে অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে এক মুঠো চালের পরিবর্তে সংগ্রহ করা হয়েছে।"[২২] ব্রিটিশ বন্দর এলাকায় সেদিন হামেশাই মেয়ে, পুরুষ, শিশু প্রায় সকলেই হারিয়ে যেত। শহর বন্দরের চারপাশে গায়ে গায়ে ঘুরে বেড়াত বেপারির চরেরা, তারাই সাদাসিধে কিংবা দরিদ্র মানুষদের হাতের নাগালে পেয়ে টেনে নিয়ে যেত বন্দরে, নোঙর করা জাহাজে। তারপর জাহাজের খোলে করে এই হতভাগাদের নিয়ে পৌঁছোত নিউ ইংল্যান্ডের বন্দরে। তবে এদের জাহাজে নিয়ে যাওয়ার কাহিনি ছিল আরও কঠিন। সাহিব-উদ্দীন-তালিশ তাঁর লেখায় বলেছেন, "ওরা আসে, হিন্দুমুসলমান যাদেরই সামনে পায়, ধরে নিয়ে হাতের চেটোতে বেত ফুটিয়ে এক সঙ্গে বাঁধে, তারপর নৌকোর খোলে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। প্রতিদিন সকালে ওরা পাটাতনের ওপর থেকেই ভেতরে ক'মুষ্টি শুকানো চাল ছিটিয়ে দেয়, ঠিক যেমন আমরা মুরগীদের খাওয়াই। ... চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত নদীর দু' ধারের গ্রামগুলো আজ ওদের দৌরাত্ম্যে জনশূন্য। সর্বত্র হাহাকার। ... বাংলার জেলে-মাঝিরা আজ ওদের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত।"[২৩] আমরা শ্রীপান্থের 'ক্রীতদাস' বই-তে দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে জানতে পারি, প্রতি বছর বাংলা থেকেই গড়ে প্রায় তিন থেকে চার হাজার মানুষকে তারা এভাবে নিয়ে যেতেন। এঁরা ইংল্যান্ডে গিয়ে বেশির ভাগই ইংরেজদের গৃহভৃত্য বা আয়ার কাজ করতেন। আবার অনেক সময় সেখান থেকে খেত-খামারে শ্রমিকের কাজে বা অন্য কোনো উপনিবেশে এঁদের চালান করে দেওয়া হত। কারণ এই বাঙালি দাস বা ক্রীতদাসেরা ছিল খুবই শান্ত, নম্র ও বিশ্বস্ত স্বভাবের; সহজেই পোষ

মানত প্রভুর কাছে এবং গায়ে-গতরে প্রচুর পরিশ্রমও করতে পারতেন। কিন্তু পারিশ্রমিক পেতেন খুব সামান্যই। কোম্পানির আসল কর্ম-কর্তারা থাকতেন খামার বা বাগিচা থেকে অনেক দূরে, কখনো লন্ডন, কখনো বার্মিংহাম আবার প্যারিস কিংবা আমস্টারডামে। খামারে খামারে থাকতেন মাইনে করা কুঠিয়াল, নানা ধরণের অফিসার, ওভারসিয়ার প্রোটেকটার— যারা সবাই আসলে নানা মাপের লুঠেরা। ফলত এদের সবাই মজুরির ভাগ নিতে নিতে দাস শ্রমিকদের ভাগে আর অবশিষ্ট কিছু থাকত না। এর পরেও তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে, জীবন ধারণ করতে সেদিন যে-কোনো জীবিকাকেই বেছে নিয়েছিল। অনেকে বিদেশকেই স্বদেশ বানিয়েছিল স্বদেশে ফিরতে না পেরে। ১৬৭৪ সালে পীটার লেলির আঁকা ছবি থেকে এরকমই একটি প্রমাণ মেলে। আমরা ছবিতে দেখি একটি ভারতীয় কাজের মেয়ে ইংরেজ পরিবারের একটি সন্তানকে দেখাশুনা করছে।[২৪] এছাড়াও লন্ডনের ভারতীয় কিছু ব্যক্তিকে রাস্তায় ঝাঁট দিয়ে ভিক্ষা করতেও দেখা যায়।[২৫] আর কিছু পুরুষলোকেরা সেই সময় বিলেতে যেতেন জাহাজের লস্করের কাজ নিয়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপ থেকে এদেশে সাধারণত ইংরেজ পুরুষরাই আসতেন। নারী বা যুবতীরা আসত কালেভদ্রে। এই অভাবের দরুণ সাহেব-সুবাদের মধ্যে এ দেশীয় উপপত্নী রাখার প্রচলন অধিক পরিমানে ছিল। আমরা উদাহরণ স্বরূপ দ্বারকানাথের ইংরেজি শিক্ষক শেরবোর্ণ এর পিতার কথা বলতে পারি, যিনি বিবাহ করেছিলেন এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে। শেরবোর্ণ একজন খাঁটি শ্বেতাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও নিজের মা হিসেবে হিন্দু রমণীর কথা দ্বারকার পিতাকে বলে ও চিত্র দেখিয়ে গর্ব অনুভব করেছিলেন। আবার আমরা বেনিয়ান ও জেনারেল বেনোয়া দা বোয়ান এই দুই বিদেশির কথা বলতে পারি, যারা বিয়ে করেছিলেন— লক্ষ্ণৌ এর একটি অভিজাত পরিবারের দুই মেয়েকে। এরকমই এক ভারতীয় মা আর ইংরেজ পিতার সন্তান হল অ্যামেলিয়া জেনকিন্স, যিনি ১৭৬৯ সালে বিলেতে গিয়ে বসবাস ও বিয়ে করেন আর্ল অব লিভার পুলকে। তাঁর পুত্র রর্বাট পরবর্তীতে প্রথমে পার্লামেন্টের সদস্য ও পরে ১৮১২ সালে ইংল্যান্ডে পনেরো বছরের জন্য প্রধানমন্ত্রী হন। এছাড়াও মীর্জা আবুতালিব খান তাঁর ভ্রমণ কাহিনিতে পূর্ণিয়ার মহারাজার এক বিধবা কন্যার কথা বলেছেন, যাকে বিয়ে

করেছিলেন জেরার্ড ডুকারেল নামে এক ফরাসী ব্যক্তি। যিনি পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে ইংল্যান্ডে বসবাস করেন। আবার কোনও কোনও ইংরেজ ভারতে থাকার সময়ে ভারতীয় নারীদের প্রতি মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করে (সেটা সংখ্যায় খুব কম হলেও) অথবা বলপূর্বক বিলেতে নিয়ে যেতেন। তবে উল্লেখ্য, এই সকল ভারতীয় মহিলারা স্ত্রীর মর্যাদা কতটা পেত তা নিয়ে অনেকটা সন্দেহ থাকলেও রক্ষিতা হিসেবে এদের স্থান হত এটা আমরা বলতে পারি। কারণ সে সময় ইংল্যান্ডে, ইংল্যান্ডের তুলনায় অনেক কম মূল্যে ভারতীয় রক্ষিতা রাখা সম্ভব হত। তাই ভারতে আসা ইংরেজের যত না বিবাহিত স্ত্রী থাকত তার থেকে বেশি থাকত রক্ষিতা। এই 'রক্ষিত'রা তাঁদের দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বাঙালি 'রক্ষিতা'দেরও ইউরোপে নিয়ে যেতেন। আবার গৃহভৃত্যরা নিজেরাও কখনো কখনো তাঁদের দীর্ঘদিন একই পরিবারে কাজ করার ফলে অনেক সময় মায়ার টানে অথবা স্বেচ্ছায় বা বলা চলে খানিকটা সচ্ছলতার আশায় জীবনযাপন করতে সাহেব বা মনিবের সঙ্গে ইউরোপে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করতেন। এইসব আয়া, ভৃত্যরা বিলেতে পৌঁছানোর পরে অনেক সময়ই আর দেশে ফিরতে পারতেন না। কারণ এঁদের মুনিবরা দেশে পাঠানোর অর্থ ব্যয় করতে চাইতেন না। ফলে এই আয়া বা ভৃত্যরা মুনিব মারা গেলে শেষ পর্যন্ত অসহায় অবস্থায় দিন কাটাত। কেউবা ভারতে আগমনরত ইংরেজ বণিকের বিনা পারিশ্রমিকে ভৃত্যের কাজ করে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করতেন। বেশিরভাগ যারা দেশে ফিরতে পারতেন না তাঁরা শহরের রাস্তায় ঘুরে ভিক্ষা বা ফেরি করে জীবন কাটাতেন। আবার শুধু জীবনযাপন করতে কেউ কেউ ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান ধর্ম, কেউ রক্ষিতা, কেউবা বেশ্যাবৃত্তিও গ্রহণ করতেন। ১৮৪৯ সালের 'টাইমস' পত্রিকায় এরকম ভারতীয় ভিখারি এবং তাঁদের দুরবস্থার কথা আমরা জানতে পারি।[২৬] এভবে উনিশ শতকে ক্রমশ বিলেত তথা ইংল্যান্ডে ভারতীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর পরবর্তীকালে ভারতফেরত ইংরেজ 'নবাব'দের ইউরোপের মাটিতে একজন ভারতীয় ভৃত্য বা আয়া রাখা একটি ফ্যাশান ও আভিজাত্যে পরিণত হয়ে দাঁড়ায়। যার যত দাস তার তত বেশি খাতির, তত বেশি নাম ডাক। আমরা এও জানতে পারি কখনো কখনো সাহেব ইংরেজ বিলাসিতার উপহার স্বরূপ তার স্ত্রীর হাতে তুলে দেয় দাসটিকে। অষ্টাদশ শতকে কলকাতার ইংরেজি সংবাদপত্রের একটি বিজ্ঞাপন তার-ই প্রমাণ

দেয়। বিজ্ঞাপন "হারাইয়াছে। মেমসাহেবের সেবাযত্নে নিযুক্ত ২০/২১ বা তার কাছাকাছি বয়সের একটি ক্রীতদাস নিখোঁজ হইয়াছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, ছিপছিপে লম্বা গড়ন, চোয়াল চওড়া, মুখে বসন্তের দাগ। সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হইতেছে, বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর কেহ তাহাকে কেরানি কিংবা অন্য কোনও পদে বহাল করিবেন না। আর যদি কোনও ভদ্রলোক তাহার সন্ধান পান এবং ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই বিজ্ঞাপনদাতার নিকট তাহা জ্ঞাপন করেন, তবে তাঁহাকে যথোপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করা হইবে।"[২৭] তাই অর্থসঙ্গতি থাকলে সঙ্গে একজন ভারতীয় ভৃত্য অথবা আয়া নিয়ে দেশে ফেরার চেষ্টা করতেন।

আঠারো শতকের শেষ তিন দশক ও উনিশ শতকের শুরুতে কয়েকজন মুসলমান শিক্ষক ইউরোপে গিয়েছিলেন। এঁরা ইউরোপে স্বেচ্ছায় যাননি, নিয়ে গিয়েছিলেন ইউরোপীয়ানরাই। এদেশে এইসময় রাজার পরিবর্তন হলেও রাজভাষার পরিবর্তন হয়নি। কারণ আপিস-কাছারির ভাষা, আইন-আদালতের ভাষা, পুরানো বিষয় সম্পত্তিগুলির দলিল-দস্তাবেজ তখনও ফার্সি ভাষায় লেখা। ইউরোপীয়রা খুব ভালো করে বুঝেছিলেন এদেশে বিষয় কর্ম করতে হলে, প্রভাব বিস্তারে এভাষা না শিখে উপায় নেই। তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই ব্যক্তিগত ফার্সি মুনশি রাখলেন অনেকে। এই আরবি-ফার্সি ভাষার শিক্ষক মোহাম্মদ ইসমাইল কোম্পানির এক স্কটিশ কর্মচারী ক্লড রাসেল-এর দৌলতে ১৭৭২ সালে বিলেত যান ব্যক্তিগত ফার্সি মুনশি হিসেবে। এছাড়াও উনিশ শতকের গোড়ায় আরবি-ফার্সি শিক্ষক হিসেবে যেসমস্ত ব্যক্তিগণ ইউরোপে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন গোলাম হায়দার, মৌলভি মীর আবদুল আলি, মীর্জা খলিল ও মীর হাসান আলি প্রমুখ। এরা সকলেই লন্ডনে হেইলিবেরি কলেজে আরবি-ফার্সি শেখানোর কাজ করতেন। দেশীয় লোকেদের উপরও ফার্সি ভাষার প্রভাব কতটা পড়েছিল তা দ্বারকানাথের পিতা রামলোচনের স্বরে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। রামলোচনের এধারণা একেবারে অমূলক ছিল না। কারণ পরবর্তীকালে দ্বারকানাথ প্রতিমাসে বহু সহস্র আয় করতেন শুধু দলিলের অনুবাদ থেকেই। তখন ইংরেজি ভাষা হয়ে উঠেছিল সাফল্যের চাবিকাঠি। শুধুমাত্র এই ইংরেজি ভাষার জোরে অনেক লোকে সেদিন বছর ঘুরতে না ঘুরতেই লক্ষপতি হয়েছেন। মোহাম্মদ হোসেন ইংল্যান্ডে বিজ্ঞানের উন্নতি দেখতে যান ১৭৭৬ সালে। সেখানে

বিজ্ঞানচর্চার পাশাপাশি জ্যোর্তির্বিজ্ঞান ও অ্যানাটমির উন্নতি দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, এইসময় সবে শ্রীরামপুর থেকে খ্রীস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছেপে বেরিয়েছে। রামলোচনবাবু তা সংগ্রহ করে পড়েছিলেন— এর থেকেই বোঝা যায় তিনি কতখানি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিষয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

আঠারো শতকে খুব কম সংখ্যক বাংলাভাষী ভারতীয়রা ইউরোপে গিয়েছিলেন। আমরা এই শতকের তৃতীয় দশকে দুজন মুসলমান ও একজন হিন্দুর কথা বলতে পারি যারা ইউরোপে গিয়েছিলেন– এঁরা হলেন মীর্জা সৈয়দ শেখ ইতেশাম উদ্দীন এবং মীর্জা আবু তালিব খান। এঁরা দুজনেই মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনে কিছুদিন চাকরি করেন ও পরে ইংরেজ কোম্পানির অধীনে কাজ করেন। এই সুবাদেই কোম্পানির সেনা-কর্মকর্তা এবং স্কটিশ ডাক্তার ক্যাপ্টেন সুইন্টনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে, বিশেষ করে বলা যায় ইতেশাম উদ্দীনের। কারণ এই সময় সম্রাট মীরজাফর তার প্রতিনিধি হিসেবে ইতেশাম উদ্দিনকে সুইন্টনের সঙ্গী করে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন পাওনা আদায়ের জন্য। যদিও সম্রাটের চিঠি আর উপঢৌকন লর্ড ক্লাইভের হাতে পড়ায় তা আর কোনো দিন-ই পৌঁছায়নি। ইতেশাম দেশে ফেরার পরে বছর খানেক পরে ১৭৮৪-৮৫ সালে লেখেন ‘শিগরিফ-নামাহ-ই বিলায়েত’ অর্থাৎ বিলাতের আশ্চর্যজনক কাহিনি নামে একটি ভ্রমণ কাহিনি রচনা করেন। এই ভ্রমণ কাহিনিতে তিনি তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজ ও মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজের দেশের একাধিক বিষয় সম্পর্কে তুলনা করেছেন। এই তুলনায় তাঁর কখনো মনে হয়েছে, বিদেশের ফুলের থেকে নিজের দেশের কাঁটাও ভালো। তবে তাঁর তুলনা কখনো একদেশদর্শী ছিল বলে মনে হয় না। কারণ তিনি ইউরোপের ভালো লাগার দিকগুলির সঙ্গে মন্দ লাগার দিকগুলির কথাও সগর্বে উচ্চারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বিলাতের নারীর রূপ স্বর্গীয়, দেশের উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, মেয়েদের লেখাপড়া, মেয়েদের স্বাধীনতা, নাচ-গান শেখানো ইত্যাদির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি সমাজ ব্যবস্থার শাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণকেও ভ্রমণ কাহিনিতে তুলে ধরেছেন। তবে বিলেতের অ-সুন্দরী ও গরিব মেয়েদের বিয়ে না হওয়ায় তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন, তেমনি

ব্যথিত হয়েছিলেন সেদেশের মানুষের কাছে নিজে কালা আদমি হিসেবে একটি বস্তুতে পরিণত হওয়ায় ঘটনায়।

আঠারো শতকের একেবারে শেষের দিকে ১৭৯৯ সালে ইউরোপে গিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষিত মুসলমান পর্যটক মীর্জা আবু তালিব খান। তাঁর জন্ম লক্ষ্ণৌতে, তাই তিনি কলকাতায় তিন বছর থাকলেও বাংলা জানতেন না। তিনি শুধু বিলেত বা আয়ারল্যান্ড নয়, ফেরার পথে ফ্রান্স, সুইৎজারল্যান্ড সহ ইউরোপের একাধিক জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন। এবং ১৮০৩ সালের চৌঠা আগস্ট কলকাতায় ফিরে আসেন। এরপর মুর্শিদাবাদে গিয়ে দুই খণ্ডে তাঁর ভ্রমণ কাহিনি ও ইউরোপীয় জীবনযাত্রার বিবরণ লেখেন।

উনিশ শতকে আয়া বা গৃহভৃত্যের তুলনায় ভারতীয়দের মধ্যে অনেক বেশি লোক জাহাজের খালাসি, সারেং, লস্কর বা নাবিক হয়ে ইউরোপে যেতেন। তবে এঁদের বেশির ভাগই ছিল নদীমাতৃক পূর্ববাংলার মানুষজন, তাঁরা শুধুমাত্র কলকাতা থেকে জাহাজে করে যাত্রা করতেন। আমরা একটি পরিসংখ্যান থেকে জানতে পারি যে, ১৮০৩ সালে পূর্বের থেকে লস্করদের সংখ্যা দুশোর বেশি হয়, পরের বছর তার থেকে চারশোর বেশি হয় এবং ১৮০৭ সালে এঁদের সংখ্যা একহাজার ছাড়িয়ে যায়। আবার এই লস্করদের বিলেত তথা ইউরোপে যাওয়ার পর আর দেশে ফেরার মত অর্থ-কড়ি অনেক সময়ই থাকত না। তাই তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পালিয়ে বিলেতের মাটিতেই আস্তানা গাড়তেন। লস্করদের জাহাজে নাবিকের কাজ করে বিলেত যাওয়ার কাজও খুব সহজ ছিল না। কারণ তাঁদের ওপর জাহাজের মালিকেরা নানা রকম অত্যাচার করতেন, এমনকি জানতে পারা যায় কোনো কোনো জাহাজের ক্যাপ্টেন লস্করদের মেরে সাগরের জলেও ভাসিয়ে দিতেন। এর পরেও লস্কররা অনেকটা জেনে বুঝে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ইউরোপে পাড়ি দিতেন। কারণ এই সময়ের দলিল দস্তাবেজ থেকে জানা যায় চাষি এবং সাধারণ শ্রমিকের তুলনায় লস্করের কাজে অর্থ উপার্জন ছিল অনেকটাই বেশি। তবে স্মরণীয় যে, একজন শ্বেতাঙ্গ নাবিকের তুলনায় তা ছিল অনেকটা কম। তা হলেও তাঁদের লক্ষ্য ছিল এই নাবিকের কাজ করে যদি কিছুটা সচ্ছলতার মুখ দেখা যায়, যদি একটু ভালো

থাকা যায়, যদি ভাগ্যের চাকা একটু ফেরানো যায় সেই আশায়। তবে এঁরা দেশে ফিরে আসতে পারলে তাঁদের জীবনে কিছুটা হলেও উন্নতি হত বৈকি। কিন্তু বেশিরভাগ লস্করররা তো দেশে ফিরতেই পারতেন না। এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য উনিশ শতকের গোড়ার দিকে জাহাজের মালিক ও লস্করদের নিয়ে কোম্পানি আইন প্রণয়ন করেন। আইনের প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। লস্করদের দেশে ফেরত পাঠানো, তাঁদের খাদ্য, বাসস্থান নিশ্চিত করবে জাহাজের মালিক। কিন্তু এর পরেও লস্করদের ভাগ্য খুব একটা বেশি বদল হয়নি। আর বিলেত তথা ইউরোপে পৌঁছানোর পরও লস্করদের জীবন যে, খুব আরামদায়ক ছিল তাও নয়; তা আমরা বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ থেকে জানতে পারি। তাঁরাও আয়া বা ভৃত্যের মতোই অনেক কষ্টে তাঁদের জীবনযাপন করতেন। এবং খুব শোচনীয় অবস্থায় মারা যেতেন। উল্লেখ্য, এই সময়ই ভারতবর্ষ থেকে ভৃত্য নিয়ে যাওয়ার 'বণ্ড' চালু হয়েছিল- বিশেষ করে বোম্বাই থেকে যারা যেতেন তাঁরা খুবই এব্যাপারে সচেতন ছিলেন।

এইসকল সমস্যা থাকা সত্ত্বেও উনিশ শতকে ইউরোপে ভ্রমণকারীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এমনকি এই শতকে একাধিক ব্যক্তি বিলেত তথা ইউরোপেই বসবাস করতে শুরু করেন। এই শতকের প্রথম দিকে যারা ইউরোপে বসবাস করতে শুরু করেন তাঁদের অনেকেরই নাম জানা যায় না। কারণ মুনিবদের চোখে এঁরা ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যে এঁদের নাম, বংশ পরিচয় লিখে রাখবে। আবার বহু ইংরেজ আয়া ও ভৃত্যদের সহজে ডাকার জন্য কখনো কখনো একটা ইংরেজি নাম দিয়ে দিতেন – খুব স্বাভাবিক ভাবেই এতে তাঁদের কোনো বংশ পরিচয় থাকত না। এরকম-ই একজন ব্যক্তির পরিচয় পাই, তাঁর নাম হল শেখ দীন মহাম্মদ। তাঁর জন্ম পাটনায় তাই বাঙালিত্ব নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও তিনি ভারতীয় ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি লন্ডনের অভিজাত এলাকা পোর্টল্যান্ডে ১৮১০ সালে প্রথম ভারতীয় কফির দোকান খোলেন এবং পরবর্তীতে ১৮১২ সালে ব্রাইটনে একটি বাষ্পীয় স্নানাগার তৈরি করে বসবাস করতে থাকেন।[২৮]

ইতেশাম উদ্দীন, শেখ দীন মহাম্মদ, মীর্জা আবু তালিব প্রমুখ যে ইউরোপে যেতে পেরেছিলেন তার আংশিক কারণ হিসেবে বলা যায় হিন্দু সমাজের মতো মুসলমান সমাজের বাধা-নিষেধ ততটা প্রকট ছিল না। আর সেই সময় শিক্ষিত মুসলমানেরা কোম্পানির কর্মচারীদের হিন্দুস্থানি ও ফার্সি ভাষা শেখাতেন। কারণ এই কাজে অনেক কম সময়ই ভালো বেতন পাওয়া যেত। এক ঘন্টা শিক্ষাদানের জন্য কেউ কেউ এক গিনি অর্থ পর্যন্ত দাবি করতেন। আর যারা কোম্পানির হেইলিবেরি কলেজে ভাষা শেখানোর কাজ করতেন তাঁরা প্রায় বাৎসরিক দুশো পাউন্ড বেতন পেতেন।

আমরা এযাবৎ দেখলাম সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক পর্যন্ত যে সমস্ত ভ্রমণকারীরা ইউরোপে গেছেন তাঁদের প্রায় সকলেই ‘মুসলিম’ সম্প্রদায়ের মানুষ। কারণ আমরা দেখেছি মুসলমান সমাজের বিধিনিষেধ তেমন শক্ত ছিল না। কিন্তু হিন্দু বাঙালিরা সেভাবে যাননি, অন্তত আমরা ঘনশ্যাম দাসের[২৯] কথা বাদ দিলে আর হিন্দুবাঙালির সন্ধান সেরকম পাই না। এর একাধিক সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। ‘সম্ভাব্য’ বলার অর্থ আমরা ইতিহাসে এর কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ পাই না। তাই প্রথম কারণ হতে পারে সমাজের কঠোর শাসনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে কালাপানির হাতছানিতে সাড়া দিতে খুব কম ব্যক্তিই সাহস করতেন। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে যারা সাহস করে কালাপানি পেরিয়ে ইউরোপে গিয়ে ফিরে আসতেন তাঁদের সমাজ থেকে একঘরে, অচ্ছুত, জাতিচ্যুত হওয়ার ভয়-ভীতি। তৃতীয় কারণ হতে পারে যারা যেতেন তাঁরা তেমন প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ না হওয়ায় তাঁদের নাম নথিভূক্ত করতে ইংরেজ কোম্পানির উদাসীনতা। আমরা অনুসন্ধান করলে দেখব যে, ঘনশ্যাম দাসের বিলেত ভ্রমণ ছিল কোম্পানির এক কর্মকর্তা গ্র্যাহামের ফার্সি অনুবাদক হওয়ায় সুবাদে, নচেৎ তিনিও যেতেন কিনা এটা খুব সন্দেহের বিষয়। তিনি ১৭৭৩ সালে পার্লামেন্টের সামনে মহারাজা নন্দকুমারের মামলার সাক্ষী দিতে বিলেতে গিয়েছিলেন। এসময় তাঁকে একটি ফার্সি ব্যাকরণ অনুবাদ করতে ‘কোর্ট অব ডিরেক্টর্স’ থেকে উৎসাহ দেওয়া হয়। এতে কোম্পানির তরফ থেকে পুরস্কার না মিললেও তৎকালীন হিন্দুসমাজ থেকে যথেষ্ট তিরস্কার মিলেছিল। কারণ একটাই, তিনি কালাপানি পেরিয়েছিলেন। আমরা ঘনশ্যাম দাসের কথা থেকেই জানতে

পারি মহারাজা হয়েও নন্দকুমার কালাপানি পেরোতেন না— আর পেরোলে জাতিচ্যুত, জাতিচ্যুত হলে অর্থদণ্ড এবং গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে জাত ফিরে পাওয়ার নিয়ম ও লোকাচারের কথা বঙ্গসমাজে প্রচলিত ছিল। এমনকি এসব অমান্য করে কোনো বাঙালি সাগর পাড়ি দিয়েছে বলে মনে হয় না। উল্লেখ্য, ঘনশ্যাম দাস কালাপানি পার হয়ে বিলেত যাওয়ায় তাঁকেও এসব লোকাচার মান্য করতে হয়েছিল কি না তাঁর উল্লেখ নেই। তবে বিলেত থেকে ফিরে আসার পরে তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করাকে শ্রেয় মনে করেছিলেন এবং খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন— তখন তাঁর নতুন নাম হয় Rebert Ghansiam Doss.

কালাপানি পার হওয়ার ব্যাপারে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে তীব্র বিরোধিতা থাকলেও পশ্চিম ভারতের চিত্রটা প্রায় ভিন্ন ছিল। কারণ পশ্চিম ভারত থেকে তখন একাধিক হিন্দু প্রতিনিধির দল রাজা-মহারাজাদের ভাতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে অথবা বিভিন্ন অভাব ও অভিযোগ প্রতিকারে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকেই বিলেতে পদার্পণ করতে শুরু করে। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, ১৭৮০ সালে মারাঠা রাজ রঘুনাথ রাও বিলেতে পাঠিয়েছিলেন হনুমন্ত রাওকে। এবং পরবর্তীকালে, বিশেষ করে সিপাহী বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত অভিযোগ প্রতিকারের জন্য বিলেত যান টিপু সুলতানের দুই পুত্র প্রিন্স জামাহুদ্দীন ও গোলাম মহাম্মদ এবং রামপুরের নবাব, সুরাটের নবাব, অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলিশাহের প্রতিনিধিরা। কিন্তু বঙ্গদেশের কোনো প্রতিনিধি যাননি।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাঙালিদের মধ্যে কালাপানি পার হয়ে ইউরোপে যাওয়ার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই সময়ই মনোভাবের পরিবর্তনের কারণ হল এসময় কলকাতা নগরীতে হিন্দু কলেজসহ বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয়। তাঁরা স্পষ্ট বুঝতে পারে— চাকরি, ব্যাবসা-বাণিজ্য, সম্পত্তি রক্ষা, ধনশালী হওয়া সহ একাধিক ইহলৌকিক নানা সুবিধা পেতে ইংরেজদের সংস্পর্শে কোন না কোন ভাবে আসতেই হবে। কারণ এতদিনে বাংলায় ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলকাতায় মুসলমানি, হিন্দু ও ইংরেজি— এই তিন প্রকারের বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হয়ে

উঠেছিল। একটু একটু করে বাঙালিবাবুদের দল পুত্রদের সেই প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে আরম্ভ করেছেন। অর্থোপার্জনের জন্য তখন অনেক পণ্ডিত ও মৌলবি কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন। তাঁরা মুসলমানি ও সংস্কৃত শাস্ত্রাদি আলোচনা করতেন।[৩০] এক্ষেত্রে আমরা দুই প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তি রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ বলতে পারি। রামমোহন রায় ১৮০৫-১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত ডিগবীর সঙ্গে অত্যন্ত সুম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। ডিগবীর ফরাসি মুনশিও ছিলেন রামমোহন রায়। ডিগবীর ১৮০৬ সালে রামগড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বে থাকাকালীন রামমোহন তাঁর অধীনে ফৌজদারি আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। এছাড়াও ডিগবী রামমোহনকে রংপুরে অস্থায়ী দেওয়ান পদেও নিযুক্ত করেন। এই কয়েক বছরের মধ্যেই রামমোহন জাহানাবাদ পরগনার অন্তর্গত বীরলুক, কৃষ্ণনগর এবং ভুরসুট পরগনার অন্তর্গত শ্রীরামপুর– এই তিনটি তালুক কিনে নেন। উল্লেখ্য, রামমোহনের আর্থিক অবস্থা দিনের পর দিন উন্নতি ঘটলেও তাঁর পরিবারবর্গ ক্রমেই অবনতির দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। এমনকি ১৮০৪ সালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন ঋণের দরুণ কারারুদ্ধ হন। আবার দ্বারকানাথের পিতৃপুরুষেরাও কর্মসূত্রে ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রামলোচন ব্যাবসা সূত্রে ইংরেজদের সঙ্গে দস্তুর মতো জড়িত আর তাঁর ভাই রামমণি কাজ করতেন পুলিশ বিভাগে, যেখানে সাহেবরা সকলেই ইংরেজ। আর এক ছোটভাই রামবল্লভ— সেও কাজ করত কটকের আদালতে; যেখানে প্রায় সকলেই ইংরেজ। ফলত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত অনেকেই সেদিন বাধ্য হয়েই দিনের বেলায় ইংরেজ কোম্পানির অফিসে চাকরি করে নিজেকে অশুচি বোধ করতেন, তাই বাড়ি ফেরার সময় গঙ্গায় স্নান করে শুচিমনে বাড়ি ফিরতেন। তবে ইংরেজি শিক্ষা বাংলার ইহলৌকিক সুবিধা ছাড়াও বাঙালি বাংলা সভ্যতা ও সংস্কৃতির দীর্ঘদিনের কূপমণ্ডূকতা দ্বারা আচ্ছন্ন বাঙালি প্রজন্মকে উনিশ শতকে নতুন আলোর দিশা দেখাতে পেরেছিল। যার পোশাকি নাম 'বাংলার নবজাগরণ'। ফলত এই জাগ্রত চিন্তা-চেতনার দ্বারা লালিত হয়েই পরবর্তীতে একাধিক মুক্তমনা মানুষ সাতসমুদ্রের কালাপানি পার হয়ে ইউরোপ ভ্রমণের শুধু স্বপ্নই দেখেন তা নয়, জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ভ্রমণ করেন ও পরদেশে জীবন অতিবাহিত করেন। এরকমই দুজন বাঙালি ব্যক্তি হলেন রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ

ঠাকুর। তবে স্মরণীয়, তৎকালীন সমাজে এই দুই ব্যক্তিরই সামাজিক প্রভাব, প্রতিপত্তি ও অবস্থান এতটাই উঁচুতে ছিল যে, এঁরা হিন্দু হয়েও হিন্দু ধর্মের প্রায় সকল রক্ষণশীলতা সেদিন অমান্য করা এঁদের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

রামমোহন ১৮৩০ সালের ১৫ই নভেম্বর দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের দূত হয়ে, সম্রাটের বঞ্চিত অর্থ ফেরাতেই বিলেত যাত্রা করেন। কারণ ১৮০৫ সালের কোম্পানি ও সম্রাটের চুক্তি অনুযায়ী যে ভাতা পাওয়ার কথা তা থেকে তিনি বঞ্চিত হতে থাকেন। সম্রাটের দৌলতে বা সান্নিধ্য নিয়েই তিনি নিজভূমি ছেড়ে বাঙালির 'নির্বাসিত ভূমি কালাপানি'র প্রতি পা বাড়িয়ে ছিলেন। তবে রামমোহনের জীবন ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যাবে, তিনি বাল্য ও কৈশোরকাল থেকেই পরভূমি প্রীতিপ্রবণ ব্যক্তি। ছোটবেলায় পড়াশুনার জন্য পাটনা ও ইংরেজের দূত হয়ে কাজে ভুটান যাত্রা করেন।[৩১] আর তিনি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলেন — শুধু তাই নয়, অনেকের কাছে সমাদরও লাভ করেন। ইউরোপ ভূমির অনেকের সঙ্গে কলকাতায় বসেই তিনি পত্রালাপে যোগাযোগ করেন। আমরা জানতে পারি, ১৮১৬ সাল থেকে রামমোহন স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করার জন্য ১৮১৪ সালেই রংপুরের কালেক্টরীর ভার স্মেল্টকে বুঝিয়ে দিয়ে কলকাতার চৌরঙ্গী ও মানিকতলা এই দুটি স্থানে দুটি বাড়ি ক্রয় করেন। এর মধ্যে মানিকতলার বাড়িতে শহরের বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হত। এমনকি বিদেশ থেকে যারা কলকাতায় আসত, তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই রামমোহনের সঙ্গে এই বাড়িতে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। এদের মধ্যে দুইজন হলেন ফরাসি বৈজ্ঞানিক ভিক্তর জাকমঁ ও ইংরেজ মহিলা ফ্যানী পার্কাস।

রামমোহন মনে করতেন সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান প্রসারের পক্ষে শোচনীয় বাধাস্বরূপ। তাই তিনি ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টকে পত্র লিখে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, সকল কার্যকর জ্ঞান-বিজ্ঞান, গণিত, পর্দাথবিদ্যা, শরীরসংস্থানবিদ্যা ইত্যাদির চর্চায় ইউরোপীয় জাতি যেমন পৃথিবীর অন্য সকল জাতির ন্যায় শ্রেষ্ঠ হয়েছে আমাদের দেশবাসীর মধ্যেও যেন সেই প্রকারের শিক্ষানীতি প্রবর্তন হয়।[৩২]

ইউরোপীয় রাজনীতি ও সামাজিকতার প্রতিও তিনি সমান ওয়াকিবহাল ও আগ্রহী ছিলেন। আমরা দেখি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে উদারনৈতিক দল জয়ী হওয়াতে তিনি আনন্দ পেয়েছিলেন। আবার ইংল্যান্ডে যাওয়ার সময় পথে ফরাসি জাহাজে স্বাধীনতা সূচক নূতন তিন রঙের নিশান দেখে তিনিও সেই জাহাজগুলিতে গিয়ে "ফ্রান্স ধন্য, ধন্য, ধন্য" বলতে থাকেন।[৩৩] সেই সঙ্গে তিনি সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার আইন সম্পর্ক পার্লামেন্টে তদ্বির করেন, ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই প্রথা আইন বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। তিনি কোম্পানির ভারত শাসন সম্পর্কে সনদ পত্র নবায়নের ও নারীদের সম্পত্তির অধিকারিণী হওয়ার বিষয়ে মত প্রকাশ করেছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি বাঙালির দীর্ঘদিনের কূপমণ্ডূকতাকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।

উল্লেখ্য, রামমোহনের সঙ্গে একজন মুসলমান বাবুর্চিসহ তিনজন ব্যক্তি বিলেতে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন রাজারাম– যাকে তিনি নিজের পুত্র বলে সবার কাছে পরিচয় দিতেন। আর অপর একজন সঙ্গী হলেন রামরতন মুখার্জি। যিনি ব্রাহ্মণ হওয়ার পরেও রামমোহনের উপর অগাধ ভরসা করে কালাপানি পার হয়েছিলেন। এই সঙ্গীদের নিয়ে ইউরোপের লিভারপুলে পৌঁছায় ১৮৩১ সালের ৮ই এপ্রিল। ১৮৩২ সালের শেষের দিকে তিনি মাস তিনেক লিভারপুলে থাকেন এবং পরে প্যারিসে যান। পরবর্তীকালে ফ্রান্স থেকে ফিরে আসার সময়ই প্রবল আর্থিক সংকটে পড়েন এবং ইউরোপের শহরতলির স্টেপলটনের বীচ হাউসে ম্যালেনজাইটিস রোগে তিনি ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর মারা যান। রামমোহনের ভৃত্য রামহরি দাস কাজ পায় বর্ধমানের রাজার কাছে আর তাঁর পালকপুত্র রাজারাম প্রথমে লন্ডনেই থেকে বছর তিনেক কোম্পানির পরিচালকদের অফিসে কেরানির কাজ করেন। পরে ১৮৩৮ সালে বিলেতি জীবন নিয়ে দেশে ফেরেন এবং দেশে দুশো টাকার মাস-মাইনের চাকরিও জোটে কিন্তু তাঁকে বাঙালি সমাজের কেউ গ্রহণ করেনি। ফলত তিনি খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন এবং আবারও বিলেতে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন।

রামমোহন কালাপানি পেরিয়ে ইউরোপ ভ্রমণের পথ তৈরি করলেও তাঁর প্রদর্শিত পথে তখনই বাঙালির যাতায়াত শুরু হয়েছে বলে আমরা অন্তত সেরকম তথ্য পাই না। শুধুমাত্র একজনের উল্লেখ পাই, যিনি বাঙালি খ্রিস্টান– আনন্দচন্দ্র মজুমদার। তিনি আনুমানিক ১৮৩৩ সালে আলেক্সজান্ডার ডাফের কাছে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেন এবং তাঁর পরের বছরেই বিলেত পাড়ি দেন ও কয়েক বছর থেকে যান নিজের ভাগ্য অন্বেষণ করতে। বিলেতে তিনি প্রচণ্ড আর্থিক সংকটে পড়লে ১৮৪৭ সালের ১৬ই অগাস্ট কোম্পানির পরিচালকদের ব্রিস্টল থেকে পত্র লিখে অর্থ ও চাকরির আবেদন জানান এবং সেই সঙ্গে তিনি যে ব্যক্তিগত ভাবে পৈতৃক সম্পত্তি ও গৃহ থেকে বঞ্চিত সে কথাও জানান।[৩৪] শেষ পর্যন্ত কোম্পানির পরিচালকেরা তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ দেয়।

দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনের অল্প কিছুকাল পরেই ইউরোপে গিয়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবে তাঁকেও তাঁর নিকট আত্মীয়রা নানাভাবে সমাজ-চ্যুতির ভয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও রামমোহনের মতোই দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন। আসলে দ্বারকার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, আইন শাস্ত্র প্রভৃতি একাধিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য এতদিনের আকুলতা তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের পটভূমি তৈরি করেছিল। ষোলো বছর বয়সে জমিদারির দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি বুঝেছিলেন উত্তমরূপে আইন না জানলে, ইংরেজি ভাষা না জানলে দুর্নীতিপরায়ন রাজকর্মচারীদের সঙ্গে পেরে উঠতে পারবেন না, পারবেন না জমিদারী চালাতে, বিষয়-আশায়ের উন্নতি ঘটাতে। আর তা শিখবেন উপযুক্ত ইংরেজের কাছেই। তাই তিনি আইন শিখেছিলেন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার রবার্ট কাটলার ফাগুর্সন কাছে। নীরস আইনের আলোচনার ফাঁকে ফাগুর্সন মাঝে মাঝে স্পেন্সারের ‘ফেয়ারী কুইন’ থেকে উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতেন। দ্বারকানাথ তখন এর সকল অর্থ না বুঝলেও কাব্যের রাজসিক চলন, স্বরের উত্থান-পতন, শব্দ গরিমা—তাঁকে কিছুক্ষনের জন্য অভিভূত করে তুলত। সেদিন, এইসময় কলকাতা শহরের এক দীপালোকিত, গ্রন্থভারাক্রান্ত অফিসঘরে সহসা আর্বিভূত হয় মধ্যযুগের ইংল্যান্ড– তার বৈভব ও স্বপ্ন নিয়ে। তাঁর মনে হতে থাকে বাংলাদেশ ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু ইউরোপ সদা জাগ্রত। তাই-তো ইউরোপ যাওয়ার পর তিনি বলেন বিশ বছর ধরে যে ধ্যান করে এসেছিলেন, এতদিনে তা সফল হল।

তাই বলা চলে, তিনি যেন অনেকটা সাধনা করেই ১৮৪২ সালের ৯ই জানুয়ারি বিলেতে পৌঁছায়। তখনো সুয়েজ খাল হয়নি, তাই নিজের জাহাজ করে তিনি সুয়েজ পর্যন্ত, সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে কায়রো হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া এবং পরে অন্য জাহাজে করে মল্টা হয়ে ইতালিতে পৌঁছোন। ইতালির পর জার্মানের বিভিন্ন শহর দেখার পর যান ব্রাসেলসে সেখান থেকে জাহাজে করে ইংলিশ চ্যানেলের ডোভার বন্দর এবং ডোভার বন্দর থেকে ঘোড়ার গাড়িতে করে লন্ডনে পৌঁছান ১০ই জুন, কলকাতা থেকে যাত্রা করার প্রায় পাঁচমাস পরে।[৪১] এভাবে প্রথম বার ইউরোপ ভ্রমণ করেন। লন্ডন পৌঁছে, লন্ডন দেখে তিনি যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, তেমনি সেখানে তিনি একাধিক সম্মাননীয় ব্যক্তির আন্তরিক সমাদর ও সম্মান লাভ করেছিলেন। বিশেষ করে বলা চলে সমাজের 'ওপরতলার' মানুষদের কাছে। লন্ডনে যাওয়ার পরই সাক্ষাৎ হয় রবার্ট পীলের। তার পর রাণী ভিক্টোরিয়ার আপ্যায়ন, ফ্রান্সের রাজার আপ্যায়ন, এছাড়াও প্যারিসের গণ্যমান্য একাধিক ব্যক্তির সান্নিধ্য প্রভৃতি বিষয় তাঁকে বিশেষ ভাবে অভিভূত করেছিল। ভ্রমণের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন নিজের ডাক্তার সাহেব, সেক্রেটারি পরমানন্দ মৈত্র, ভাগ্নে চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, তিনজন হিন্দু ভৃত্য এবং একজন মুসলমান বাবুর্চিকে। সে বছরেই অর্থাৎ ১৮৪২ সালের ১৫ই নভেম্বর প্যারিস থেকে দেশে ফেরার উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে কলকাতায় এসে পৌঁছোন। ইউরোপ থেকে ফেরার পরে তিনি আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছিলেন। কারণ এই সময় তাঁর ব্যাঙ্কের ব্যাবসা, খনির কাজ— সব কিছুতেই সংকট নেমে আসে। এদিকে স্বাস্থ্যেও ভঙ্গুরতা নেমে আসে। এমতাবস্থায় মনে হয়েছিল ইউরোপে আবহাওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া যেতে পারে, তাই তিনি কোনোমতে ব্যাবসার কাজ চুকিয়ে দিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য ১৮৪৫ সালের মার্চ মাসে ইউরোপের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এবারে সঙ্গী সাহেব ডাক্তার আর তিনজন ভৃত্য, নিজের কনিষ্ঠ সন্তান নগেন্দ্রনাথ এবং ভাগ্নে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে। নিজের সন্তান ও ভাগ্নেকে সঙ্গে নেওয়ার কারণ ছিল তাঁর অন্তিম জীবনদশায় দুজন নিজের লোককে নিজের কাছে রাখা। এবং সেই সঙ্গে তাঁদের তিনি ইউরোপীয় উন্নত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়াও দ্বারকানাথ এবার সঙ্গে চারজন বাঙালি ছাত্রকে বিলেতে নিয়ে গিয়েছিলেন চিকিৎসাবিদ্যা শেখানোর জন্য।

কারণ জন্মসূত্রে হারিয়েছিলেন মাকে, আর কৈশোর বয়সেই দেখেছিলেন উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে পিতার মৃত্যু, দেখেছিলেন নাড়ি দেখে অর্ধশিক্ষিত ডাক্তারের ঈশ্বরের কাছে আয়ুভিক্ষা। যা তিনি সেদিন মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। মাথাতুলে তাকালেন পশ্চিমের দিকে– সেই সোনার শহর- লন্ডন, যেখানে এসব রোগে মানুষ মারা যায় না। সেখানেই যেতে হবে এ জেদ যেন তাঁকে পেয়ে বসেছিল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তিনি যে একদিন সেই পশ্চিম থেকে বিচিত্র জ্ঞান ক্রয় করে আনবেন। তাই এবারে দ্বারকানাথ ইতালি, অস্ট্রিয়া এবং ফ্রান্স হয়ে লন্ডন যান। লন্ডন থেকে ফিরে প্যারিসে ভ্রমণ করতে যান ১৮ই ডিসেম্বর— এসময় ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে, ভারত বিশেষজ্ঞ ম্যাক্সমুলার ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তবে এবারে ইউরোপ ভ্রমণের সময় তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না, মাঝে মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তাই স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তিনি সমুদ্রের কাছাকাছি ইংল্যান্ডের ওয়াথিং নামে একটি স্থানে থাকেন। কিন্তু তাতে কোনো সুফল না পাওয়ায় একমাস পরে ২৭শে জুলাই প্রায় অচেতন হয়ে পরেন। এমতাবস্থায় লন্ডনে আনা হলে মাত্র পাঁচ দিন পরেই পয়লা আগস্ট তিনি পরলোক গমন করেন। এবং পশ্চিম লন্ডনের কেনসালগ্রীনের একটি সমাধিতে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তবে আমাদের মনে রাখা দরকার, দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন তখনকার কলকাতার সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তি, আর অর্থ ও প্রতিপত্তির জোরও ছিল ঢের বেশি। তাই তাঁর পক্ষে সকলের বিধিনিষেধ অমান্য করে দু-দুবার বিলেত পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এত প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও সেদিন সমাজ থেকে তাঁকে একঘরে করার কথা উঠেছিল, এমনকি ঠাকুর পরিবারের ভেতরেও উঠেছিল। উল্লেখ্য, রামমোহন ও দ্বারকানাথের বিলেত গমন পরবর্তীকালে মাইকেলের বিলেত গমন ও সেখানে গিয়ে বড় কবি হওয়ার প্রেরণা জাগায়— যা তিনি ১৮৪১ সালে বন্ধু গৌরদাস বসাককে একাধিক পত্রে লিখেছেন।

সূত্র নির্দেশ:
১. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা- ৭২
২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬২
৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১
৪. রায়, তীর্থংকর, *ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস,* কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২৭
৫. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-১৫৯
৬. ত্রিপাঠী, অমলেশ, *ইতালীর র‍্যনেশাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি,* কলকাতা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ৪৬
৭. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), ২০০১, পৃষ্ঠা- ১২৬
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- ১১
৯. রায়, অন্নদাশঙ্কর, *বাংলার রেনেসাঁস,* কলকাতা, ১৩৮১, পৃষ্ঠা-৩৩৩
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- ১৭
১১.http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.html page.1
১২.http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.html page. 2
১৩.http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.html page. 3
১৪.http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.html page. 6
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- ১৫
১৬. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা- ১১১
১৭. রায়, অন্নদাশঙ্কর, *বাংলার রেনেসাঁস,* কলকাতা ১৩৮১, পৃষ্ঠা- ৩১২
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৪৩
১৯. মুখোপাধ্যায়, শক্তিসাধন, *ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস,* কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা- ৭২।
২০. শ্রীপান্থ, *ক্রীতদাস,* ১ম আনন্দ সং., কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা- ২৫
২১. শ্রীপান্থ, *কলকাতা,* ১ম আনন্দ সং., কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৫৪
২২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৮
২৩. শ্রীপান্থ, *ক্রীতদাস,* ১ম আনন্দ সং., কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩৫

২৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫

২৫. মুরশিদ, গোলাম, *কালাপানির হাতছানি: বিলেতে বাঙালির ইহিহাস,* ১ম অবসর সং., ঢাকা, ২০০৮, পৃষ্ঠা-১২

২৬. শ্রীপান্থ, *ক্রীতদাস,* ১ম আনন্দ সং., কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৫৭

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৭।

২৮. মুরশিদ, গোলাম, *কালাপানির হাতছানি: বিলেতে বাঙালির ইহিহাস,* ১ম অবসর সং., ঢাকা, ২০০৮,পৃষ্ঠা-৩১

২৯. তদেব

৩০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়, রামমোহন রায়, *সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা,* ২য় খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, পৃষ্ঠা-৩৫

৩১. সেন, সুরেন্দ্রনাথ, প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন গ্রন্থে আমরা এর বিশদ পরিচয় পেয়ে থাকি।

৩২. বন্দ্যোপাধায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, রামমোহন রায়, *সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা* (গ্রন্থাবলী), ২য় খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, পৃষ্ঠা- ৬৭

৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৪

৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৫

৩৫. গোলাম, মুরশিদ, *কালাপানির হাতছানি: বিলেতে বাঙালির ইহিহাস,* ১ম অবসর সং., ঢাকা, ২০০৮,পৃষ্ঠা-৩১

৩৬. মুরশিদ, গোলাম, *কালাপানির হাতছানি: বিলেতে বাঙালির ইহিহাস,* ১ম অবসর সং., ঢাকা, ২০০৮, পৃষ্ঠা-৩-৪

দ্বিতীয় অধ্যায়:

বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী

বাংলা কথাসাহিত্যে ইউরোপীয় হাতছানি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪):

উনিশ শতকীয় ভাবপরিমণ্ডলে বঙ্কিমের মানস গঠন ও শিল্পসৃষ্টিতে ইউরোপ প্রসঙ্গ:

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র রচনাকাল ১৮৬২ সাল এবং শেষ তথা চতুর্দশতম উপন্যাস 'সীতারাম' এর প্রকাশ ১৮৮৭ সাল, অর্থাৎ আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি, বঙ্কিমের উপন্যাস রচনার সময়কাল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। কিন্তু বঙ্কিমের এইসব উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট বা সলতে পাকানোর মনীষা তৈরি হয়েছিল এই শতাব্দীরই প্রথমার্ধ থেকে। আরও স্পষ্ট করে বললে বাংলার 'ভাঙা-গড়া'র 'নবযুগে'র জন্মলগ্নে। ভাঙা-গড়া বলছি কারণ এই সময় রামমোহন রায়, নব্যবঙ্গের দল (ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও ও মেকলে প্রধান তিন দীক্ষাগুরু) ও ডিরোজিওর অনুগামীদের মতো একাধিক আধুনিক চিন্তানায়কেরা ইংরেজি শিক্ষা ও যুক্তি দিয়ে আমাদের চিরাচরিত মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় ফাটল ধরিয়ে দেন। অন্যদিকে 'ধর্মসভা'র দ্বারা আকৃষ্ট দেশীয় সমাজের পণ্ডিতেরা চাইতেন আমাদের পুরানো সমাজকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে। আবার 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩) সভা এ দুইয়ের মধ্যস্থায় চলতে চেয়েছিল। বঙ্কিম এই সময় তাঁর ছাত্রাবস্থা কাটিয়েছেন এবং ১৮৫৮ সালে বি.এ. পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-এর কাজে যোগ দিয়েছেন। তাঁর কলেজের পাঠ্যতালিকায় প্রধানত ছিল নীতিশাস্ত্র, ভূগোল, গণিত এবং ইংরেজি সাহিত্য।[১] উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি সাহিত্যে ও দর্শনের প্রতি বিশেষ ভক্তি ছিল। কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশিষ্ট যুক্তিবাদ, বিকাশ, বলিষ্ঠতা ও বৈচিত্র্য তাঁকে মনে-প্রাণে আকৃষ্ট করেছিল, যা তিনি লব্ধ করেছিলেন ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র চর্চার দ্বারা; যদিও পরবর্তীকালে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচ্য দর্শনের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ফলে আমরা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যেকর্মে এই চিন্তা-চেতনার একাধিক ছাপ পেয়ে থাকি।

বঙ্কিমের লেখাপড়া: বাল্যকাল থেকেই বঙ্কিম মেধাবী বলে পরিচিত ছিলেন। ১৮৪৪ সালে মাত্র ছয় বছর বয়সে মেদিনীপুরের এক ইংরেজি স্কুলে পড়াকালীন সেখানকার 'হেডমাস্টার টিড্ সাহেব বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফলে খুশী হয়ে তাকে ডাবল প্রমোশন দিতে চেয়েছিলেন।'[২]

এরপর হুগলী কলেজ ও তার অধীন বিদ্যালয়গুলি থেকে বঙ্কিমসহ মোট ৭৩ জন ১৮৫৩ সালে 'জুনিয়ার স্কালারসিপ্' এর পরীক্ষা দেন। এর মধ্যে বঙ্কিম প্রথম হয়ে মাসিক আট টাকা বৃত্তি লাভ করেন। 'জুনিয়ার স্কালারসিপ্' এর পরীক্ষার পাঠ্য তালিকায়[৩] ছিল —

Prose : Selections from Goldsmith's Essay, Cal. Ed.

Poetry : Selections from Pope, Prior and Akenside poetical Reader No. III Pt. II (Last ed.)

History : Keightley's History of England, Vol. I.

Grammar : Crombie, Part II.

Geography and Map Drawing.

Mathematics: Euclid Books VI and XI.

Algebra to the end of simple Equations.

Bengali: বেতাল পঞ্চবিংশতি (2nd Ed.)

Bengali Grammar.

Arithmetic

কিন্তু আমরা জানতে পারি, ১৮৫৩ সালের নির্ধারিত পরীক্ষা ১৮৫৪ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হলে ছাত্রদের জন্য অতিরিক্ত (SUPPLEMENTARY) পাঠ্যও নির্ধারিত হয়। তার তালিকা[৪] ছিল—

Prose: Moral Tales, Encyclopedia Bengalese's No. X

Poetry: Poetical Reader, Part I, No. III (Cal. Ed.)

Grammar: Grombie's Etymology & Syntax, Part I.

Bengali: তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৭৭৪ শকাব্দ, ১০৫-১১৬ সংখ্যা)

এরপর বঙ্কিম ১৮৫৬ সালে হুগলী কলেজ পরিত্যাগ করে আইন পড়ার জন্য কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৮৫৭ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই

এন্ট্রান্স পরীক্ষার পাঠ্যসূচি (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৪ শকাব্দ, ১০৫-১১৬ সংখ্যা, পৃ. ২০) ছিল—

ইংরেজি, গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্য।

সংস্কৃত, বাংলা (কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র) এবং হিন্দি সাহিত্য।

ইতিহাস এবং ভূগোল।

অঙ্ক এবং দর্শন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে বি.এ. পরীক্ষায় ইংরেজি অবশ্য পাঠ্য ছিল বলে বঙ্কিমচন্দ্রকে শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ', ড্রাইডেনের 'সাইমন্ অ্যান্ড ইফেজেনিয়া' এবং অ্যাডিসনের 'এসেস্'(Essays) পড়তে হয়েছিল। বাংলা পাঠ্য ছিল 'বত্রিশ সিংহাসন', 'পুরুষ পরীক্ষা' এবং মহাভারতের প্রথম তিন পর্ব। বি.এ. পরীক্ষার অন্যান্য বিষয়গুলি হল—

ইংরেজি, গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্য।

সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি এবং ওড়িয়া সাহিত্য।

ইতিহাস এবং ভূগোল। বিজ্ঞান এবং রসায়ন।

হিন্দু কলেজ ও বঙ্কিমচন্দ্র:

আমরা বঙ্কিমের ছাত্রাবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, বঙ্কিম প্রথম থেকেই সাহিত্য এবং ইতিহাসের অনুরাগী ছাত্র ছিলেন। তাঁর ইতিহাস প্রীতির কথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উল্লেখ করে বলেছেন, ""রিনাইসেন্স"(Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গালারও যাহাতে আবার নবজীবনসঞ্চার হয়, তাঁহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছাছিল, তিনি বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান।'[৫] ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য-সম্পদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সুগভীর যোগ থাকলেও ইংরেজি সাহিত্যে গভীর ব্যুৎপত্তির ফলে পাশ্চাত্য মনন জগৎ ও ইংরেজি সাহিত্যজগতে তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। এবং সেইসঙ্গে সমসাময়িক অন্যান্য পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সাহিত্যের আদর্শ শুধুমাত্র সংস্কৃত কাব্য বা নাটকের

মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়েছে পাশ্চাত্য জগতে। আর তা উপন্যাস কিংবা প্রবন্ধ যাই হোক না কেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগ্রন্থ 'ধর্মতত্ত্ব'-এ গুরু তাঁর শিষ্যকে বলেছেন 'অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোম্‌তের প্রথম চারি—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্ত্যদিগকে গুরু করিবে।'[৬] এই ছিল গুরুরূপী বঙ্কিমের পাশ্চাত্যের প্রতি শ্রদ্ধা। আবার 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে শেক্সপীয়র সম্পর্কে বলেছেন 'সেক্ষপীয়র অদ্বিতীয় কবি। তিনি স্বীয় শক্তির পরিমাণ বিলক্ষণ বুঝিতেন– কোন মহাত্মা না বুঝেন?'[৭]

বঙ্কিমের উপন্যাসে ইউরোপ প্রসঙ্গ:

বঙ্কিম প্রবন্ধগ্রন্থ ছাড়াও তাঁর লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও অকপটভাবে ইউরোপীয় কবি-সাহিত্যিক-ঔপন্যাসিক-ঐতিহাসিক-দার্শকনিদের নাম ও তাঁদের লেখার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। আবার কোথাও বা পরোক্ষে সে কথা স্বীকার করেছেন; তা সে উপন্যাসের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা অংশেই হোক বা পরিশিষ্ট অংশেই হোক। যেমন 'রজনী' উপন্যাসের ভূমিকাংশে লর্ড লিটন ও উইলকি কলিন্সের কথা স্বীকার করেছেন। 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) এই উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে বঙ্কিম ওয়াল্টার স্কটের 'ব্রাইড অব ল্যামার মুর'-এর ঋণ স্বীকার করেছিলেন। আবার ইউরোপীয় উপন্যাসের 'এপিগ্রাফে'র[৮] ন্যায় 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শুরুতে চারটি খণ্ড মিলিয়ে মোট ৩১টি পরিচ্ছেদের ১৩টি পরিচ্ছেদেই বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপীয়র, বায়রন, কীটস্‌ প্রমুখের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন।

কপালকুণ্ডলা(১৮৬৬)

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় লেখকদের অনুসরণ করে 'এপিগ্রাফ' ব্যবহার করেছেন। এই এপিগ্রাফ ব্যবহারের ফলে লেখক পাঠকে সরাসরি কাহিনির মধ্যে প্রবেশ না করিয়েও পাঠকের কল্পনা ও মননকে সেই কাহিনির আগাম আঁচ পেতে বা অনেকটা বুঝতে সাহায্য করেছেন। উপন্যাসটির প্রথম খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে শেক্সপীয়রের 'Comedy

of Errorss' উদ্ধৃতি "Floating straight obedient to the stream" দিয়ে; যার তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'স্রোতের অনুকূলে ভেসে চলা'। কিন্তু কেন এই স্রোতের অনুকূলে চলা, তার পূর্বসূত্র পেতেই 'কমেডি অফ এররস্' এর উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের পূর্বের কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করা হল:

* * * *

The sailors sought for safety by our boat,
And left the ship, then sinking-ripe, to us:

...

And floating straight, obedient to the stream,
Was carried towards Corinth, as we thought. [৯]

আমরা শেক্সপীয়রের এই নাটকে দেখি নাটকের বক্তা বৃদ্ধ সওদাগর ঈজিয়ান এপিডেমন্স থেকে স্ত্রী এমিলাসহ চারপুত্র (দু'জন এমিলার গর্ভস্থ সন্তান ও দু'জন প্রতিবেশীর পালিত সন্তান) নিয়ে দেশে ফেরার জন্য জাহাজে ওঠেন। দু-দিন ভালো কেটে যাওয়ার পরে তৃতীয় দিনে প্রবল সামুদ্রিক ঝড় শুরু হলে জাহাজ ডুবে যায় এবং কয়েক ঘণ্টা অন্ধকারে কাটানোর পর আবার আলোর দেখা মেলে। এই বিপর্যয়ে স্ত্রী এমিলা সহ দুটি শিশু বিচ্ছিন্ন হয়, যদিও তারা ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যায়।

আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসেও দেখি গঙ্গাসাগর তীর্থ থেকে নৌকা করে ফেরার পথে মাঘ মাসের 'রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল ; নাবিকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল'।[১০] এমতবস্থায় নবকুমার নাবিকদের পরামর্শ দেয় "তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর, স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক; পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।"[১১] নাবিকেরা সকল যাত্রীদের সঙ্গে নিজেদেরকেও ভাগ্যের হাতে সপে দিয়ে নৌকার মধ্যে চুপ করে বসে থাকে। পরে অবশ্য কিছুক্ষনের মধ্যেই রোদের আলো দেখতে পায়, সন্ধান পায় ডাঙার। এখানে নৌকাডুবি না ঘটলেও নৌকাডুবির বিপর্যয় আশঙ্কা, প্রিয় বিচ্ছেদের সম্ভাবনা প্রবল হয়। 'কমেডি অফ এররস্'-এর মতো নৌকার সকল যাত্রীরা

ঘটনাচক্রে প্রাণে বেঁচে গেলেও নবকুমার অন্যান্য সহযাত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আসলে এভাবেই ঔপন্যাসিক পরিচ্ছেদের শুরুতেই একটি উদ্ধৃতি ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে পরিচ্ছেদটিতে কী ঘটতে চলেছে তার একটা আগাম আভাস দিয়েছেন।

প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদও বঙ্কিমচন্দ্র শুরু করেছেন শেক্সপিয়রের King Lear নাটকের প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের রাজা লিয়রের উদ্ধৃতি দিয়ে- "Ingratitude! Thou marble-hearted fiend!—" যার বাংলা তর্জমা দাঁড়ায় 'অকৃতজ্ঞতা! বন্ধু তুমি হৃদয়হীন।' আসলে আমরা এই নাটকে দেখতে পাই লিয়রের ট্রেজেডির অন্যতম প্রধান কথা হল অকৃতজ্ঞতা কত নিষ্ঠুর হতে পারে তারই এক চরম দৃষ্টান্ত। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নায়ক এই পরিচ্ছেদে সেরকম কোনো কথা বলেনি, বরং বলা চলে তিনি সহযাত্রীদের উপকারার্থে কাঠ আনতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু সঙ্গীরা তাকে সমুদ্রতীরে নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে রেখে চলে যায়। এও এক চরম মর্মন্তুদ হৃদয়হীনতা। তাই ঔপন্যাসিক অকৃতজ্ঞতার প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিটির ব্যবহার যথার্থ-ই প্রসঙ্গিক। আসলে এই এপিগ্রাফের মধ্যেমে পাঠককে মনে করিয়ে দেয়, সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে একই, তা আমাদের স্বদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম সমাজ হোক বা বিদেশি রাজকন্যা হোক তাদের মধ্যে কোনো বিশেষ পার্থক্য নেই। তাইতো লেখকের উক্তি 'আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে— কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?'[১২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে বায়রনের 'Don Juan' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের ৪৯তম স্তবকের উদ্ধৃতি দিয়ে "—Like a veil,

Which if withdrawn, would but disclose the frown
Of one whom hates us, so the night was shown
And grimly darkled o'er their faces pale
And hopeless eyes" [১৩]

স্তবকটির তর্জমা করে আমরা বলতে পারি- 'পর্দার মতো/যেটা তুলে উন্মোচন করলে আমাদের ভ্রূকুটি ফেরাবে ... গাঢ় অন্ধকারে তাদের মুখ ম্লান/ এবং হতাশ চোখ।' কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের এই পরিচ্ছেদে দেখি নবকুমারের পরামর্শে নৌকাডুবির আশঙ্কা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর নবকুমার সঙ্গীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থায় কাঠ আনতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং নদীর উপকূলে অপেক্ষা করতে থাকে অন্য সঙ্গীদের সহয়তার জন্য। এদিকে প্রকৃতির নিয়মে জোঁয়ার-ভাটায় দিনের আলো নিভে সন্ধ্যা হয়, অন্ধকার নেমে আসে, কিন্তু কোনও সঙ্গী তাকে নিতে আসে না। এরকম অবস্থায় নবকুমারের সামনে উত্তাল সমুদ্র, পশ্চাতে গভীর অরণ্যভূমি যেখানে হিংস্র বন্য জন্তুদের দ্বারা সর্বদা প্রাণ হারানোর ভয় এবং সেই সঙ্গে সে শারীরিক ক্লান্তি, ক্ষুধাতৃষ্ণার দ্বারা পীড়িত। ঔপন্যাসিক সেই পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে 'অন্ধকারে সর্বত্র জনহীন,—আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্বত্র নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্রগর্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব।'[১৪] এখানে উভয় ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভয়বহতা ও নিরুপায় মানুষের হতাশার সাদৃশ্য পাঠককে যেন চকিতেই উপলব্ধি করতে পারে, তারই প্রবেশক হিসেবে লেখক বায়রনের- '... And grimly darkled o'er their faces pale/And hopeless eyes.' উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করেছেন।

প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক আবার শেক্সপিয়রের 'Romeo and Juliet' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের "And that very night— / Shall Romeo bear thee to Mantua." উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। এই রোমান্টিক ট্রাজেডি নাটকটির এই দৃশ্যে দেখি রোমিও জুলিয়েটের ভালোবাসা ও বিবাহবন্ধন সুখের হয় না। জুলিয়েটকে মৃত ভেবে রোমিও আত্মবিসর্জনের পথ বেছে নিলে জুলিয়েট তার অনুগামী হয়।

উপন্যাসে দেখি, অরণ্য মধ্যে দেবালয়ের অধিষ্ঠিধাত্রী অধিকারী পুরোহিতের পরামর্শে ও সহযোগিতায় সদ্যবিবাহিতা নবকুমার স্ত্রী কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে সপ্তগ্রামে যাত্রা করে এবং নিরাপদে বাড়ি পৌঁছেও যায়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের দাম্পত্য জীবন স্থায়ী বা সুখের কোনোটাই হয় না। দাম্পত্য জীবনের বছর খানেকের মধ্যেই কাপালিক তার অভীষ্ট সাধন

করতে ফাঁদ পাততে থাকে এবং সেই ফাঁদে পড়ে নবকুমার একসময় অতীতের প্রাণদানকারী প্রিয়তমাকে হত্যা পর্যন্ত করতে উদ্যত হয়। কিন্তু অচিরেই নবকুমার তার ভুল বুঝতে পেরে কপালকুণ্ডলাকে আবার গ্রহণ করতে হাত বাড়িয়ে দেয়, আর তখনেই নদীর তীরভাঙা ঢেউ এসে কপালকুণ্ডলাকে টেনে নেয়। 'প্রাণরক্ষায়িত্রী' প্রিয়তমার কাছে না পেয়ে নবকুমার 'কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়া কপালকুণ্ডলার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না।'[১৫] আসলে রোমিও জুলিয়েটের Friar Laurence এর মতো যাজক বা কপালকুণ্ডলার অধিকারী পুরোহিতের মতো আন্তরিক ব্যক্তিরা যুগলের সুখ কামনায় গোপনে বিয়ে দিয়ে তাদের নিরাপদে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দিলেও নিয়তি-ই যে দুঃখের পরিনাম সেটিই দেখিয়েছেন লেখক।

উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে শেক্সপীয়রের Macbeth নাটকের প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যের উদ্ধৃতি ঔপন্যাসিক উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃতিটি হল "— I am settled, and bend up / Each corporl agent to this terrible feat." এই নাটকে দেখি ম্যাকবেথ লোভের বশবর্তী হয়ে প্রথমে প্রভু রাজা ডানকানকে হত্যা করার পরিকল্পনা করলেও একসময় প্রভু-হত্যায় তার মন সায় না দেওয়ায় সেই পরিকল্পনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চায়। কিন্তু স্ত্রী লেডি ম্যাকবেথের বার বার প্ররোচনা ও ভর্ৎসনা ম্যাকবেথ আবার পূর্ব সিদ্ধান্তে ফিরে আসে এবং সমস্ত প্রস্তুতি নিতে থাকে অতীব দুষ্কর্ম করার জন্য। যদিও সে অন্তর থেকে জানে কাজটি অনুচিত, তাই তার মনের মধ্যে দোলাচলতা সৃষ্টি হয়। কপালকুণ্ডলা–য় এই পরিচ্ছেদে দেখি মতিবিবি (ওরফে পুরুষ বেশ ধারণ করে লুৎফ-উন্নিসা নাম গ্রহণ করে) নবকুমারকে পাওয়ার জন্য নবকুমারের কাছ থেকে অরণ্যচারী কপালকুণ্ডলার চির বিচ্ছেদ পরিকল্পনা করে। কিন্তু সেও ম্যাকবেথের মতো জানে এই কাজ তার পক্ষে অন্যায়। তাই কপালকুণ্ডলাকে প্রাণে মারার পক্ষপাতী সে ছিল না। সে বলে "আমিও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহি; কিন্তু যাবজ্জীবন জন্য ইহার নির্বাসন হয়, তাহাতে আমি সম্মত আছি। কিন্তু হত্যার কোন উদ্যোগ আমা হইতে হইবে না।"[১৬] তাই তার মধ্যেও শুরু হয় মানসিক দোলাচলতা। আর এই দোলাচল মন নিয়েই সেও ম্যাকবেথের মতোই পূর্ব পরিকল্পিত রক্তপিপাসু কাপালিকের হাতে মৃন্ময়ীকে

(কপালকুণ্ডলার ডাক নাম) তুলে দিয়ে পরোক্ষে মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দেয়। উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছেন রোমান্টিক কবি কীট্‌স্‌কে-

"——Tender is the night
And haply the Queen moon is on her throne.
Clustered around by all her starry fays;
But here there is no Light."

কবি কীট্‌স্‌-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'Ode to the Nightingale' থেকে লেখক এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করেছেন। এই কবিতায় কাননভূমিতে কবির একটি বিরল আনন্দ মুহূর্তের উদ্‌যাপন, পরিপ্লাবী শান্তি, যদিও তা ক্ষণকালের জন্য। আমরা উপন্যাসের এই পরিচ্ছেদের মধ্যেও দেখি শান্তির ছবি আপাত ও ক্ষণস্থায়ী। লেখকের বর্ণনায় 'যামিনী মধুরা, একান্ত শব্দমাত্রবিহীনা।'[১৭] কিন্তু তার পরেই কপালকুণ্ডলার '... গৃহপ্রাপ্তি হইতে না হইতেই প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি ভীষণরবে প্রঘোষিত হইল। ... প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি কল্লালকুণ্ডলার মস্তকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব্দ এবং অশনিসম্পাতশব্দ হইতে লাগিল।'[১৮]

চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক Byron এর 'Darkness'(১৮১৬) কবিতার প্রথম পংক্তি "I had a dream, which was not all a dream." ব্যবহার করেছেন। এই কবিতাটিতে আছে একটি দুঃস্বপ্নের কথা। সেই স্বপ্ন হল আসন্ন সর্বব্যাপী ভীষণ অন্ধকার ও মৃত্যুর মুখে চরম হতাশা। আমরা উপন্যাসের পরিচ্ছেদের মধ্যেও দেখি 'কপালকুণ্ডলার অল্প তন্দ্রা আসিল। সেই অপ্রগাঢ় নিদ্রায় কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। ..... বাতাস উঠিল; বৃক্ষ প্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল; তরঙ্গমধ্য হইতে একজন জটাজূটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ আসিয়া কপালকুণ্ডলার নৌকা বাম হস্তে তুলিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল। এমত সময়ে সেই ভীমকান্তশ্রীময় ব্রাহ্মণবেশধারী আসিয়া তরি ধরিয়া রহিল। সে কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমায় রাখি, কি নিমগ্ন করি?" আকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার মুখ হইতে বাহির হইল "নিমগ্ন কর।"... নৌকা কহিল, "আমি আর এ ভার বহিতে পারি না, আমি পাতালে প্রবেশ করি।" ইহা কহিয়া নৌকা তাহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল।'[১৯]

চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক শেক্সপীয়রের Hamlet নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের হ্যামলেটের- "... I will have grounds / More relative than this," উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। আমরা নাটকের দেখি হ্যামলেট তার পিতৃহন্তার রহস্য উদ্ধার করতে চায়। সেই মতো সে একদিন গভীর নির্জন রাত্রিতে বাবার অলৌকিক আত্মার ছায়ার সঙ্গে দেখা করে। হ্যামলেটকে বাবার আত্মা জানায় নির্জন বাগানে ঘুমন্ত রাজার কানে বিষ ঢেলে দেয়, তারই ভাই ক্লডিয়াস এবং এর পর শরীর নিথর হলে সাপে কেটে মারা গেছে বলে রাজ্যে প্রচার করে। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের এই পরিচ্ছেদেও দেখি কপালকুণ্ডলার ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট স্থানে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার আগে অমঙ্গল ঘটনা ঘটবে বলে সংকেত হিসেবে বেশকিছু অলৌকিক স্বপ্ন দেখতে পায়। লেখক হ্যামলেটের পিতার ছায়া-দর্শনের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার অলৌকিক স্বপ্ন-দর্শনকে মিলিয়ে দু-ক্ষেত্রেই পূর্ব সংকেতের গুরুত্ব পাঠককে বুঝিয়েছেন।

আলোচ্য উপন্যাসটির চতুর্থ খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে শেক্সপীয়রের বিখ্যাত ট্রাজেডি নাটক 'Othello'-এর "Stand you awhile apart, / Confine youself but in a patient." এই উদ্ধৃতি দিয়ে। এটি ওথেলো নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। নাটকের কুটিল প্ররোচক চরিত্র ইয়াগো ডেসডিমনা ও ওথেলোর নিষ্কলুষ প্রেম-জীবনের মধ্যে এমন তিক্ততার বিষ ঢেলে দিয়েছে, যার ভয়ানক পরিণতি হিসেবে ওথেলো, ডেসডিমনা ও এমিলিয়া আত্মহত্যা ও হত্যার মতো নিষ্ঠুর ঘটনা পরপর ঘটে যায়। উপন্যাসের এই পরিচ্ছেদের মধ্যে দেখি ইয়াগোর মতোই কাপালিকও কুটিল প্ররোচক হয়ে নবকুমারের মনে কপালকুণ্ডলার সম্পর্কে সন্দেহের বীজ রোপন করে। নবকুমার যখন কপালকুণ্ডলার সতীত্ব সম্পর্কে সৃষ্টি হওয়া সন্দেহের প্রমাণ করতে রাতের অন্ধকারে কপালকুণ্ডলার পিছনে ধাবিত হয় তখন কাপালিক তাকে ধরে সুরাপান করিয়ে এবং কপালকুণ্ডলা তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী বলে আরও বেশি উদ্ভ্রান্ত করে তোলে। 'ওথেলো' নাটকের ওথেলোর যেমন কেশিয়োকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবেছিল, ঠিক তেমনি কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে নবকুমার ভেবেছিল ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণকে (ওরফে মতিবিবিকে)। এছাড়াও কপালকুণ্ডলার পত্র হারানোর সঙ্গে ডেসডিমনার রুমাল হারানোর সাদৃশ্য আমরা

দেখতে পাই। কারণ ডেসডিমনার রুমাল হারানোর বা চুরি হওয়ায় সঙ্গে তার সতীত্ব সম্পর্কে ওথেলোর মনে সন্দেহর সৃষ্টি হয়, আর কপালকুণ্ডলাকে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের দেওয়া পত্র হারানোর এবং সেই পত্র পাঠের দ্বারা নবকুমার কপালকুণ্ডলা চরিত্র সম্পর্কে সংশয় নিশ্চয়তার সাদৃশ্য আছে। আবার দু-ক্ষেত্রেই নায়কেরা প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারানোর পরে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—“No spectre greets me—no vain shadow this.”— Wordsworth.

এছাড়াও এখানে আমরা দেখব ইউরোপীয় নিয়তিবাদের দ্বারা কপালকুণ্ডলা চরিত্র কীভাবে প্রভাবিত।

এই উপন্যাসের নায়িকা কপালকুণ্ডলার চরিত্রের অরণ্যপুষ্ট যৌবনশ্রী, সারল্য ও সহজ অনুকম্পায় আমরা শেক্সপীয়রের ‘টেম্পেস্ট’ নাটকের মিরাণ্ডার ছায়া দেখতে পাই। উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে অপ্রাকৃত ঘটনার সন্নিবেশ বিশেষত উপন্যাসের শেষাংশে কপালকুণ্ডলা ‘কপালমালাবিভূষিতা নরকবেষ্টিতকটি ভৈরবী বালিকা-মূর্তি দর্শন’ ও তার নির্দেশ শ্রবণের সঙ্গে সেক্সপীয়রের ‘ম্যাকবেথ’ নাটকের শূন্যে রক্তাক্ত ছুরিকা বা শূন্য আসনে ব্যাঙ্কোর মূর্তি দর্শনের সাদৃশ্য আছে। সেক্সপীয়রের একাধিক নাটকের (যেমন-‘মার্চেন্ট অফ ভেনিসে’র পোর্সিয়া, ‘অ্যাজ ইউ লাইক ইট’ এর রোজালিণ্ড প্রভৃতি) নারী চরিত্রের পুরুষবেশের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার পুরুষবেশ ধারণ এর প্রসঙ্গ এসেছে।

ইন্দিরা(১৮৭৩):

আমরা এই উপন্যাসের ভূমিকায় শেলীর ‘Invocation’ কবিতাটির উল্লেখ পাই। শেলির এই ‘Invocation’ কবিতাটির প্রতিটি ছত্রের মধ্যে আমরা ‘ইন্দিরা’ চরিত্রের অন্তরের প্রতিধ্বনিকে খুঁজে পাই। ইন্দিরার জীবনের ভাগ্য বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে আর তার থেকে মুক্তির আশায় উপন্যাসের সমাপ্তি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ইন্দিরাও মানুষের সহানুভূতি ও সহযোগিতায় এবং নিজের অদম্য সাহস ও বুদ্ধির বলে সেই অসহায় অবস্থার উত্তরণ ঘটিয়েছে সেইসঙ্গে সৌভাগ্যও লাভ করেছে। এই উপন্যাসের নায়িকা স্বয়ং বক্তা। ইংরেজি উপন্যাসের এই রীতি বঙ্কিম

অনুসরণ করেছেন ডিকেন্সের 'ডেভিড কপার ফিল্ড' এবং থ্যাকারের 'হেনরি এসমন্ড' থেকে। উপন্যাসের মধ্যেই খণ্ড খণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনি আদল বঙ্কিম আমরা ডিকেন্সের 'Pickwick Papers' ও লক্ষ করি।

রজনী (১৮৭৭):

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চোদ্দটি বাংলা উপন্যাসের মধ্যে 'রজনী' উপন্যাসটির বিজ্ঞাপন অংশে আলাদা করে দুই ইউরোপীয় ঔপন্যাসিক ও উপন্যাসের প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন 'প্রথম লর্ড লিটন প্রণীত "Last Days of Pompeii" নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি "কানা ফুলওয়ালী" আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়।' এবং এর কথনরীতি উইল্‌কি কলিন্সকৃত "Woman in white" থেকে গৃহীত।[২০] তবে কলিন্সের ' ওমেন ইন হোয়াইট' এর কথন রীতি ছাড়াও আর যেসব বিষয় নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী' লিখেছিলেন তা হল, রজনীর প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটন ও সম্পত্তি উদ্ধার, লবঙ্গলতা ও অমরনাথের আখ্যান প্রভৃতি।

উনিশ শতকে শেক্সপীয়র নাগরিক বাঙালি সমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তারই প্রমাণ হিসেবে তখনকার সমাজের সম্ভ্রান্ত শচীন্দ্রের টেবিলে "সেক্ষপিয়র গেলেরি" রাখা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসে শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কথা এসেছে সেই গেলেরি থেকেই। শচীন্দ্র তার বাড়িতে আগত অমরনাথ সম্পর্কে আমাদের জানাছেন—"সেক্ষপিয়র গেলেরির পাতা উল্টান শেষ হইলে অমরনাথ নিজ প্রয়োজনের কথা কিছু না বলিয়া, ঐ পুস্তকস্থিত চিত্রসকলের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যাহা বাক্য এবং কার্য্যদ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, তাহা চিত্রফলকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া ধৃষ্টতার কাজ। সে চিত্র কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না; এবং এ সকল চিত্রও সম্পূর্ণ নহে। ডেস্‌ডিমনার চিত্র দেখাইয়া কহিলেন, আপনি এই চিত্রে ধৈর্য্য, মাধুর্য্য, নম্রতা পাইতেছেন, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত সে সাহস কৈ? নম্রতার সঙ্গে সে সতীত্বের অহঙ্কার কই? জুলিয়েটের মূর্তি দেখাইয়া কহিলেন, এ নবযুবতীর মূর্ত্তি বটে, কিন্তু ইহাতে জুলিয়েটের নবযৌবনের অদমনীয় চাঞ্চল্য কৈ?"[২১] আসলে এখানে অমরনাথ শচীন্দ্রকে বলতে চেয়েছে শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রে যেমন

সমস্ত কিছুকেই ফুটিয়ে তোলা যায় না, ঠিক তেমনি মানুষের বাহ্যিক চিত্রেও তাকে সবটা বোঝা যায় না। আমাদের মনে হয়, অন্ধ রজনীর অন্তর সত্তাকে নির্দেশিত করতেই বোধহয় অমরনাথ শচীন্দ্রকে সেক্সপীয়রের গেলেরির কথা বলেছেন।

বঙ্কিম 'রজনী' উপন্যাসের সন্ন্যাসী চরিত্রের মুখে সেকথাই স্বীকার করেছেন –"শুনিয়াছি, বিলাতী পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, লোকের মাথার গঠন দেখিয়া তাহার চরিত্রের কথা বলা যায়। যদি মাথার গঠনে চরিত্র বলা যায়, তবে হাতের রেখা দেখিয়াই বা কেন না বলা যাইবে?..."[২২] অমরনাথের আলোচনায় এসেছে সোপেনহাওয়ার-এর কথা। "... প্রাচীন ইতিবৃত্ত-লেখকদিগের মত লইয়া অমরনাথ কোম্‌তের ত্রৈকালিক উন্নতিসম্বন্ধীয় মতের সমর্থন করিলেন। কোম্‌ৎ হইতে তাঁহার সমালোচক মিল ও হকস্‌লীর কথা আসিল। হকস্‌লী হইতে ওয়েন ও ডারুইন, ডারুইন হইতে বুকনেয়র সোপেনহয়র প্রভৃতি সমালোচনা আসিল।"[২৩]তবে এখানে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে কোঁত ও কোঁতপন্থীদের।

বঙ্কিমচন্দ্র মানবতাবাদের আদর্শেই মানবজীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই-তো তিনি আমরনাথের মুখে তাঁর নিজের আকুতিকে বসিয়েছেন। 'প্রভো, তোমায় অনেক সন্ধান করিয়াছি, কই তুমি? দর্শনে বিজ্ঞানে তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমেয়, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই স্ফুটিতোন্মুখ হৃদ্‌পদ্মই তোমার প্রমাণ— ইহাতে তুমি আরোহণ কর। আমি অন্ধ পুষ্পনারীকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার ছায়া সেখানে স্থাপন করি।'[২৪]

কৃষ্ণকান্তের উইল(১৮৭৮):

এই উপন্যাসের একেবারে শেষে গোবিন্দলালের শুকানো বাগানকে আবার জাগিয়ে তোলা চিন্তা ও সেখানে কয়েকটি গাছের নাম বিশেষ তাৎপর্যের ঈঙ্গিত দিয়ে থাকে আমাদের। ভাগিনেয় শচীকান্ত মাতুলের জীবনের দুঃখময় কাহিনি শোনার পরে গোবিন্দলালের বাগানবাড়ি আবার তৈরি করতে শুরু করে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের পরিশিষ্ট অংশে লিখেছেন, "শচীকান্ত সেই দুঃখময়ী কাহিনী সবিস্তারে শুনিয়াছিল। ... ভাবিয়া ভাবিয়া আবার সেইখানে সে উদ্যান প্রস্তুত

করিতে আরম্ভ করিল। আবার বিচিত্র রেলিং প্রস্তুত করিল— পুষ্করিণীতে নামিবার মনোহর কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী গঠিত করিল। আবার কেয়ারি করিয়া মনোহর বৃক্ষশ্রেণী সকল পুঁতিল। কিন্তু আর রঙ্গিল ফুলের গাছ বসাইল না। দেশী গাছের মধ্যে বকুল, কামিনী, বিদেশী গাছের মধ্যে সাইপ্রেস ও উইলো।"[২৫] বাঙালি জমিদারের বাগানবাড়িতে দুঃখের প্রতীক স্বরূপ 'রঙ্গিল ফুলের' পরিবর্তে বিদেশি গাছ 'সাইপ্রেস' ও 'উইলো' এধরণা বঙ্কিম শেক্সপীয়রের থেকে পেয়েছিলেন। শেক্সপীয়রের 'টুএল্‌ফ্‌থ নাইটে'র দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে এই সাইপ্রেস গাছের সম্বন্ধে গানটি তারই প্রামাণ—

"Come away, come away death,
And, in sad cypress let me be laid;
Fly away, fly away, breath;
I am slain by a fair cruel maid
My shroud of white, stuck all with yew,
O! prepare it,
My part of death, no one so true
Did share it."[২৬]

উইলো গাছকে নিয়ে ডেসডিমনার গান—

"The poor soul sat sighing by a sycamore tree
Sing all a green willow;
Her hand on her bosom,
Her head on her knee,
Sing willow, willow, willow;
The fresh streams ran by her,
and murmur'd her moans;
Sing willow, willow, willow;

Her salt tears fell from her

and soften'd the stones;—

Sing willow, willow, willow. "[২৭]

উনিশ শতকে বাঙালির পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে নবচেতনার উন্মেষ এবং সেই সঙ্গে ছাত্রজীবন থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের শেক্সপীয়র চর্চা, প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষকদের উৎসাহদান— সবমিলিয়ে সেইসময়ে বঙ্কিমের সামনে শেক্সপীয়র সাহিত্য চর্চার আদর্শ বা আইকন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই শেক্সপীয়রের কাছ থেকে তিনি গভীর জীবনবোধ, অন্তর্দৃষ্টি ও নরনারীর চিরন্তন অনুভূতি রূপায়নের দক্ষতা ইত্যাদি মতো বেশকিছু আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ইউরোপীয় প্রভাবের ফলে অভিনবত্বের নানা দিক:

বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যানের আমদানি।[২৮] বঙ্কিমের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে নায়ক-নায়িকার মনে পূর্বরাগের সূচনা হত বিবাহের পরে। কিন্তু ইউরোপীয় বা বিলাতি উপন্যাসে নরনারীদের সম্পর্কিত হওয়ায় পূর্বেই অনুরাগ ও প্রেম সঞ্চারের পরেই বিবাহে স্বার্থকতা পায় বা বিচ্ছেদে বিনষ্ট হয়। সংবেদনাত্মক ইন্দ্রিয়ানুভূতি মূলক প্রেম মনস্তত্ত্ব বঙ্কিম-ই প্রথম বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে প্রচলন ঘটান। এছাড়াও পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার মত বাংলা উপন্যাসে প্রথম নারীর সম্পত্তিতে অধিকার কথা তুলে ধরেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১):

- **রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি জীবন:**

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটছেলে রবীন্দ্রনাথের (জন্ম ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮, মৃত্যু ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) শৈশব কেটেছিল সদর অন্দর মহলের বাইরে, চাকরদের অধিকৃত দ্বিতলের গৃহকোণে ভৃত্যশাসনের গণ্ডিঘেরায় মধ্যে। কারণ বাড়ির ছোট ছেলেদের বাড়ির সদর দরজা ডিঙোনো নিষেধ ছিল। তাঁদের সন্ধ্যা বেলা ভৃত্যদের কাছ রামায়ণ আর রাতে দাসীদের কাছে রূপকথা ও ছেলে ভুলানো ছড়াশুনে ঘুমিয়ে পড়া— এই ছিল নিয়ম।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মে তাঁর পিতা ও বড়োদাদার পরেই যাঁর অবদান সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তিনি হলেন, শ্রীকণ্ঠ সিংহ। এর পরে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রা করা থেকে শুরু করে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা এবং মানস গঠনে এই সময়কাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাঠ আরম্ভ হয়েছিল চণ্ডীমণ্ডপে বাড়ির পাঠশালায়। তাঁর থেকে দুই বছরের অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ ও ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের দেখাদেখি রবীন্দ্রনাথও কচি বয়সেই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু স্কুলের সংকীর্ণ গণ্ডি ও রুটিন মাফিক পড়া তাঁর রুচি বিরুদ্ধ হয়। এই বিদ্যালয় ত্যাগ করার পরে তাঁকে আরও বেশ কয়েকটি স্কুলে ভর্তি করানো হয়— প্রথমে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে, তার পর একে একে নর্মাল স্কুলে, বেঙ্গল একাডেমিতে এবং সব শেষে সেন্ট জেভিয়ার্সে। তবে কোথাও তিনি টিকতে পারেননি। ফলে তাঁর বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। এরপর তাঁকে পাঠানো হয়েছিল বিলাতে। তাঁর কর্তৃপক্ষরা আশা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরবেন। বিলাতে তিনি দেড় বছর ছিলেন। সেখানে প্রথমে তিনি ব্রাইটনের একটি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। পরে লন্ডনে য়ুনিভার্সিটিতে কলেজে মাস কতক তিনি ক্লাসও করেছিলেন। যদিও সেখান থেকে তাঁকে কিছুদিন পড়েই ফিরে আসতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের বিলাতের স্কুলেও বেশিদিন পড়া হয়নি। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শুভানুধ্যায়ী তারক পালিত মহাশয় এই সময় ইংলন্ডে ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পড়া ঠিক এভাবে সম্ভব নয়। পরে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বলে প্রথমে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনেন এবং পরে লন্ডনে স্কট নামক এক ডাক্তার গৃহস্থের বাসায় আশ্রয় দেন। যাঁদের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের খুব গভীর সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল। মিসেস স্কট রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে আপন ছেলের মতই স্নেহ করতেন, এমনকি তাদের মেয়েরাও খুব যত্ন করতেন। এই পরিবারে বাস করার সময় তিনি একটি জিনিস লক্ষ্য করেন যে— মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। তিনি লিখেছেন, ‘আমরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে, আমাদের দেশে পতিভক্তির একটা বিশিষ্টতা আছে, য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশে সাধ্বীগৃহিণীর সঙ্গে মিসেস স্কটের আমি তো বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। স্বামীর সেবায় তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপৃত ছিল। ডাক্তার স্কটের কি ভালো লাগে আর না লাগে, কোন্ ব্যবহার তাঁহার কাছে প্রিয় বা অপ্রিয়, সে-কথা মুহূর্তের জন্যেও তাঁহার স্ত্রী ভুলিতেন না।...’[২৯] এখানে কয়েকমাস থাকার পর রবীন্দ্রনাথের দাদার দেশে ফেরার সময় হলে তাঁর পিতার অভিমতে তাঁকেও দেশে ফিরতে হয়। দেশে ফেরার আনন্দ তাঁর অনুভূত হলেও তিনি লক্ষ করেন মিসেস স্কটের মন বিষন্ন। শেষ পর্যন্ত বিদায় গ্রহণকালে এই মিসেস স্কট তাঁর দু-হাত ধরে কেঁদে বলেন, “এমন করিয়াই যদি চলিয়া যাইবে তবে এত অল্পদিনের জন্য তুমি কেন এখানে আসিলে?”[৩০] রবীন্দ্রনাথের মনে মধ্যে পরবর্তীকালে ডাক্তার স্কটের গৃহটি চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই গৃহে থেকে লন্ডন য়ুনিভার্‌সিটিতে পড়া আরম্ভ করেন এবং এই বাসায় থাকার সময়ে একজন গৃহশিক্ষকের সাহায্যে তিনি লাটিন শিখতে শুরু করেন। যদিও স্কুল শিক্ষার মতোই এই লাটিন শিক্ষাও তাঁর অসমাপ্ত থেকে যায়। পরে তিনি স্বেচ্ছায় ফরাসি ও জার্মান ভাষা শিখতে শুরু করেছিলেন, তাতেও তিনি ব্যর্থ হন। রবীন্দ্রনাথ ‘জীবনস্মৃতি’র ‘লোকেন পালিত’ অধ্যায়ে জানিয়েছেন, ‘বিলাতে যখন আমি য়ুনিভার্‌সিটি কলেজে ইংরেজি সাহিত্য ক্লাসে তখন সেখানে লোকেন পালিত ছিল আমার সহধ্যায়ী বন্ধু। ... তাহার পর কয়েক বৎসর পরে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া লোকেন যখন ভারতবর্ষে ফিরল তখন, সেই কলেজের লাইব্রেরিঘরে হাস্যোচ্ছ্বাসতরঙ্গিত

যে আলোচনা শুরু হইয়াছিল তাহা ক্রমশ প্রশস্ত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।’[৩১] বিলেতের স্কুল ও ছাত্রদের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন— ‘ব্রাইটনের এই স্কুলের একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আমি বিস্মিত হয়েছিলাম—ছাত্রেরা আমার সঙ্গে কিছুমাত্র রূঢ় ব্যবহার করে নাই। অনেক সময়ে তাহারা আমার পকেটের মধ্যে কমলালেবু আপেল প্রভৃতি ফল গুজিয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছে। আমি বিদেশী বলিয়াই আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ আচরণ, ইহাই আমার বিশ্বাস। ...’[৩২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যারিস্টারি পড়া ও বিলেত যাত্রা সম্পর্কে বলেছেন— ‘ব্যারিষ্টার হইব বলিয়া বিলাতে আয়োজন শুরু করিয়াছিলাম এমন সময়ে পিতা আমাকে দেশে ডাকিয়া আনাইলেন। আমার কৃতিত্বলাভের এই সুযোগ ভাঙিয়া যাওয়াতে বন্ধুগণ কেহ কেহ দুঃখিত হইয়া আমাকে পুনরায় বিলাতে পাঠাইবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিলেন। এই অনুরোধের জোরে আবার একবার বিলাতে যাত্রা করিয়া বাহির হইলাম। সঙ্গে আরো একজন আত্মীয় ছিলেন। ব্যারিষ্টার হইয়া আসাটা আমার ভাগ্য এমনি সম্পূর্ণ নামঞ্জুর করিয়া দিলেন যে বিলাত পর্যন্ত্য পৌঁছিতেও হইল না। বিশেষ কারণে মান্দ্রাজের ঘাটে নামিয়া পড়িয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল।’ [৩৩] এরপর তিনি আশ্রয় নেন জ্যোতিদাদার কাছে চন্দননগরের গঙ্গাধারে। তিনি লিখেছেন, ‘বিলাতযাত্রার আরম্ভপথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন— আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।’[৩৪]

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের আগে রবীন্দ্রনাথ প্রায় মাস ছয়েক মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে আমেদাবাদ ও বোম্বাইতে কাটিয়েছিলেন। এই ছয়মাস তিনি প্রচুর ইংরেজি বই পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— ‘ভারতী যখন দ্বিতীয় বৎসরে পড়িল মেজদাদা প্রস্তাব করিলেন আমাকে তিনি বিলাতে লইয়া যাইবেন। পিতৃদেব যখন সম্মতি দিলেন তখন আমার ভাগ্যবিধাতার এই আরেকটি অযাচিত বদান্যতায় আমি বিস্মিত হইয়া উঠিলাম।

বিলাতযাত্রার পূর্বে মেজদাদা আমাকে প্রথমে আমেদাবাদ লইয়া গেলেন। তিনি সেখানে জর্জ ছিলেন। আমার বৌঠাকরুণ এবং ছেলেরা তখন ইংলণ্ডে সুতরাং বাড়ি একপ্রকার জনশূন্য ছিল। ... মেজদাদা আদালতে চলিয়া যাইতেন। প্রকাণ্ড বাড়িতে আমি ছাড়া কেহ থাকিত না—

শব্দের মধ্যে কেবল পায়রাগুলির মধ্যহ্নকূজন শোনা যাইত। ... একটি বড় ঘরের দেয়ালের খোপে খোপে মেজদাদার বইগুলি সাজানো ছিল। তাহার মধ্যে, বড় বড় অক্ষরে ছাপা, অনেকছবিওয়ালা একখানি টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ ছিল। সেই গ্রন্থটিও তখন আমার পক্ষে এই রাজপ্রাসাদেরই মতো নীরব ছিল। আমি কেবল তাহার ছবিগুলির মধ্যে বারবার করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। বাক্যগুলি যে একেবারেই বুঝইতাম না তাহা নহে, কিন্তু তাহা বাক্যের অপেক্ষা আমার পক্ষে অনেকটা কূজনের মতই ছিল।'[৩৫] আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ে ছয়মাস কাটানোর পর বিলেত যাত্রা করেন রবীন্দ্রনাথ। সতেরো বছর বয়সে বিলাতের জনসমুদ্রের মধ্যে পৌঁছে অসুবিধা হওয়ার সম্ভবনা থাকলেও তাঁর মেজোবৌঠাকরুণের আশ্রয়ে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। 'কথা ছিল, পড়াশুনা করিব, ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিব। তাই একদিন ব্রাইটনে একটি পাবলিক স্কুলে আমি ভর্ত্তি হইলাম। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রথমেই আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাহবা, তোমার মাথাটা তো চমৎকার!" (What a splendid head you have!) ... এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার মতের সঙ্গে বিলাতবাসীর মতের দুটো একটা বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাইয়া অনেকবার আমি গম্ভীর হইয়া ভাবিয়াছি, হয়ত উভয় দেশের বিচারের প্রণালী ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।'[৩৬]

পরবর্তীকালে সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ ও বাড়ির অপর ছেলে-মেয়েদের গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা পরিচালিত হতে থাকে। এই গৃহশিক্ষার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন। শিক্ষক ছিলেন নর্মাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয়। তিনি সকাল ছটা থেকে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণিবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে মাইকেলের মেঘনাদবধ পর্যন্ত পড়াতেন। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত। ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধকাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিম্‌নাস্টিকের মাস্টার

আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় ইংরেজি পড়াইবার জন্য অঘোরবাবু আসিতেন। এইরূপে রাত্রি নটার পর ছুটি পাইতাম।

রবিবার সকালে বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতে হইত। তাছাড়া প্রায় মাঝে মাঝে সীতানাথ দত্ত মহাশয় আসিয়া যন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। ...'[৩৭] গৃহশিক্ষার ব্যবস্থায় বাংলা উপর জোর থাকলেও সংস্কৃত ও ইংরেজি উপেক্ষিত ছিল না। আর রবীন্দ্রনাথের নিজের ঝোঁক ছিল প্রধানত বাংলায় এবং কিছুটা সংস্কৃতে।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'অবোধবন্ধু', রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থসংগ্রহ', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায়ের 'বঙ্গদর্শন'— ইত্যাদি সাহিত্য পত্রিকা পাঠের সুযোগ পেয়েছিলেন। পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণের সময় তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলির জ্ঞান পেয়েছিলেন। গৃহের পাঠ্য তালিকা থেকে থেকে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, শরীরতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান আরোহন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মনের টান ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি। ইংরেজি সাহিত্য পড়ার ফলে তাঁর বাংলা ভাষার গভীর জ্ঞান অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ যে একাধিক বিদেশি গ্রন্থাদি পড়েছিলেন তা প্রায় কমবেশি সবাই অবগত। তাঁর একাধিক রচনায় ও চিঠিপত্রাদিতে মার্ক টোয়েন, হার্বার্ট স্পেন্সার, হারল্যান্ড, টলস্টয়, ইবসেন প্রভৃতি বিদেশি লেখকের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কথা ছড়িয়ে আছে। 'ছিন্নপত্রাবলী'র (১৯৬০) বিভিন্ন পত্রে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন—

> 'এখানে এসে আমি এত এলিমেন্টস্ অফ পলিটিক্স্ এবং ফ্যুচার পড়ছি শুনে বোধ হয় তোর খুব আশ্চর্য ঠেকতে পারে।'[৩৮]

> 'আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে— আমি লো(কেনে)র ওখেন থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি— যখনি সময় পাই সেই বইটা উল্টে-পাল্টে দেখি। ঠিক মনে হয় তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কচ্ছি— এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি।[৩৯]

প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটি চিঠিতে পাই—

W. Harland-এর বইখানিতে যৌবন এবং বসন্ত টগ্‌বগ্‌ করচে— H. Spencer-এর গ্রন্থে বার্দ্ধক্য পরিপক্ক পরিণত। দুটোই যে আমি একসঙ্গে পড়তে পারলুম তার থেকে প্রমাণ হচ্ছে আমি এমন একটি বয়সে এসে পৌঁচেছি– যার এক সীমানায় যৌবনের রেখা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসচে এবং আর এক সীমানায় বার্দ্ধক্য ক্রমশ শুভ্র রেখায় স্ফূটতর হয়ে উঠচে।[৪০] এছাড়াও আমরা জীবনস্মৃতি লেখেন —

> 'হার্বার্ট স্পেন্সরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়।'[৪১]

• রবীন্দ্রনাথের লেখালেখি ও ইউরোপ:

রবীন্দ্রনাথের জীবনধারায় ও মননে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ পরিভ্রমণের ফলে তিনি ইউরোপীয় ভাবধারায় সমৃদ্ধ ছিলেন। ইংরেজ আগমনে ভারতবর্ষে এমনিতেই একটা পশ্চিমী হাওয়া প্রবাহিত হয়েছিল। বিশেষত, 'য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর-কোনো বিদেশী জাত কোনো দিন এমন করে আসতে পারে নি।'[৪২] রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলায় ইউরোপ যাওয়ার আগেই তাঁর পঠিত বিভিন্ন পুস্তক, বিভিন্ন নিকট আত্মীয়ের থেকে ইউরোপ সম্পর্কে শুনে তিনি একটি ইউরোপের একটি কল্পিত রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। "আমি ইংলন্ড দ্বীপটাকে এতো ছোট এবং ইংলন্ডের অধিবাসীদের এমন বিদ্যালোচনাশীল মনে করিয়াছিলাম যে, ইংলন্ডে আসবার আগে আশা করেছিলেম যে এই ক্ষুদ্র দ্বীপের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত বুঝি টেনিসনের বীণা ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে; মনে করেছিলেম, এই হস্ত পরিমিত ভূমির যেখানে থাকি না কেন গ্লাডস্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্সমুলরের বেদ ব্যাখ্যা, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, রেনের দর্শনশাস্ত্র শুনতে পাব; মনে করেছিলেম, যেখানে যাই-না কেন, ... "[৪৩] রবীন্দ্রনাথ সতোরো বছর বয়সে ইংলন্ড যাত্রার সময় থেকেই তাঁর মন পাশ্চিমাভিমুখী হয়ে ওঠে। এই সময় থেকেই তাঁর মনে পূবের ভিত্তির উপর পশ্চিমের ইমারত গড়ে উঠতে থাকে। তাঁর এই সময়কার পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতি-সম্পর্কিত কৌতূহলের কথা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন জীবনস্মৃতিতে। জার্মান

ইত্যাদি ভাষা শিক্ষার চেষ্টা এবং তার ভিতর দিয়ে হাইনে, গ্যেটের classics-এর আস্বাদলাভের চেষ্টা তিনি করেছিলেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কবি ও কাব্য নিয়ে তাঁর এই যুগের আলোচনাও মুদ্রিত হয়ে আছে ভারতীয়র পৃষ্ঠা। রবীন্দ্র মানসে পাশ্চাত্য প্রভাবের অর্থ এই নয়, তিনি পাশ্চাত্য আচার-আচরণও অনুকরণ করতে শুরু করেছিলেন। বাহ্যিক আচার-আচরণ নয়, পাশ্চাত্যের মর্মবাণীকে তিনি উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন ভিতর দুয়ার খুলে— এবং তা এই যুগ থেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে পাশ্চাত্য, বিশেষত ইউরোপ প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি বলেছেন, "যুরোপ হইতে একটা ভাবের প্রবাহ আসিয়াছে এবং স্বভাবতই তাহা আমাদের মনকে আঘাত করিতেছে। এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিলে নিজের চিত্তবৃত্তির প্রতি অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে। এইরূপ ভাবের মিলনে যে-একটা ব্যাপার উৎপন্ন হইয়া উঠিতেছে, কিছুকাল পরে তাঁহার মূর্তিটা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইবার সময় আসিবে।

এমনকী কীভাবে ইংরেজি সাহিত্য চর্চা করে বাংলা সাহিত্যে তার প্রয়োগ করতে হবে সে সম্পর্কেও তিনি স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, — "ইংরেজি সাহিত্য আমাদের সাহিত্যে হুবহু নকল করবার জন্য নয়। তার রসপানে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের অন্তরগূঢ় স্বকীয় শক্তিকেই নতুন উদ্যমে ফলবান করে তোলার জন্য।"[৪৫]

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে ইউরোপ:

রবীন্দ্রনাথের মানস-সৌধ তাই রচিত হয়েছিল ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর আধুনিক ইউরোপীয় উপাদানের সংমিশ্রণে। তিনি চিন্তায় ও চরিত্রে ছিলেন আধুনিক। এবিষয়ে অন্নদাশংকর রায়ের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর স্বদেশ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তেমনি তাঁর স্বকাল সম্বন্ধে। যেকালে জন্মেছেন সেকালের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হতে হলে পশ্চিম যাত্রা না করে উপায় নেই। কারণ স্বদেশের রাজধানী যেমন কলকাতায়, স্বকালের রাজধানী তেমনি লন্ডনে। বা প্যারিসে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই রকমই ছিল। ইদানীং বলা যেতে পারে নিউ ইয়র্কে। বা মস্কোতে। পরবর্তী বয়সে তিনি নিউইয়ার্ক বা মস্কোতে যান স্বকালের নাড়ী টিপতে। তাঁর মতো টন্‌টনে কালচেতনা বাংলাদেশে বিরল। তিনি যখন কলকাতা

থেকে শিলাইদহ বা পাতিসরে যেতেন জমিদারির কাজে সঙ্গে একরাশ ইংরেজি বই যেত। বিদেশী বলে নয়। স্বকালীন বলে। ... মোট কথা রবীন্দ্রনাথ স্বকালকে খুঁজতে বেরিয়েই ইউরোপে যান, ইউরোপকে খুঁজতে বেরিয়ে ইউরোপে যাননি।"[৪৬] রবীন্দ্রনাথের মানস গঠনে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁর রচনায় সমকালীন ইউরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা বিশেষ করে ইংরেজি থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আসলে রবীন্দ্রমানসের সৌন্দর্যময়তা, পৃথিবীমুখীনতা, সমাজসচেতনতা, উদার মানবিকতা ও বিশ্বানুভূতির ইত্যাদি আদর্শের উৎসভূমি আধুনিক ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা একথা আমাদের মনে রাখতেই হবে।

উনিশ শতকে জুড়ে একাধিক বাঙালি বিলাত তথা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গিয়েছিলেন শিক্ষার্জনের জন্য। এমনকি এই শতকের শেষে অনেকেরই ধারণা হত যে বিলেত না গেলে ভালো পড়াশুনা, ডিগ্রি, চাকরি, অর্থ-উপার্জন কোন কিছুই সম্ভব নয়। বিলাতে গিয়ে সাহেব-সুবা হওয়ার চেষ্টায় তারা অতিরিক্ত মদ্যপান, বিলাতি সাজ-পোশাক ও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করত। এমনকি সেখানে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ রমণীদের প্রেমে পড়ে এবং নিজের দেশীয় স্ত্রীকে মনে রাখে শুধুমাত্র টাকার প্রয়োজনে। এর ফলে বাংলার রক্ষণশীল সমাজ কখনও কখনও বিলাত-ফেরতদের 'একঘরে' করে রাখত। পরে তারা 'প্রায়শ্চিত্ত' করে এই রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে আপস করতেও তাদের দেখা যেত। তবে উনিশ শতকের শেষের দিকে এই বিলেতফেরতরা উচ্চশিক্ষার কারণে হোক বা সরকারি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণেই হোক, বঙ্গীয় রক্ষণশীল সমাজ সমাজচ্যুত করার পরিবর্তে তাদের প্রতি ক্রমশ সম্মান প্রদর্শন করতে থাকে। আমরা একাধিক গল্পে ও উপন্যাসে তার প্রমাণ পেয়ে থাকি। আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে প্রত্যক্ষ পটভূমি বা প্রেক্ষাপটে ইউরোপে কীভাবে হিসেবে এসেছে তা আলোচনার চেষ্টা করব। আর এর জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসটি নির্দিষ্ট করেছি। তবে উপন্যাসটি ছাড়াও তাঁর বেশ কিছু গল্পে প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপ প্রসঙ্গটি এসেছে। এই গল্পগুলি হল— 'প্রায়শ্চিত্ত' 'রাজটিকা' , 'নষ্টনীড়', 'বলাই', 'ধ্বংস', 'রবিবার', 'শেষ কথা' প্রভৃতি।

প্রায়শ্চিত্ত (১৮৯৪):

রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে পড়াশুনা, ডিগ্রি, চাকরি ও অর্থ-উপার্জন প্রসঙ্গে বিলাত তথা ইউরোপ প্রসঙ্গটি এসেছে। প্রতিবেশিনী কমলা তার ভাই রমেশের এল. এ. পরীক্ষা পাশ করার সংবাদ তার বাল্যসখী বিন্ধ্যকে আনন্দিত হয়ে জানাতে এলে বিন্ধ্যবাসিনী জানায় যে, এল. এ. পরীক্ষা কোন পরীক্ষার মধ্যেই পড়ে না। কারণ বিন্ধ্যবাসিনী তার স্বামী তথা গল্পের নায়ক অনাথবন্ধুর কাছে থেকে জানতে পেরেছে বিলাতে বি. এ. পরীক্ষার নীচের কোন পরীক্ষায় নেই। পরবর্তীতে অনাথবন্ধুর স্ত্রী তাদের সংসারের অভাব মোচনের কথা বলে, সঙ্গে তার দাদাও পীড়াপীড়ি করতে থাকে। এই সময় অনাথবন্ধুর মনে হয়, "আজকাল বিলাতে না গেলে কোনো ভদ্র চাকরি পাওয়া যায় না। আমি বিলাতে যাইতে মনস্থ করিতেছি, তুমি তোমার বাবার কাছ হইতে কোনো ছুতায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করো।"[৪৭] কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর বিলাতে যাওয়ার কথা শুনে মাথায় চিন্তিত হয়। পিতার কাছে অর্থসংগ্রহ করার চিন্তায় লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়। অনাথবন্ধু পূজার নিমন্ত্রণে এসে শ্বশুরের অর্থ অপহরণ করে এক বন্ধুর সহয়তায় বিলেত পালায়- 'তাহার স্বামী তাহার কোনো-এক বন্ধুর সাহায্যে বিলাতে যাইবার জাহাজভাড়া সংগ্রহ করিয়াছে, এক্ষণে সেখানকার খরচপত্র চালাইবার জন্য কোনো উপায় ভাবিয়া না পাওয়াতে গত রাত্রে শ্বশুরের অর্থ অপহরণ করিয়া, বারান্দাসংলগ্ন কাঠের সিঁড়ি দিয়া অন্দরের বাগানে নামিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে।'[৪৮] স্বামীর এই চুরির ঘটনাকে আড়াল করার জন্য বিন্ধ্যবাসিনী নিজেই এই অপরাধ কাঁধে তুলে নেয় এবং বলে, 'তাহার স্বামীকে বিলাতে পাঠাইবার জন্য সে এই কাজ করিয়াছে।'[৪৯] কিন্তু অনাথবন্ধু বিলাতে গিয়ে বিন্ধ্যবাসিনীর প্রতি তার অশিক্ষিতা, স্ত্রীর পরিবর্তে বিদ্যাবুদ্ধি-রূপগুণ সম্পন্ন ইংরেজ কন্যাকে সুযোগ্য বলে মনে করে। কিন্তু যখন তার অর্থের সংকট দেখা দেয়, তখন এই অগৌরবর্ণা স্ত্রী-ই তাকে অর্থের যোগান দেয়। এমনকি— 'যখন অর্থের অনটন হইল তখন এই নিরুপায় বাঙালির মেয়েকেই টেলিগ্রাফ করিতে তাঁহার সংকোচ বোধ হইল না। এবং এই বাঙালির মেয়েই দুই হাতে কেবল দুইগাছি কাঁচের চুড়ি রাখিয়া গায়ের সমস্ত গহনা বেচিয়া টাকা পাঠাইতে লাগিল। ... অবশেষে হাতের বালা, রুপার চুড়ি, বেনারসি শাড়ি এবং শাল পর্যন্ত বিক্রয় শেষ করিয়া বিস্তর বিনীত

অনুনয়পূর্বক মাথার দিব্য দিয়া অশ্রুজলে পত্রের প্রত্যেক অক্ষরপঙ্‌ক্তি বিকৃত করিয়া স্বামীকে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিল।'[৫০] এরপর অনাথবন্ধু দেশে ফেরে একেবারে সাহেব হয়ে। তাতেও স্বামীর হয়ে সাফাই গাইতে স্ত্রী সকলের সামনে বলে 'তাঁহাদেরর হিন্দুধর্মে ভক্তি পূর্বাপেক্ষা আরো অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে।' যাতে করে এই সমাজে প্রবেশ করতে কোনরূপ সমস্যা না হয়। ফলে সমাজে প্রবেশ করার জন্য রাজকুমারবাবু তাকে অনুরোধ করে বলে, "বাবা, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে হইবে।..."[৫১] এরপর যথা নির্দিষ্ট উপায়ে অনাথবন্ধু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করে ও হিন্দু সমাজে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করে। এতে স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীসহ শ্বশুরবাড়ির সকলে সমস্ত অপমান, দুঃখ ভুলে সভাস্থলে উপস্থিত হয়। এমন সময় সেই সভায় এক ইংরেজ মহিলা হাজির হয়ে আলিঙ্গন ও চুম্বন করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সেদিনের সেই সভা ভণ্ডুল হয়ে যায়। গল্পে লেখক ইংরেজ সম্প্রদায় ও আদবকায়দার প্রতি অন্ধভাবে অনুরক্ত এবং নীতিজ্ঞানহীন অন্যায়কারী অনাথবন্ধুকে বিদ্রূপ করেছেন লেখক। এই বিদ্রূপ বিশেষ এক শ্রেণীর সাহেব সাজা ভারতীয়ের প্রতি।

রাজটিকা(১৮৯৮):

'রাজটিকা'(১৩০৫) গল্পে বিলাতিয়ানায় সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আকর্ষণ ও পরে ইংরেজ চরিত্রের আসলরূপ প্রত্যক্ষ করে তা প্রত্যাখ্যান এবং সেই সঙ্গে সাহেবিয়ানার প্রতি রঙ্গ-রসিকতা দেখতে পাই।

গল্পে দেখি প্রমথনাথ একবার তিন বছরের জন্য বিলাত ভ্রমণে গিয়ে ইংরেজি পোশাক পরে দেশে ফিরে আসে। আর সে মনে মনে ভাবত কি করে ইংরেজের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে চলতে হয়, তাতে সে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। বিলাতে থাকাকালীন প্রমথনাথ বিলাতের বড় বড় লোকের কাছ থেকে অনেক সংবাদপত্র এনে ভারতবর্ষীয় ইংরেজ মহলে কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি লাভ করে। 'প্রমথনাথ বিলাতের বড়ো বড়ো লোকের কাছ হইতে অনেক সদরপত্র আনিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজমহলে কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। এমন-কি মধ্যে মধ্যে সস্ত্রীক ইংরাজের চা, ডিনার, খেলা এবং হাস্যকৌতুকের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাগ পাইতে লাগিলেন। ...'[৫২]

কিন্তু একসময় নতুন রেলওয়ে লাইন খোলা উপলক্ষে দেশের সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে প্রমথনাথ নবলৌহপথে যাত্রা করলে ইংরেজ দারোগা দেশীয় বড়লোকদের অপমানিত করে নামিয়ে দেন। অবশ্য প্রমথনাথকে ইংরেজদের বেশধারী দেখে বসতে বলেন, "আপনি উঠিতেছেন কেন, আপনি বসুন-না।"[৫৩] ইংরেজের এই ব্যবহারে প্রমথনাথ নিজে ও নিজের জাতিকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে বাড়ি ফিরে আসে। এরপর বাড়ির ছেলেপুলেদের ডেকে নিজের যাবতীয় বিলাতি বেশভুষাকে হেমাগ্নিতে জ্বালিয়ে দেয় এবং চায়ের চুমুক, রুটি পরিত্যাগ করে ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

এরপর নবেন্দুশেখর প্রমথর পরিবারের মধ্যমা ভগিনীকে বিবাহ করলে তার শ্যালিকারা বিলাতি বুট সিঁদুরে মন্ডিত করে ফুলচন্দন ও ধূপ-জ্বালিয়ে দেন। প্রমথর অন্য এক শালী একখানি চাদরের জোন্স্ স্মিথ ব্রাউন টমসন্ প্রভৃতি একরাশ ইংরেজের নাম লাল সুতো দিয়ে নামাবলি সেলাই করে উপহার দেন। আবার কেউ জপমালা ইত্যাদি একাধিক বিলাতি দ্রব্যকে ঠাট্টা ও কৌতুকের জন্য ব্যবহার করে।

নষ্টনীড় (১৩০৮):

রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পের — অমল, চারু ও ভূপতি এই তিনটি প্রধান চরিত্র আপাতত স্বতন্ত্র হলেও তাদের একটু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে, তারা আসলে একই ইউরোপীয় মন-মানসিকতায় ঐক্যসূত্রে গোথিত হয়ে উঠেছে।

গল্পে আমরা প্রথমেই ভূপতি চরিত্রের দিকে লক্ষ করলে দেখব, 'ছেলেবেলা হইতে তাঁর ইংরাজি লিখিবার এবং বক্তৃতা দিবার শখ ছিল। কোনোপ্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও ইংরাজি খবরের কাগজে তিনি চিঠি লিখিতেন, এবং বক্তব্য না থাকিলেও সভাস্থলে দু কথা না বলিয়া ছাড়িতেন না।'[৫৪] এইরকম ইংরেজি প্রিয়তা ভূপতির ঘি-তে অগ্নি সংযোগ ঘটায় তার উকিল শ্যালক উমাপতি কথা। উমাপতি বলে, "ভূপতি, তুমি একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির করো। তোমার যেরকম অসাধারণ ...।"[৫৫] ভূপতির যথেষ্ট আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকার সত্ত্বেও, অন্যান্য একাধিক অর্থ-উপার্জনের উপায় থাকলেও শুধুমাত্র ইংরেজি ভালোবাসার টানে সে

ইংরেজি কাগজের সম্পাদক হয়। এতে তার বালিকা বধূ চারুর একাকিত্ব দূর করতে অমলকে পড়ানোর দায়িত্ব দেয়। এবং পড়ানোর ক্ষেত্রেও ভূপতি সেই বিলাতি শিক্ষার কথাই বলেছে। 'তুমি অমল, ওকে একটু পড়াশুনোয় নিযুক্ত রাখতে পারলে ভালো হয়। মাঝে মাঝে চারুকে যদি ইংরাজি কাব্য থেকে তর্জমা করে শোনাও তা হলে ওর উপকারও হয়, ভালোও লাগে। ...'[৫৬] ভূপতির কথামত অমল চারুকে পড়ানো শুরু করে, পড়ানোর পাশাপাশি তাদের কথাবার্তার মধ্যে উঠে আসে আরও একাধিক বিষয়। এরমধ্য অন্যতম হল ভূপতির অন্তঃপুরের একখণ্ড জমিতে বাগান করার ভাবনা। এই প্রসঙ্গ সূত্র ধরে আসে তাদের ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রীতির কথা। সেই বাগানের প্রধান বনস্পতি একটি বিলাতি আমড়াগাছ। চারু অমল সেই বিলাতি 'আমড়াগাছের ছায়ায় বসিয়া চারু এবং অমল অসাধ্য সংকল্পের কল্পনাসুখ বিস্তার করিতেছিল।'[৫৭] চারুর সেই সাধের বাগানের মধ্যে বিলাতিয়ানাকে প্রাধান্য দিতে সেই কৌশলে বাগান করার পরিকল্পনা কথা বলে। সেই বিলাতিয়ানার ব্যতিক্রম হলে চারু বলে "তা হলে আমার বাগানে কাজ নেই।"[৫৮] পড়ানোর বকশিস হিসেবে চারু অমলকে হোটেলে খাবার খোরাকি ও ইংরেজি সাহিত্য গ্রন্থ কেনার খরচ জোগাতেন। অমল পড়াশোনা ও পড়ানোর পাশাপাশি ভূপতির ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রুফ-সংশোধনের কাজে সহয়তা করত। এরপর বর্ধমানের উকিল রঘুনাথবাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে অমলকে বিলাতে পাঠাতে চান। অমল বিয়ে করে বিলেত যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে চারু মনে মনে কষ্ট পেতে থাকে। কিন্তু তারপরেও চারুকে বলতে শুনি, 'ঠাকুরপো, বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের মতো কালা আদমিদের চিনতে পারবে তো?'[৫৯] অমল অবশ্য জানায়, দাদা ভূপতির বিপদের দিনে সাহায্য করার জন্য বিলাত যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। 'আমি ব্যারিস্টার হয়ে এসে দাদাকে যদি সাহায্য করতে পারি তবেই আমি পুরুষমানুষ।'[৬০]

বলাই (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫):

'বলাই' গল্পটি শান্তিনিকেতনে ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ মাসে বৃক্ষরোপণ উপলক্ষ্যে লিখিত ও পঠিত হয়। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গল্পটি সম্পর্কে লিখেছেন— "গল্পটি নিঃসন্তান

ধনী খুল্লতাত কর্তৃক লালিত একটি পিতৃমাতৃহীন বালকের কাহিনী, সে তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবনে উদ্ভিদের সহিত আত্মীয়তা অনুভব করিত। ইহা ইতিহাস নহে, কিন্তু কবি বলেন যে, বাল্যকালে উদ্ভিদ জীবনের প্রতি তাঁহার হৃদয়মনের ভাব ঐ বালকটির মতো ছিল।"[৬১] গল্পে বালক তথা বলাইয়ের এহেন জীবনে শিক্ষা প্রদান করতে তাকে নিয়ে বিলাতে যান তার পিতা।

আমরা দেখি, ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে প্রথমে পিতা এবং পরে পুত্রকে নিয়ে বিলাতে পাড়ি দেন। গল্পকথকের ভাইপোর নাম বলাই। ছোটবেলা থেকেই সে কাকা ও কাকিমার কাছে মানুষ হয়েছে। কারণ কথকের বৌদি মারা গেলে তার দাদা তাদের কাছে বলাইকে রেখে বিলাতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে যান। দশবছর পরে দাদা বিলাত থেকে ফিরে তাঁর ছেলে বলাইকেও বিলাতি শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবতে থাকে। এই ভাবনা-চিন্তা থেকেই বলাইকে তার বাবা প্রথমে সিমলায় এবং পরে বিলাতে নিয়ে যান। কথকের কথায়, 'আমার বৌদিদির মৃত্যু হয়েছে— যখন এই ছেলেটি তাঁর কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেয়াল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকির কোলেই মানুষ। বছর দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলাতি কায়দায় শিক্ষা দেবেন বলে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিমলেয়— তার পরে বিলেতে নিয়ে যাবার কথা।'[৬২]

রবিবার:

'রবিবার' গল্পের প্রথমে রয়েছে অভীক ও বিভার পূর্ব ইতিহাস এবং শেষে বিভার কাছে বিলাতযাত্রী অভীকের লেখা চিঠি। ত্যাজ্যপুত্র হওয়ার পর অভীক বার্ণকোম্পানির কারখানায় প্রথমে মিস্ত্রিগিরি ও পরে হেডমিস্ত্রির কাজ পর্যন্ত চালিয়ে দিয়েছে, আর শেষে জাহাজের স্টোকার হয়ে সে রওনা দিয়েছে বিলেতে— এঞ্জিনে কয়লা জোগানো তার কাজ। কিন্তু অভীকের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল চিত্রশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ।

অভীকের আঁকা ছবির নির্বিচারে ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করবার জন্য উপাসিকা-সম্প্রদায়ের অভাব কোনোদিনই হয়নি। কিন্তু বিভা এই উপাসকমণ্ডলীর থেকে সম্পূর্ণ বহির্ভূত ছিল। অভীকের ছবি নিয়ে অন্য মেয়েদের উল্লাসিত আতিশয্য বিভার দৃষ্টিতে 'অশিক্ষিতের ন্যাকামি'

বলে মনে হত। অনেকের প্রশংসা পেয়েও শুধু বিভার কাছে অভ্যর্থনা না পাওয়ার অভীক তীব্র ক্ষোভে ছট্‌ফট করত। কেবলই তার মনে হত সে একদিন য়ুরোপে যাবে আর সেখানে যখন জয়ধ্বনি উঠবে তখন বিভাও বসবে জয়মাল্য গাঁথতে। বলা বাহুল্য, বিভার জয়মাল্য এখানে অভীকের বরণমাল্যও বটে।

অমরবাবুর কাছে বিভা ম্যাথাম্যাটিক্স শেখে। বিভার মামা আদিত্য বিশ্বাস করে এই- "যথেষ্ট সুযোগ পেলে অমরবাবু দ্বিতীয় রামানুজম হবেন। ওঁর কষা একটুখানি প্রব্লেম আইনস্টাইনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ..."[৬৩] বিভা তার মায়ের কাছ থেকে উত্তারাধিকার সূত্রে পাওয়া গয়না বেচতে উদ্যত হয়েছে অমরবাবুর বিলেতে যাওয়ার 'পারানি কড়ি'র প্রয়োজন মেটাতে। এইসময় দুর্গাপুজোর চাঁদার পাঁচহাজার টাকা অভীক অমরবাবুর বিলাতযাত্রার ফান্ডে দান করেছে। তার কারণ অমরবাবুর বিলেতযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে বিভাকে অমরবাবুর সংস্পর্শমুক্ত করা অভীকের উদ্দেশ্য। এই ঘটনা থেকেই অভীক উপলব্ধি করেছে যে, নারীচিত্তের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি কঠিন প্রয়াসে অর্জন করাতেই পুরুষের সমস্ত তপস্যার সার্থক হতে পারে। আর তাই বিভার চিত্তে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার সাধনায় অভীক একেবারে স্বনির্ভরভাবেই বিলেতে রওনা দিয়েছে। কিন্তু যাওয়ার আগে সে বিভার গয়নাগুলি থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে সেই হারখানি, কারণ এতে তাদের দুজনের প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিতে মিশে আছে। এই হার বাজারে বিক্রি করতে যাওয়া আর অভীকের পাঁজর ভেঙে বুকের মধ্যে সিঁধ কাটতে যাওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পায় না অভীক। বিভার এই স্মৃতি চিহ্নটিই প্রবাসী অভীকের সুদীর্ঘ বিরহদুঃখের একমাত্র সঞ্জীবনী।

রবিবারের নায়ক অভীককুমারের সঙ্গে 'শেষের কবিতা'র অমিত রায়ের মিশেল আছে। দু'জনেই সমাজের মধ্যে প্রচণ্ড একটা প্রতিবাদ বলা চলে। অমিত যে সমাজকে ব্যঙ্গ করেছে, সেই সমাজের কাছেই শেষ পর্যন্ত আত্মসমার্পণ করতে বাধ্য হয়েছে; কিন্তু অভীককুমার সে সমাজের ধূলা ঝেড়ে ফেলে সমুদ্রপারে যাত্রা করেছে, তারই অঙ্কিত ছবি সম্বন্ধে বিদেশের বড় বাজারের সমর্থন আসিয়া বিভার শ্রদ্ধার আত্মপ্রতিষ্ঠা করবে এই আশায়, এবং আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, নাস্তিক অভীককুমার আস্তিক্যের পথেই বিভাকে বিবাহ করবে।

রবীন্দ্রনাথের আলোচিত গল্পগুলি ছাড়াও বেশকিছু গল্প আছে যেগুলিতে ইউরোপে প্রত্যক্ষভাবে আসেনি, কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবিত। এইসমস্ত গল্পগুলির বিষয়ে প্রথম নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণের"র সঙ্গে এডগার অ্যালান পো-র 'Under the Ragged Mountains'-র সঙ্গে তুলনা করেছেন। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের "নিশীথে" গল্পটির সঙ্গে পো-র 'Ligeia'-র গভীর সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনার সম্ভাব্য উৎস হিসেবে পো'র গল্পের কথা বলছেন। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের 'মহামায়া' ও 'গুপ্তধন' গল্পদুটির প্রেরণা হিসেবে আমরা পো'র "The premature Burial" ও "The Gold Bug" গল্প দুটির কথা বলতে পারি।[৬৪] কিন্তু সেই প্রভাব উপরিতলে। গল্পের অন্তর্গত সৌন্দর্য ও শিল্পসৃষ্টিতে তার স্বকীয়তা অম্লান।

শেষকথা (ফাল্গুন, ১৩৪৬):

রবীন্দ্রনাথের 'শেষকথা' গল্পের প্রেক্ষাপট বা পটভূমিতে এসেছে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রসঙ্গ। এই গল্পে আমরা দেখতে পাই, ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার সঙ্গে দেশীয় চিন্তা-চেতনার তুলনা।

গল্পকথক একজন জিয়োলজি(ভূ-তত্ত্ববিদ্যাবিশারদ)-র বিজ্ঞানী, নাম নবীনমাধব সেনগুপ্ত, বয়স ছত্রিশ বছর। সে বাংলা দেশের বিপ্লবী দলের সদস্য। ছাত্রাবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবের বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল। সে পরাধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করতে এবং দেশের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবনকে সঁপে দিয়েছিল। ব্রিটিশদের চোখে ফাঁকি দিয়ে আন্দামান থেকে আফগানিস্থান এবং পরে জাহাজের খালাসি হয়ে আমেরিকায় যায়। সেখানে সে দীক্ষা নেয় যন্ত্রবিদ্যার, ডেট্রয়েটে ফোর্টের মোটর-কারখানায় ঢুকে পড়ে— শুধু দেশকে বাঁচানোর জন্য। তার পর 'ফোর্ডের কারখানাঘর ছেড়ে তার পরে ন'বছর কাটিয়েছি খনিবিদ্যা, খনিজবিদ্যা শিখতে। য়ুরোপের নানা কেন্দ্রে ঘুরেছি, হাতে কলমে কাজ করেছি, দুই-একটা যন্ত্রকৌশল নিজেও বানিয়েছি— তাতে উৎসাহ পেয়েছি অধ্যাপকদের কাছে, নিজের উপরে বিশ্বাস হয়েছে, ধিক্কার দিয়েছি ভূতপূর্ব মন্ত্রমুগ্ধ অকৃতার্থ নিজেকে।' ইউরোপে থাকাকালীন সে বুঝতে পেরেছিল

শুধু তাদের বুদ্ধিই সব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ নয়, বরং কিছু সময় তাদের থেকে তার নিজেরও বেশি বুদ্ধিমান বলে মনে হয়েছে। সে বুঝতে পেরেছিল, বাংলার বিপ্লবীরা যে পথে অগ্রসর হচ্ছে তা 'আতশবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো, তাতে নিজের পোড়াকপাল পুড়িয়েছি অনেকবার, দাগ পড়ে নি ব্রিটিশ রাজতক্তে।'[৬৫] কারণ তিনি দেখেছিলেন, 'য়ুরোপীয় মহাসমরের ভীষণ প্রলয়রূপ তার অতি বিপুল আয়োজন-সমেত চোখের সামনে দেখা দিয়েছিল।' তাই তিনি আমাদের জাতীয় দুর্গের ভীত শক্ত করার কথা ভাবতে থাকেন এবং তিনি এও বুঝতে পেরেছিলেন, বাঁচতে চাইলে, জিততে চাইলে 'এ যুগে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের দিতে হবে পাল্লা। ...'

কথক বিজ্ঞানী নবীনবাবু দেশের খনিজ সম্পদের সন্ধানে ব্রতী হয়ে পাহাড়ে যায় সেখানে আকস্মিকভাবে একটি মেয়ের সন্ধান পায়, পরবর্তীকালে জানা যায় এই মেয়ের নাম অচিরা। এই অচিরার মোহেই একসময় নবীনমাধব আবিষ্ট হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে কথা বলার জন্য একটি সাজানো ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার করে কথাবার্তার প্রথম সূত্রপাত হয়। পরে অবশ্য নবীনবাবু জানতে পারে, অচিরা হল তার কথকের বন্ধু ভবতোষের বৃদ্ধ স্যারের একমাত্র নাতনি। বিলাতফেরত আই. সি. এস পাশ করা এবং বর্তমানে বিহারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভবতোষ মজুমদারের সঙ্গে তার বিয়ের কথা ছিল। কারণ এই ভবতোষকে তার বৃদ্ধ স্যার-ই বিলাতে পড়াকালীন পাথেয় ও অন্যান্য খরচ জুগিয়েছিলেন। ভবতোষ বৃদ্ধ স্যারের নাতনিকে প্রেমের জালে মোহিত করেছিল এবং কথাও দিয়েছিল যে, বিলাতে আই. সি. এস. পাশ করে দেশে ফিরে অচিরাকে বিয়ে করবে। কিন্তু বিলাতফেরত আই. সি. এস. পাশ করা ভবতোষ মজুমদার বিহারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হতে না হতে প্রেমিকা অচিরাকে ভুলে যায়। অচিরা ভবতোষকে লেখা চিঠি দু-টুকরো করে ফেলে দিলে— তা দেখে জিওলজিস্ট বিজ্ঞানী তার মনের ট্রাজেডির অনুভব করে এবং তাকে উদ্ধার করার কথা ভাবতে থাকে। কথক নবীনমাধব আগে অচিরাকে না চিনলেও অচিরা যে তাকে চিনত তা মেয়েটির কথাতে স্পষ্ট হয়। মেয়েটি জানায় সে তার দাদুর কাছে জেনেছে তার বিলাতি কাগজে লেখা প্রবন্ধের কথা। নবীনমাধব তার কেম্ব্রিজের সহপাঠী পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্কিমকে পত্র লিখে ভবতোষের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস জেনেছে।

কথক নবীনমাধব বিলাতে গিয়ে বিলাতি ডিগ্রি অর্জন করেছে। 'বিলেতে যাবার পর থেকে নিজের চেহারার উপর একটা গর্ব জন্মেছে। ও হাউ হ্যান্ডসাম- এই প্রশস্তি কানাকানিতে আমার অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিলেতফেরত আমার কোনো কোনো বন্ধুর কাছে শুনেছি বাঙালি মেয়ের রুচি আলাদা, তারা মোলায়েম মেয়েলি রূপেই পুরুষে রূপই খোঁজে। চলিত কথা হচ্ছে—কার্তিকের মতো চেহারা। বাঙালি কার্তিক আর যাই হোক, কোনো পুরুষের দেবসেনাপতি নয়। প্যারিসে একজন বান্ধবীর মুখে শুনেছি, 'বিলিতি সাদা রঙ রঙের অভাব; ওরিয়েন্টালের দেহে গরম আকাশ যে রঙ এঁকে দেয় সে সত্যিকার রঙ, সে ছায়ার রঙ, ঐ রঙই আমাদের ভালো লাগে।"[৬৬]

বিলাত প্রবাসী এক প্রেমিক পাত্রের কাছে উপেক্ষার পাত্রী হয়ে অচিরা আর এক বিলাতফেরত নবীনবাবুর প্রেমে ধরা দিতে চায় না। তাই সে বিলাতি পড়াশুনা, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক-পরিচ্ছেদের রুচি, ঘরবাড়ি সাজানোর পরিপাটি ইত্যাদি বিষয়-প্রসঙ্গ নিয়ে একাধিকবার ঠাট্টা করেছে। নবীনবাবুকে দাদু খাবার কথা বললে অচিরা জানায়, "ওঁরা বিলেতের ডিনার খাইয়ে জাতের সর্বগ্রাসী মানুষ— কেন তোমার নাতনির বদনাম করবে। অন্তত ভেটকিমাছ আর ভেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো।"[৬৭] এছাড়াও নবীনমাধবের বিলাতি বেগুনের নামকীর্তন করার কথা, বিলাতি মেমসাহেবের ঘরগোছানোর কথা তুলে তাদের বাড়ি যেতে নিষেধ করে। এমনকি বিলাতি তপস্বিনীর কথাও অচিরার মুখ থেকে বাদ যায় না—"বিলাতে যারা বিজ্ঞানে তপস্বী তাদের ত উপযুক্ত তপস্বিনী জোটে, যেমন ছিল অধ্যাপক কুরির সহধর্মিণী মাডাম কুরি।"[৬৮] উত্তরে নবীনবাবু জানায় সেরকম সেদেশের রিসার্চ করার সময় ক্যাথারিনের দিক থেকে প্রস্তাব এলেও দেশের স্বার্থে তা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত অচিরা নবীনবাবুর প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়েনি। তাই সে বলেছে, "সংকোচ করবেন না, আপনার তুলনায় আমি কেউ নই। সে কথাটা একদিন স্পষ্ট হবে। এখানেই শেষ বিদায় নিলুম। যাবার আগে আর কিন্তু দেখা হবে না।"[৬৯] কিন্তু অচিরা বিদায় নিলেও নবীনমাধব অচিরার ভাবনা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তার মনে হয়— 'খাঁচা থেকে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চরতে সেটা বাজে।'

ধবংস (১৯৪১):

রবীন্দ্রনাথের এই গল্পটির প্রেক্ষাপট এবং চরিত্রগুলি উভয়ই ইউরোপীয়। জার্মানির সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ প্রসঙ্গ এবং যুদ্ধে যে, কত নিরহ মানুষজনের জীবন কীভাবে অকালে ঝরে যায়, কত স্বপ্নে গড়া সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তার ইয়াত্তা থাকে না। যন্ত্র সভ্যতার দৌলতে মানব সভ্যতার উন্নতি শিকড়ে পৌঁছালেও তার ভয়ানক করাল গ্রাস মুহূর্তেই সবকিছু বিনষ্ট করে দিতে পারে, মূল্য থাকে না মানুষের ও জীবনের অনেক কালের গুণীদের ধ্যানের ধন — মন মাতানো শিল্পের কাজ। প্রশ্ন জাগে মানবসভ্যতায় যান্ত্রিকতা আর কতদূরে নিয়ে যাবে, আর কতটা আমরা কৃত্রিম হব বা হতে হবে?

প্যারিস শহরের অল্প একটু দূরে পিয়ের শোপ্যাঁ-র বাসাবাড়ি ছিল। তার জীবনের প্রধান শখ ছিল গাছপালার জোড় মিলিয়ে, রেণু মিলিয়ে তাদের রঙ ও স্বাদ বদল করে অন্য রকমের এক নতুন জগত সৃষ্টি করা। তার এই সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ পেতেন, কিন্তু কখনো ব্যবসা করতে পারতেন না। কারণ তিনি দাম চাইতে ভুলে যেতেন। বাবার এই কাজে মেয়ে ক্যামিল ছিল সর্বক্ষণের ছায়া সঙ্গী। তাই মেয়েকেও বাগানের কাজে পাকা তুলেছিলেন পিতা পিয়ের শোপ্যাঁ। এছাড়া এই মেয়ে বাবাকে রেঁধেবেড়ে খাওয়ানো, কাপড় সেলাই করে দেওয়া, চিঠির জবাব দেওয়া— সবটাই করত। এই ক্যামিলর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল জ্যাকের সঙ্গে।

এরপর জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ ফ্রান্সের বাঁধলে পিয়েরকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হয়। ক্যামিলও তার পিতাকে চোখের জল লুকিয়ে, বাগানকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবে বলে বাবাকে বিদায় জানায়। পিতা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলে হলদে রজনীগন্ধা তৈরি করবে বলে ক্যামিল পণ করেছিল। কিন্তু পিতা কেন যেন তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত পিতার কথাই সত্যি হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে পিয়ের সেনানায়কের তকমা পায়, এই খবর চিঠি লিখে জ্যাক ক্যামিলকে জানায়। কিন্তু এর দু-দিন পরে 'জ্যাক এসে দেখলে, সেইদিন সকালেই গোলা এসে পড়েছিল ফুলবাগানে। যে তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল তার প্রাণসুদ্ধ নিয়ে ছারখার হয়ে গেল

বাগানটি। এর মধ্যে দয়ার হাত ছিল এইটুকু, ক্যামিল ছিল না বেঁচে।' লেখক গল্পটি শেষ করেছে একটি কবিতাংশ দিয়ে—

'... পশ্চিমে হেনকালে পথে কাঁটা বিছিয়ে/ সভ্যতা দেখা দিল দাঁত তার খিচিয়ে।

সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিনু জানি তা—/ আজ দেখি কী অশুচি, কী যে অপমানিতা/

....

আজ তিনি নবরূপী দানবের বংশে/ মানুষ লাগিয়েছেন মানুষের ধ্বংসে।'[৭০]

গোরা (১৯১০):

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসের নায়ক চরিত্র গোরা জন্মসূত্রে আইরিশ। তবে আত্মপরিচয় জেনেছে শেষে। কিন্তু তাঁর চরিত্রে পাশ্চাত্যের মানুষের তেজ ও বলিষ্ঠতা লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ ভারতের মহামানবের সাগরতীরে পুব পশ্চিমের মিলনের যে কল্পনা করেছেন গোরা তারই প্রকাশ। তিনি সমকালে দেখেছেন ভগিনী নিবেদিতাকে। যিনি আইরিশ হয়েও হৃদয়ে কর্মে ভারতীয়।

শেষের কবিতা (১৯২৯):

'শেষের কবিতা' উপন্যাসের পটভূমি ইঙ্গবঙ্গ সমাজের। এই উপন্যাসের নায়ক অমিত এবং অন্যান্য পাত্র-পাত্রীর উঠে এসেছে এই সমাজ থেকেই। ইঙ্গবঙ্গ সমাজে চরিত্রদের স্বরূপ কেমন হয় তা লেখক খুব সুন্দরভাবে আমাদের সামনে এই উপন্যাসের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। আসলে 'শেষের কবিতা'য় কবি যে সমাজের কথা বলেছেন, তা সাধারণ বাঙ্গালী-সমাজ থেকে অনেক দূরের। এই ইঙ্গবঙ্গ সমাজকে লেখক তাঁর আর কোনও উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেননি। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের কৃত্রিমতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরূপতা সুবিদিত। তিনি আধুনিকতার তাগিদে পশ্চিমাভিমুখিতা সত্ত্বেও পশ্চিমী আচার-আচারণ অনুকরণের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব করেছিলেন বিভিন্ন রচনার মধ্যে। এমনকি অল্পবয়সের রচনা 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) থেকেই লক্ষ্য করা যায়।

ইঙ্গবঙ্গ সমাজের বেশিরভাগে পূর্বপুরুষেরা যা অর্থ জমিয়ে গেছেন সেটা অধস্তন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ফলে এদের আয়ের বা ব্যয়ের ভাবনা নেই। এঁদের অনেকেই বিলেতে গিয়ে সময় এবং অর্থ উভয়েই যথেষ্ট অপব্যয় করে দেশে ফেরেন। কেউবা সামান্য কোনও ডিগ্রি বা ব্যারিস্টারির ছাড়পত্র সংগ্রহ করে আনেন— অনেকে আবার সেটাও পারেন না। কিন্তু সবাই যেটা সমপরিমাণে পারেন সেটা হল মনের ওপর বিলাতের পাকা রঙের ছাপ ফেলতে। এদের স্ল্যাং-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণ, বিজড়িত, বিড়ম্বিত। এবং ওপর অনেকেরই আছে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলাতি শপথের দুর্বাক্যসম্পদ। মাত্রা এবং রুচিগত পার্থক্য অবশ্যই এদের মধ্যে আছে, কিন্তু মোটের ওপর এরা সাধারণ বঙ্গসন্তান থেকে স্বতন্ত্র। এসমাজের মহিলারাও স্বতন্ত্র— ফ্যাসানের পশরায় আপাদমস্তক যত্নে মোড়ক করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট বিশেষ। উচু খুরওয়ালা জুতো, লেসওয়ালা বুককাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে-অ্যাম্বারে মেশানো মালা, শাড়িটা গায়ে তির্যকভঙ্গিতে আঁট করে ল্যাপটানো। এরা খুটখুট করে দ্রুতলয়ে চলে, উচ্চস্বরে বলে, স্তর স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি; মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে, কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি। গোলাপি রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছের ফুর ফুর করে সঞ্চলন করে, এবং পুরুষ বন্ধুর চৌকির হাতার ওপর বসে সেই পাখার আঘাত তাঁদের কৃত্রিম স্পর্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জন প্রকাশ করে থাকে। এরা অনেকেই সাধারণ বাঙালি মেয়ের দীর্ঘ কেশ গৌরবেরগর্বের প্রতি গর্ব-সহকারে কাঁচি চালিয়ে খোপাটাকে ব্যাঙাচির ল্যাজের মতো বিলুপ্ত করে এবং অনুকরণের উল্লম্ফশীল পরিণত অবস্থাপ্রতিপন্ন করে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল করে। এই মহিলাদের অনেকেরই দেহে ওপরে একটি পাতলা সাপের খোলসের মতো ফুরফুরে আবারণ, অন্দরের কাপর থেকে অন্য একটি রঙের আভাস আসে। বুকের অনেকখানি অনাবৃত; আর অনাবৃত বাহু দুটিকে কখনও টেবিলে কখনও চৌকির হাতায় কখনও পরস্পরকে জড়িত করে যত্নের ভঙ্গিতে আলগোছে রাখার সাধনা সুসম্পূর্ণ। অনেকেই আবার সুমার্জিতনখররমণীয় দুই আঙ্গুল চেপে সিগারেট খায়, সেটা যতটা অলংকরণের অঙ্গরূপে, ততটা ধূমপানের উদ্দেশ্যে নয়।

অমিত যতই বুদ্ধি-বিলাসী, অস্বাভাবিক-অপ্রচলিতের পুজারী হোক না কেন, তার আন্তরিক আকর্ষণ কিন্তু নারীর মাধুর্যমণ্ডিত হৃদয়বৃত্তির স্বাভাবিকতা সম্পর্কেও। অক্সফোর্ডে যেদিন সে কেতকীকে আংটি পরিয়েছিল, 'সেদিন কেটিরমুখে প্রসাধনের প্রলেপ লাগেনি; তার হাসিটি সহজ ছিল, ভাবের আবেগে তার মুখ রক্তিম হতে বাধা পেত না।' কিন্তু কেতকী হয়েছে 'বিলিতি দোকানের পুতুলের মতো' এবং এটা সম্ভব হয়েছে হৃদয় বেঁচে নেই বলেই। শেষ পর্যন্ত অমিতের তাই সাধনা হল 'বর্ণান্তর করা', কেটির উপরকার রঙিন পাগড়িগুলি খসিয়ে তাকে 'বড্ড বেশি স্বাভাবিক' করে তোলা— কৃত্রিম ও আধুনিক কেটিকে চিরকালের কেতকী অথবা হৃদয় রসে জাড়িয়ে আরও স্নিগ্ধ করে, কেয়াতে পরিণত করা। কেটিও এই পরিবর্তন বিনা আপত্তিতে মেনে নিয়েছে। বস্তুত শেষ দিকে সবাই-যে কৃত্রিমতার মুখোশ খুলে ফেরে স্বভাবিকভাবে মুখশ্রীকে তারিফ করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে লেখকের ব্যঙ্গ বেশ পরিস্ফুট।

অমিত চরিত্র:

অমিত রায় ব্যারিস্টার। ইংরেজি ধাঁচে তার রায় হল 'রে', বন্ধু মহলে নামটি দাঁড়িয়ে গেল অমিট্ রায়ে। তার পিতা ছিলেন নামজাদা ব্যারিস্টার। যে টাকা তিনি রেখে গিয়েছিলেন তাতে কয়েক পুরুষের অনায়াসে চলে যায়। অক্সফোর্ডের ছাত্র অমিত পরীক্ষা দিতে দিতে এবং না দিতে দিতে সাত বছর কাটিয়ে দিল। সে বেহিসেবী উড়নচণ্ডী বান ডেকে সবকিছু ভাসিয়ে ছুটে চলে যায় বাইরের দিকে। তার দুই বোন সিসি আর লিসি অতি আধুনিকা। বিয়ের ব্যাপারেও অমিত অনেক বেশি খুঁতখুঁতে। আপন পরিচয়েই যার হবে পরিচয় এমন মেয়ের খোঁজ পেলেই সে বিয়ে করবে। শুধু বিদুষী হলেই চলবে না, তার মধ্যে থাকা চায় কালচার। অমিত শিলং-এর হোটেলে থাকার সময় বেরোত বিদেশি পোশাকে। একদিন অমিত কেটির হাতেও আংটি পরিয়েছিল। তখন কেটির বয়স ছিল আঠারো। তখন দুজনেই ছিল ইংল্যান্ডে। কেটি শিলং এ গিয়ে লাবণ্যের হাতে আংটি দেওয়া দেখে তা অমিতকে স্মরণ করিয়ে, সেই আংটি খুলে দ্রুতবেগে সেই স্থান ত্যাগ করে।

লাবণ্য চরিত্র:

লাবণ্যের পিতা অবনীশ দত্ত পশ্চিমের এক কলেজের অধ্যক্ষ। মাতৃহীন মেয়েকে তিনি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন। অবনীশ দত্তের অপর স্নেহের পাত্র ছিল শোভনলাল। সেই সূত্রে অবনীশ দত্তের লাইব্রেরিতে শোভনলালের অবাধ সঞ্চরণ ছিল। লাবণ্যকে সে মনে মনে ভালোবাসলেও লাবণ্য প্রথমে তা বুঝতে পারে না তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। পরবর্তীকালে দারুণ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে লাবণ্য পিতা অবনীশের সাতচল্লিশ বছর বয়সের বিধবার সঙ্গে বিয়ে দেয় ও নিজে সুরমাকে পড়ার কাজ নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে থাকে।

অমিত যোগমায়ার গৃহে উপস্থিত হয়ে ইংরেজ কবি ডন-এর কাব্য সংগ্রহ দেখতে পেলেন। ডন ছিল অমিতেরও প্রিয় কবি। যোগমায়া জানায় অমিতের কাকা অমরেশ ছিলেন তার জেলার বড় উকিল এবং একবার এক মোকদ্দমায় তাকে বাঁচিয়েছেন। অমিত ইংরেজ কবি ডনের কবিতার একটা অংশ লাবণ্যকে শোনায়—

> 'For God's sake, hold your tongue
> and let me love!'

অমিত তার বাংলা তর্জমাটিও শোনাল—

> 'দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর্।
> ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।'

এভাবে অমিত ডনের সহয়তায় লাবণ্যের কাছে নিজের হৃদয়টিকে উন্মুক্ত করে দেয়।[৭১]

'শেষের কবিতা'য় অমিত লাবণ্য বিদেশি গ্রন্থ পাঠ করেছে। অমিত বারবার বিদেশি কাব্যাংশ উচ্চারণ করেছে — জন কীটস, আর্থার সিমনস, ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতা সে বার বার বলে। লাবণ্যর সংগ্রহে ইংরাজ কবি ডন-এর কাব্যসংগ্রহ দেখা যায়। তাহাঁর গবেষণার বিষয়ও ছিল চসার। ডনের একটি বিখ্যাত কবিতার নাম 'The Canonization'। এই কবিতার মধ্যে রয়েছে নাটকীয় উক্তি— 'For God's sake, hold your tongue

and let me love!'[৭২]

লাবণ্যের টেবিলে ডনের কবিতা সংগ্রহের আবিষ্কার অমিতকে শুধু উৎসাহিত করেনি, তার প্রণয় নিবেদনের ক্ষেত্রেও একটা সুযোগ করে দিয়েছিল। পরে শিলঙ-এর পথে (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, 'নূতন পরিচয়') চলতে চলতে অমিত লাবণ্যকে ডনের কবিতার এই উদ্ধৃতিটি শুনিয়েছিল। অমিতের প্রণয় নিবেদনের প্রচেষ্টা যে বিফল হয়নি সেটা বোঝা গেল লাবণ্যের প্রতিক্রিয়ায়— 'লাবণ্যর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল।'[৭৩]

দশম পরিচ্ছেদে ('দ্বিতীয় সাধনা') Walt Whitman –এর 'Passage to India' থেকে একটি অংশ অমিত উচ্চারণ করেছে। সেদিন অমিত ও লাবণ্যকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে নিজের গলার সোনার হার দিয়ে যোগমায়া দুজনের হাত বেঁধে প্রার্থনা করেছিলেন 'তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক।' তারপর তিনি গিয়েছিলেন ফুল আনতে। অনেকক্ষণ অমিত ও লাবণ্য পাশাপাশি চুপ করে বসে থাকার পর লাবণ্য জানতে চেয়েছিল সারাদিনে অমিত তার বাসায় যায়নি কেন? এই পরিস্থিতিতেই রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করলেন হুইটম্যানের কবিতা —

"For we are bound where
mariner has not yet dared to go,
And we will risk the ship
Ourselves and all ."[৭৪]

এরপর বাংলা অনুবাদটিও সংযোজন করলেন এভাবে—

" আমরা যাব যেখানে কোনো
যায় নি নেয়ে সাহস করি।
ডুবি যদি তো ডুবি-না কেন।
ডুবুক সবি, ডুবুক তরী।"[৭৫]

আসলে অমিতের মনের সংশয়াপন্ন অবস্থা প্রকাশ করার জন্যই হুইটম্যানের সাহায্য নিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে একদিক থেকে, অমিতের কাছ থেকে। লাবণ্য ছিল অনেকটাই নীরব। অমিত কেন যায় নি লাবণ্যের এই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা লাবণ্যের হৃদয়টিকেও ব্যক্ত করল।

অমিত এটা বোঝার পর শুধু হুইটম্যান উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি। সে একইসঙ্গে স্মরণ করল আর্থার সাইমনের একটি কবিতার নাম— 'The Ecstasy'। এই কবিতার নিম্নলিখিত অংশটি অমিত লাবণ্যকে শুনিয়েছেন—

"O what is this?
Mysterious and uncapturable bliss
That I have known, yet seems to be
Simple as breath and easy as a smile,
And older than the earth."[৭৬]

লাবণ্যের আর্বিভাবে এবং তার ভালবাসার স্বীকৃতি জানার পর অমিত যে আনন্দ অনুভব করেছে তা বাস্তবিক 'Mysterious' এবং 'uncapturable bliss'।

একাদশ পরিচ্ছেদে ('মিলন তত্ত্ব') স্থান পেয়েছে Katherine Tynan Hinkson-এর কবিতা। অমিত ও লাবণ্যের বিয়ে ঠিক হলে সিদ্ধান্ত হয়, বিয়ের আগে উভয়ের আর দেখাশোনা হবে না। নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে উভয়ের সাক্ষাৎ হবে কীভাবে— সে কথা বলতে গিয়ে অমিত চিঠির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। সেই চিঠিতে থাকবে কবিতার একটা অংশ। চিঠিতে কেমন কবিতা থাকবে তার নমুনা দেখাতে গিয়ে অমিত একটি পাতায় লিখেছিল Katherine-এর 'The Beloved' কবিতার অংশ বিশেষ —

"Blow gently over my garden
Wind of the southern sea,
In the hour my love cometh
And calleth me."[৭৭]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে ('ব্যাঘাত') একেবারে শেষে স্থান পেয়েছে John Keats-এর 'Ode to a Nightingale' কবিতার অংশ। সাত বছর আগে যখন কেটির বয়স আঠার, তখন বিদেশের মাটিতে অমিত নিজের আঙুল থেকে খুলে একটা আংটি কেটির হাতে পরিয়ে দিয়েছিল। অক্সফোর্ডে একজন পাঞ্জাবি যুবক কেটির প্রণয়ে আসক্ত হয়েছিল। নৌকা বাইচে সেই

পাঞ্জাবিকে হারিয়ে অমিত কেটির মন জয় করেছিল। আংটি পরানো হলে অমিত কেটির কানে কানে বলেছিল—

> "Tender is the night
> And haply the queen moon
> is on her throne." [৭৮]

লাবণ্যের হাতে অমিতের পরানো সে আংটি অতীতের স্মৃতিকে বর্তমানের পটভূমিকায় টেনে আনে, সেই সূত্রে স্থান পেল জন কীট্‌সের কবিতার এই অংশটি।

'ধূমকেতু' শীর্ষক চতুর্দশ পরিচ্ছেদে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা থেকে নজির সংগ্রহ করে অমিত যে কথা বলেছে তা 'Lucy' কবিতাগুচ্ছের অন্তর্গত— 'Three years she grew in the sun and shower' থেকে গ্রহণ করেছে।

এই পঞ্চকবির উদ্ধৃতি ছাড়াও 'শেষের কবিতা'র অ্যাখ্যানভাগে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিদেশি কবি-সাহিত্যিক এবং তাঁদের সাহিত্য-কর্মের নাম এবং প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উত্থাপিত হয়েছে। এটা হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ অমিত মানুষ হয়েছে বিদেশে ইউরোপে। সে অক্সফোর্ডের ছাত্র, ইংরেজি সাহিত্য তার প্রিয় বিষয়। জীবনের চলনে-বলনে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য যে তাকে প্রভাবিত করবে এমনটা অনুমান করা স্বাভাবিক। অমিত নিজেই একদিন লাবণ্যকে বলেছিল— 'ইংরেজি কাব্যে আমার বিচার বুদ্ধি ঠাণ্ডা থাকে।' উপন্যাসের একেবারে শুরুতেই আছে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রসঙ্গ। বালিগঞ্জের সাহিত্যসভায় সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে অমিত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে বলেছিল "... বুড়ো ওয়ার্ডসওয়ার্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়রকম বেঁচে আছে।" এই বক্তৃতার সময়ই অমিত উল্লেখ করেছে টেনিসন, বায়রন-এর নাম— "তখন আবার হবে টেনিসনের সঙ্গে পুর্নমিলন, বায়রনের গলা জড়িয়ে করব অশ্রুবর্ষণ, ডিকেনস্‌কে বলব, মাপ করো, মোহ থেকে আরোগ্যলাভের জন্যে তোমাকে গাল দিয়েছি।"[৭৯] যতিশংকরকে পড়ানোর প্রসঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে 'অ্যাণ্টনি ক্লিওপেট্রার' নাম, গদ্যের চেয়ে পদ্যের ভাষার জোর বোঝাতে গিয়ে অমিত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ম্যাথু আর্নল্‌ড-এর 'ক্রিটিসিজ্‌ম অফ লাইফ'- এর কথা। পরোক্ষভাবেও এসেছে ইংরেজ কবিতা।

ইংরেজি সাহিত্য থেকে সংগৃহীত এই উপকরণগুলির তাৎপর্য বহুমাত্রিক। অমিত রায় বিলাতে মানুষ হয়েছে, পড়াশুনা করেছে অক্সফোর্ডে। ইংরেজি শিক্ষা এবং বিলাতের পরিবেশ তার চরিত্রকে বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করেছে। অমিতের কথাবার্তা, প্রেম নিবেদন প্রভৃতিতে ইংরেজি সাহিত্য ও সাহিত্যিকের প্রসঙ্গ উত্থাপন তার চরিত্রকে একটা বাস্তব ভিত্তিভূমি দান করেছে। যে সময়ে 'শেষের কবিতা' রচিত হয়, সে সময়ে বাংলা কাব্যে যে বিতর্কের ঢেউ উঠেছিল তাতে ইংরেজি সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। বিশেষত নবীণ প্রজন্মের কবিরা বিদেশি সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন যথেষ্ট পরিমাণে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২):

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমরী দেবী ঠাকুরবাড়ির আলোকিত জীবনচর্চ্চায় বেড়ে ওঠা এক ব্যতিক্রমী নারী। তাঁর ছিয়াত্তর বছর বয়সের জীবন পরিধিতে আঠাশ বছর বয়সে 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি সেকালের বাঙালি মেয়ের আলোহীন, অধিকারহীন জগৎ নিয়ে বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় 'মিবাররাজ' (১৮৮৭), 'হুগলীর ইমামবাড়ি' (১৮৮৮), 'বিদ্রোহ' (১৮৯০), 'ফুলের মালা' (১৮৯৫) এবং সব শেষে তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'কাহাকে' প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ সালে।

কাহাকে (১৮৯৮):

উপন্যাসের ঘটনাধারা নির্মাণে ইউরোপীয় সংযোগ সূত্র:

স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর 'কাহাকে' উপন্যাসে সমকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষিত উচ্চবিত্ত সমাজের একটি নিপুণ ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসটির মধ্যে আমরা বিলাতি জীবন-ধারা ও ঈঙ্গ-বঙ্গীয় সমাজের সামাজিক মেলামেশার চিত্র, ইংরেজ শিক্ষাগর্বিত বাঙালি সমাজের আদব-কায়দার পরিচয় পেয়ে থাকি। এই সমাজের স্বাভাবিক কথোপকথনের ভাষা ইংরেজি বলে এই উপন্যাসের একাধিক সংলাপ ইংরেজিতে লক্ষ করা যায়। প্রেমিকের কাছে মণি ইংরেজিতে পত্র পেয়ে সে ইংরেজিতেই তার উত্তর লেখার কথা ভাবতে থাকে, "বাঙালী হইয়া বাংলা ভুল করিলে তাহাতে আমাদের লজ্জা করে না— কিন্তু ইংরেজির একটা সামান্য ভুলে আমরা লজ্জায় মরিয়া যাই।"[৮০]

এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে বহু বিদেশি সাহিত্য পাঠের ও সাহিত্য আলোচনার চিহ্ন। মণির ভগিনীপতির বন্ধু ডাক্তার বিনয়কুমার, যাকে আমরা এই উপন্যাসের নায়ক বলতে পারি তাকেও দেখি, 'মিড্‌লমার্চ' বারবার পড়েও তার আশা মেটে না। তর্কের আসরে তার প্রবল প্রতিপক্ষ শেক্সপীয়রের সঙ্গে তুলনায় চ্যালেঞ্জ জানালে তিনি একটুও না দমে

বলতে থাকে— "... the genius shown in the works of George Eliot is in no way inferior to that of any renowned poet or novelist of England, dead of alive."[৮১] এই তর্কের সমাপ্তি হলে খাওয়ার টেবিলে বসে অন্যসব গল্পের মধ্যে বেশির ভাগ বিলেতের গল্প চলতে থাকে। সেখানে প্রথমে ইংলন্ডের শীতের কথা, তারপর সেখানের বরফে স্কট করার বর্ণনা প্রভৃতির গল্প চলতে থাকে। মণি তার ভগিনীপতির সম্পর্কে বলেছে, 'ভগিনীপতি বিলাতফেরত ব্যারিষ্টার, ইংরাজীয়ানা চালে চলেন; টেনিস খেলা উপলক্ষে হপ্তায় হপ্তায় তাঁহার বাড়িতে ছোটখাট একটি স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলনী হইয়া থাকে।'[৮২]

'কাহাকে' উপন্যাসটি আত্মকথন রীতিতে রচিত। কথক নায়িকা মৃণালিনী উত্তমপুরুষে সে এই উপন্যাসে শুনিয়েছে 'তার সকল দিনের পথ খোঁজা' আর সাঙ্গ হওয়ার গল্প-কাহিনি। দিনান্তে খুঁজে ফেরার একটাই উদ্দেশ্য সে 'কাহাকে' ভালোবাসে— এরই উত্তর সন্ধান। আর এরই সূত্র ধরে সে ফিরে গেছে বর্তমান থেকে অতীতে, অতীত থেকে বর্তমানে।

আমরা উপন্যাসের কাহিনি সূত্র ধরে দেখতে চেষ্টা করব অতীত ও বর্তমান কীভাবে মণির ভাবনা-চিন্তায় ও স্মৃতিপটে এক হয়ে গেছে। আর এক্ষেত্রে সেই সংযোগ সাধনের উদ্দীপক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে বিলেত ফেরত রমানাথ ঘোষ নামে একজন চরিত্র। এই রমানাথের সঙ্গে মণির পূর্ণ যৌবনকালে বিয়ের কথা (Engaged) পাকা করে মণির দিদি ও ভগিনীপতি। এরপর মণিরও ক্রমশ তাকে নিয়ে ভাব-ভালোবাসা ও আগ্রহ তৈরি হতে থাকে। মণির নিজের কথায় 'তাঁর প্রীতিময় ব্যবহারে, রূপে-গুণে আমার নয়নে তিনি সর্বসুন্দর হইয়া উঠিলেন; আপনাকে এই সর্বগুণধর সুপুরুষের সুখের কারণ ভাবিয়া আমি অতি উপাদেয় গর্বময় আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতে লাগিলাম।'[৮৩] কিন্তু তাতে জল ঢেলে দেয় মণির ভগিনীপতির বন্ধু ডাক্তার ও রমানাথের একান্তে কথোপকথন। মণি বুঝতে পারে রমানাথ ঘোষ বিলাতে থাকাকালীন একটি বিলাতি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করে (Engaged)। এরপর খুব নরম স্বরে হলেও মণি স্পষ্ট ও দৃঢ়তার সঙ্গে দিদি ও ভগিনীপতিকে জানায় তার পক্ষে আর রমানাথকে বিয়ে করা, মেনে নেওয়া কিংবা ভালোবাসা কোনো কিছুই সম্ভব নয়। এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই মণি আবার তার মন হারায় ভগিনীপতির বন্ধু ডাক্তারের কাছে। এরকম অবস্থায় একটি চরম

অস্বস্তিকর পরিবেশে বাইরে মিথ্যা রটনা প্রচারিত হয় রমানাথের সঙ্গে মণির বিয়ে হয়ে গেছে। ফলে ক্রোধান্বিত হয়ে মণির পিতা তাকে বাড়িতে নিয়ে এসে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা জানান। এই পাত্রের নাম বিনয়কুমার, যার মায়ের সঙ্গে মণির বাবার কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। পরে আমরা উপন্যাসে অবশ্য নাটকীয় ভাবে দেখি, বিনয়কুমার আর কেউ নয় সেই ভগিনীপতির বিলেত ফেরত বন্ধু ডাক্তার আর মণির ছোটবেলার, অতীতের ছোটু যাকে সে ভালোবাসত। এভাবেই গোটা উপন্যাস জুড়ে মণির ভালোবাসার ব্যক্তি খোঁজার, 'কাহাকে' খোঁজার পরিসমাপ্তি ঘটে।

উপন্যাসের পটভূমিতে ইউরোপ প্রসঙ্গ:

'ব্যারিষ্টারদিগের নিকট তাঁহাদের মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় গল্পের মত প্রীতিজনক গল্প আর নাই, উপরোক্ত প্রশ্নে ভগিনীপতি পূর্ব্ববর্তী কথা ভুলিয়া গেলেন।'[৮৪] উপন্যাসের মূল সমস্যাটিও ডাক্তারের ইংরেজি ভাষায় বর্ণিত হয়েছে– "By the way, I met Miss K, just before leaving England. She seemed very anxious to know wheather you had arrived safely and why you did not send her the money you had promised for her passage out to India. You known her people will have nothing to do with her since her engagement to you, so the poor girl—"[৮৫] মণির বিয়ের অচলাবস্থা নিয়ে তার বাবা দিদিকে বলেন "নিজে দেখে শুনে যে পাত্র পছন্দ করব, তাকেই মেয়ে দেব। তোমাদের মত ইংরাজী কোর্টসিপ আর না।"[৮৬]

এখন উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রের পরিচয় সূত্রে বিলাতের কথা কীভাবে এসেছে তা দেখা যেতে পারে।

দিদি: মণির থেকে চার-পাঁচ বছর বড়। কলকাতায় পিসিমার বাড়িতে বেশিরভাগ সময় কাটাতেন পড়াশুনার জন্য। তার বিয়ে হয় একজন বিলেতফেরত ব্যারিষ্টারের সঙ্গে। মণি রমানাথের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করলে দিদি বলে, "ও বিলাতের কথা ছেড়ে দে।"

আবার বিলাতের মেয়েদের সম্পর্কে বলে— "বিলাতের মেয়েদের কুহক ত প্রসিদ্ধ কথা, আমার মনে হচ্ছে, নেহাৎ কোনরূপ একটা পাক-চক্রে পড়ে বেচারার এমনতর বিভ্রাট ঘটেছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলেই এর এমন একটা সদুত্তর পাওয়া যাবে যে, তখন সে মেয়ের চেয়ে তার উপরেই বেশী মায়া করবে!"[৮৭]

রমানাথ: মণি রমানাথ সম্পর্কে প্রথম আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে এভাবে, '"তিনিও" বিলাতফেরত ; ভগিনীপতির সহিত একটু কি রকম সম্পর্কও আছে, ভগিনীপতির ভগিনীপতির দূরসম্পর্কীয় ভাই, কি এই রকম একটা কিছু।'[৮৮] মণির এই বিলেতফেরত রমানাথ সম্পর্কে, ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেও দেখা যায়। তাই তিনি ভেবেছেন, 'ইংলন্ডে best manners যিনি শিখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাতে সুরুচি বা ভদ্রতার অভাব সম্ভবে? আমারি অমার্জিত অশিক্ষিত রুচিবশতঃ তাহা ঠিক উপলব্ধি করিতেছি না।'[৮৯] যৌবন বয়সে মণি বিলেতফেরত রমানাথের প্রতি ভালোবাসার মোহে আকৃষ্ট হয় একটিমাত্র গাওয়া গানে, যে গান সে ছোটবেলায় ছোটুর কণ্ঠে গুনগুন করে শুনেছিল; সেই গান। দিদির বাড়িতে টেনিস পার্টিতে বিলেতফেরত মিস্টার ঘোষের কণ্ঠে মণি এই গানটি শোনে। এদিকে বিলেতফেরত ব্যারিস্টার হওয়ায় তার সমাজে বিয়ের বাজার রীতিমত; সুপাত্র বলে পরিগণিত। মণির কথার জবাবে রমানাথ যা বলে তাতেও আমরা ইউরোপীয় সংস্কৃতির কিছুটা আভাষ পেয়ে থাকি। "... আসলে তেমন কিছুই নয়— সামান্য flirtation মাত্র; বিলাতে ত এমন আখসারই হয়ে থাকে—" [৯০] মণি রমানাথকে চিঠির জবাব জানতে গিয়ে রমানাথ সম্পর্কে এবার ভাবে— 'ইঙ্গবঙ্গ যুবা— যাঁহার জীবনই ইংরাজী অনুকরণ, তাঁহার প্রণয়পত্র যে মাতৃভাষায় লিখিত হইবে— বোধ করি, আমি খুলিয়া না বলিলেও, এমন আজগুবি ভুল কেহ করিতেন না।'[৯১]

মৃণালিনি: সে পড়াশুনা করেছে লোরেটো কন্‌ভেন্ট-এ। বয়স উনিশ, কুড়ি বা একুশ বছর। শিক্ষিতা ও আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। আত্মবিশ্বাসে বলীয়মান হয়েই সে নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে শিখেছে, ভুল ভালোবাসাকে নির্ণয় করে সেখান থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে সরে এসেছে। দিদি ও ভগিনীপতির বাগদানের সম্পর্ক ভেঙে দিয়েছে এই যুক্তিতে যে, তাকে অর্জন করে নিতে হলেও যোগ্যতা চাই, সমকক্ষতা চাই, যে তার 'ক্ষমার পাত্র' তাকে প্রণয়ী বা স্বামী বলে মেনে

নিতে সে পারে না। আর তাই ভালোবাসার প্রশ্ন উঠলে মণি বলে, "যেন ভালবাসিলে লোকে ন্যায়ান্যায় জ্ঞান পর্যন্ত হারাইয়া ফেলে, অন্যায়কে— দোষকে পূজা করাই যেন ভালোবাসা। আমি তাঁহাকে যেরূপ ভাল লোক মনে করিয়া ভালবাসিয়াছিলাম— তিনি যে তাহা নহেন, সে যেন আমারি দোষ!"[৯২] রমানাথের প্রেমবঞ্চিত পূর্বপ্রণয়িণী বিলেতি মহিলার প্রতিও সে সমবেদনাশীল। তাই সে তার সুখের পথের কাটা না হওয়ার অভিপ্রায় ঘোষণা করে। শেষ পর্যন্ত তার বাল্যকালের প্রেমিক, ভালোবাসার মানুষ ছোটুর সন্ধান পেয়ে তাকেই বিয়ে করে সমস্ত সমস্যার সমাধান করেন। 'কোন একটি ভাল ফুল দেখিলে একবার মনে হইত, বাবাকে দিই, একবার মনে হইত, তাহাঁর জন্য লইয়া যাই; যে দিন দেখিতাম, বাবা উঠিয়াছেন সেদিন ফুলটি তাঁহাকেই দিতাম, আর যে দিন দেখিতাম, তিনি উঠেন নাই, সেদিন ছোটুর জন্য লইয়া যাইতাম। সকালে যেমন ছোটুর কাছে যাইতে ব্যগ্র হইতাম, সন্ধ্যাবেলা তেমনি আগ্রহে বাবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম, যাহার কাছে যখন থাকিতাম, তাহাকেই তখন বেশী ভালবাসি বলিয়া মনে হইত।'[৯৩] মণি একসময় বিয়ে না করে ইংলন্ডের মতো নিজে অবিবাহিত থেকে, দেশের কাজে জীবনকে উৎসর্গ করতে চেয়ে তার বাবার কাছে চিঠি লেখে। এবং এই কাজে তার একমাত্র সুখ বলেও জানায়। বাবা অবশ্য তাকে সম্মতি দেয়নি।

বিনয়কুমার বোস: জমিদার কৃষ্ণমোহন বাবুর ভাগিনেয় ছোটু। বাবা না থাকায় তিনি কৃষ্ণমোহন বাবুর কাছেই বড় হন। এই বাড়িতে পড়ার সময়ে মণির সঙ্গে তার পরিচয় হয়। পাঠশালার সকলকে সে হরির লুঠের মতো করে মুড়ি-মুড়কি বিতরণ করে, পণ্ডিত মহাশয় দেড়িতে এলে পড়া বলে দিত ও কপি-বুকে অক্ষর লিখে দিত। সে তখন সকলের অলক্ষ্যে গুনগুন করে গান করত। মণি ও তার সঙ্গীসহ সেই গানের কয়েকটি শুনে মুখস্ত করে নেয়, যা পরবর্তীকালে মণির জীবনে প্রেমের উদ্দীপন বিভাব হয়ে থাকে। গানটি হল-

"হায়! মিলন হোলো,
যখন নিভিল চাঁদ, বসন্ত গেলো!
হাতে ক'রে মালাগাছি, সারাবেলা ব'সে আছি
কখন্ ফুটিবে ফুল, আকাশে আলো—"[৯৪]

ডাক্তার বিলাত থেকে ফিরে বুঝতে পারে মণি তাকে মন থেকে চায়, আর সেজন্যই সে যেন সেই ডাক্তারের ছোটবেলা সেই ছোটুকে খুঁজে ফেরে সারাক্ষণ। ডাক্তারকে ইউরোপের সৌন্দর্য এতটাই মুগ্ধ করেছিল যে বাইরের আর কোন দৃশ্য তেমন আশ্চর্য বলে মনে হয়নি! এছাড়াও সেখানকার জ্বলন্ত স্বাধীনতা, অদম্য উদ্দাম উৎসাহকে ভালোলাগার কথা বলেছে। তুলনা করেছেন আমাদের স্বদেশের সঙ্গে ইউরোপের মানুষের মানস প্রবণতাকে। 'আমাদের দেশের মত অলস বিশ্রাম যেন তারা জানে না। একজন দশজনের কাজও করে, দশজনের আমোদও করে। আমার কলেজের প্রায় প্রত্যেক ছোকরাকেই দেখতুম— যথাসময়ে লেকচার শোনে— surgical operation শেখে,— পালায় পালায় duty তে থাকে, রাত জেগে পড়াশুনাও করে,— আবার ফুটবল, হকি, বোটরেস— সকল রকম খেলাতেই যোগ দেয় ; ডিনার পার্টি, বল, থিয়েটার ঘুরতেও বাকি রাখে না। আমি তো তাদের energy দেখে প্রথম প্রথম অবাক্ হয়ে যেতুম।'[৯৫] তারপর সে দেশের সময় সচেতনতা, কাজের সুচারু শৃঙ্খলায় কাজ সহজ ও বেশি করা যায়। 'জীবনগুলো সে দেশে যেন ঠিক ঘড়ির কাঁটার চালে চলে। নিমন্ত্রণ খেতেই যাও,— দেখাশুনা করতেই যাও, বা কাজের জন্যই কারো কাছে যাও, সব তাতেই যেন ট্রেন ধরতে যাচ্ছ— এমনি ভাবে সময়ের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়।'[৯৬] তাই তার মনে হয় 'শিক্ষিত স্ত্রীপুরুষ সকলেরি একবার করে অন্তত সে দেশে যাওয়া উচিত। সেখানকার সেই মুক্ত স্বাধীন বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ করলেও আমাদের মত নির্জীব জীব নতুন জীবন পায়, তারও যেন জীর্ণ- সংস্কার হয়! সে সব idea এ-দেশে বসে কল্পনাতে পোষণ করতেও লজ্জা বোধ হয়, সে দেশে ব'সে সেই সবই সত্য সাধনার বিষয় বলে মনে হোত।'[৯৭] ভগিনীপতি তাতেই সায় দিয়ে ইংলন্ড ও ইন্ডিয়ার তফাৎ-এর কারণ বলে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষের ইউরোপ তথা বিলাতী সংস্কৃতির প্রতি ছিল তীব্র মোহ। তা সে পড়াশুনাতে হোক বা কর্মজীবনে হোক। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর এই উপন্যাসের মধ্যে তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। উপন্যাসের প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রের কথা-বার্তায়, কাজে-কর্মে ও চিন্তা-চেতনার প্রতি পদে পদে বিলাতি সংস্কৃতির জয়গান ঘোষিত হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম মণি, দেরিতে হলেও সে বুঝতে পেরেছে আত্মমর্যাদাকে। তাই সে জীবনের ভুল ভালোবাসাকে ভুল বলে প্রমাণ করতে পেরেছে। ফলে দিদি ও ভগিনীপতির মনোনীত বিলাতফেরত রমানাথকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

উৎস নির্দেশ:

১. দত্ত, ভবতোষ, *চিন্তানায়ক বঙ্কিম,* দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০০৮, পৃষ্ঠা- ১৩

২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, *সাহিত্য সাধক চরিতমালা,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃষ্ঠা- ৩৪৮

৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩

৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪

৫. সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র, *বঙ্কিম-প্রসঙ্গ* (সঙ্কলিত), মুখার্জি বোস এণ্ড কোং, পৃষ্ঠা- ১৫৮

৬. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *ধর্মতত্ত্ব,* (সম্পা.) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ১৩৪৮, পৃষ্ঠা- ৭৬

৭. দে, সুধাংশুশেখর (সম্পা.), *বঙ্কিম রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃষ্ঠা- ২০

৮. সেনগুপ্ত, স্বরাজ (সম্পা.), *নবপর্যায় জিজ্ঞাসা,* বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ সংখ্যা, প্রতিষ্ঠা সম্পাদক: শিবনারায়ণ রায়, সম্পাদকচতুস্ত্রিংশ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০১৬-২০১৭, পৃষ্ঠা- ১৪১

৯.https://shakespeare.folger.edu/downloads/pdf/the-comedy-of-errors_PDF_FolgerShakespeare.pdf, p- ১১, (তারিখ- ২৬-০১-২০২২, সময়- বিকাল ৩.০০)

১০. দে, সুধাংশুশেখর (সম্পা.), *বঙ্কিম রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃষ্ঠা- ১৩৫

১১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৬

১২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৯

১৩. Byron, Load, Don Juan',, Publisher Boston, Houghton Mifflin, Publication – 1958, p- 164

১৪. দে, সুধাংশুশেখর (সম্পা.), *বঙ্কিম রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃষ্ঠা- ১৩৫

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯২

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯২

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭৮

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭৮

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮০

২০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস (সম্পাদক), *রজনী,* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ১৩৪৭, পৃষ্ঠা- বিজ্ঞাপন অংশ

২১. তদেব, পৃষ্ঠা ৮৭

২২. তদেব,পৃষ্ঠা ৫৭

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৮

২৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৭৯

২৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস (সম্পাদক), *কৃষ্ণকান্তের উইল,* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ১৩৪৭, পৃষ্ঠা- ৯১

২৬.https://shakespeare.folger.edu/downloads/pdf/twelfth-night_PDF_FolgerShakespeare.pdf, দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য, (তারিখ- ২৬-০১-২০২২, সময়- বিকাল ২.৩০)

২৭.https://shakespeare.folger.edu/downloads/pdf/twelfth-night_PDF_FolgerShakespeare.pdf, দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য, (তারিখ- ২৬-০১-২০২২, সময়- বিকাল ২.৩০)

২৮. সেন, সুকুমার সেন, *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস,* তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৫০, পৃষ্ঠা- ১৭৮

২৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৬, পৃষ্ঠা- ১১৯

৩০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৯

৩১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৫-১২৬

৩২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৩

৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৫

৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৮

৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৯-১১০

৩৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৩

৩৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৬, পৃষ্ঠা- ২১

৩৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পত্র ৪২, শনিবার ৮ই এপ্রিল, পৃষ্ঠা- ৭৪

৩৯. বুধবার ২২শে মার্চ১৮৯৪, পত্র ১১৭, পৃষ্ঠা- ১৭৮

৪০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র ৮, প্রিয়নাথ সেনকে লেখা, ১৯০০, পত্র ১২৫, পৃষ্ঠা- ১৩২

৪১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৬, পৃষ্ঠা- ১৩৯

৪২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *কালান্তর,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৩৯০, পৃষ্ঠা- ১৩

৪৩. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্র-জীবনী* ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক(দশম), বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, প্রথম প্রকাশ ১৩৪৩, পৃষ্ঠা- ২৪২-৪৩

৪৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সাহিত্য,* "সাহিত্যসৃষ্টি" বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা ১৩৪৪, পৃষ্ঠা- ১০৯

৪৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সংগীত চিন্তা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা ১৩৭৩, পৃষ্ঠা- ৯৬

৪৬. রায়, অন্নদাশংকর, ‘পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ও রবীন্দ্রনাথ’, পৃষ্ঠা- ৫৯-৬১

৪৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা ১৩৭৩, পুনর্মুদ্রণ ১৩৮৮, পৃষ্ঠা- ২১৩

৪৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ২১৩

৪৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ২১৪

৫০. তদেব, পৃষ্ঠা- ২১৫

৫১. তদেব, পৃষ্ঠা- ২১৬

৫২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা ১৩৭৩, পুনর্মুদ্রণ ১৩৮৮, পৃষ্ঠা- ৩২৬

৫৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৭

৫৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮৫

৫৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮৫

৫৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৯৩

৫৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮৮

৫৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮৭

৫৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪০৯

৬০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪১১

৬১. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী,* তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ২৩৭

৬২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা ১৩৭৩, পুনর্মুদ্রণ ১৩৮৮, পৃষ্ঠা পৃ- ৬৫২

৬৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৭১

৬৪. দাশ, শিশিরকুমার। *বাংলা ছোটগল্প(১৮৭৩-১৯২৩),* দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩, পৃষ্ঠা- ১২২

৬৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা ১৩৭৩, পুনর্মুদ্রণ ১৩৮৮, পৃষ্ঠা- ৬৭৮

৬৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৮২

৬৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৮৬

৬৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৮৮

৬৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৯৩

৭০. https://www.tagoreweb.in/Stories/galposalpo-149/dhwangso-556 (তারিখ- ২৬-০১-২০২২, সময়- দুপুর ১.১৫)

৭১. রায়, অন্নদাশঙ্কর, 'পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ও রবীন্দ্রনাথ', পৃ- ৩২

৭২. নন্দী, রতনকুমার, রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা, বঙ্গীয় সাহত্য সংসদ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৩২

৭৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২

৭৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৬

৭৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৬

৭৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬১

৭৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৯

৭৮. বিশী, প্রমথনাথ, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প,* কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১২৮

৭৯. নন্দী, রতনকুমার, রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা, বঙ্গীয় সাহত্য সংসদ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৫১

৮০. দেবী, স্বর্ণকুমারী, *কাহাকে,* সুদক্ষিণা ঘোষ (ভূমিকা), দে'জ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২, পৃষ্ঠা- ৫৩

৮১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৪

৮২. দেবী, স্বর্ণকুমারী, *কাহাকে,* সুদক্ষিণা ঘোষ (ভূমিকা), দে'জ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২, পৃষ্ঠা- ২২

৮৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭

৮৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০

৮৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০

৮৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭০

৮৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৪

৮৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ২২

৮৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪

৯০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬

৯১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪১

৯২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮

৯৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ২১

৯৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০

৯৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৭

৯৬. তদেব

৯৭. তদেব

তৃতীয় অধ্যায়:

রবীন্দ্র সমসাময়িক বাংলা কথাসাহিত্য

অনুবাদের আস্বাদনে ইউরোপ

রবীন্দ্র সমসাময়িক বাংলা কথাসাহিত্য ও কথাসাহিত্যিক:

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে থেকে প্রদীপ, সাহিত্য, দাসী, সখা, মুকুল ইত্যাদি পত্রিকায় আমরা অনুবাদমূলক গল্পের সন্ধান পেয়ে থাকি। 'মুকুল' পত্রিকার ইংরেজি থেকে অনূদিত প্রায় সব গল্পগুলি ছোটদের জন্য বিভিন্ন দেশীয় রূপকথা মূলক। এছাড়াও অন্যান্য পত্রিকাগুলিতেও ইংরেজি, ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিভিন্ন গল্প অনূদিত হতে থাকে। প্রমথ চৌধুরীর মতো কতিপয় কয়েকজন লেখক সরাসরি ফরাসি গল্প অনুবাদ করলেও আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, বাংলায় ফরাসি সাহিত্য দূরের কথা ইংরেজি সাহিত্য বিশেষ অনুবাদ হয় নি। ফরাসি ও রুশ গল্পের সঙ্গে ইংরেজির মাধ্যমেই বাঙালি পাঠকের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। তবে একাধিক লেখকের অনুবাদ মূলক রচনা থেকে বাঙালি লেখক ও পাঠকের বিদেশি সাহিত্যের প্রতি ক্রমে অনুরাগ। বিশেষ করে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকা এক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 'সাহিত্য' ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ইংরেজি থেকে প্রকাশিত হয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'আয়না', এরপর ১৩০৬ সালের বৈশাখ ইংরেজি থেকে প্রকাশ হয় 'সমুদ্র সলিলে' এবং ১৩০৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মোপাসাঁর গল্প অবলম্বনে 'যাত্রাপথে'। এই পত্রিকাটিতে অনেক বিদেশি গল্প অনুবাদের পাশাপাশি বিদেশি লেখকদের নিয়েও নানা আলোচনা প্রকাশিত হত। এই সময়েই 'দাসী' (১৮৯৫) পত্রিকায় কন্টিনেন্টাল সাহিত্যিক টলস্টয়ের 'জীবনোপায়' গল্পটি অনুবাদ করেন অপূর্বচন্দ্র দত্ত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ফরাসি-প্রসূন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে। এর মধ্যে তিনি দোরিয়াক, মরে, গাবোরিয়ো, জোলা, মার্ক, শার্ল-গোলে, আলফঁস দোদে, দুমা, বালজাক, মোপাসাঁ প্রভৃতি লেখকদের গল্পের অনুবাদ করেছেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখি, টলস্টয়ের গল্পগুলি একাধিকবার অনূদিত হতে থাকে। চারুচন্দ্র গুহর 'টলস্টয়ের গল্প' (১৯১৯), দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়ের 'সপ্তর্ষি' (১৯২৩), শিশিরকুমার মিত্রের 'লোভের উৎপত্তি' (১৯২৩), 'বোকা আইভান' (১৯২৪) ইত্যাদি গল্প তাদের মধ্যে অন্যতম।[১]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে একাধিক লেখকেরা 'ভারতী' (১৮৭৭) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮), মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯), সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬), হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩) প্রমুখ। আজকের দিনে আমরা যাঁদের 'ভারতী গোষ্ঠীর লেখক' বলে থাকি। 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকেরা রবীন্দ্রানুরাগ ঐক্যসূত্রে একত্রিত হয়েছিলেন। এই সময় বাংলাদেশে রবীন্দ্র বিরোধিতাও প্রবল আকার ধারণ করেছিল। বিশেষভাবে মনে পড়বে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আনন্দ-বিদায়' (১৯১২) নাটকের অভিনয়ের কথা, রবীন্দ্রভক্তের দল এই নাটকাভিনয়ের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই স্টার কর্তৃপক্ষ তা বন্ধ করে দেন। রবীন্দ্রনাথ সময় পেলেই এই তরুণদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ডেকে পাঠাতেন, সেখানে তাঁদের নিজের লেখা পড়ে শোনাতেন এবং সাহিত্য বিষয়ক নানা উপদেশ-নির্দেশ দিতেন।[২] রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই এই সময়ের কিছু তরুণ লেখকেরা বিদেশি উপন্যাসের বাংলায় ভাষান্তর করা শুরু করেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মনীন্দ্রলাল বসু, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়– এঁরা সকলেই বিদেশি গল্প ও উপন্যাস অবলম্বনে বাংলা সাহিত্য রচনা করেন।

ভারতী গোষ্ঠীর পূর্বে বিদেশি কথাশিল্পের সঙ্গে বাংলা কথাসাহিত্যিকদের এমন ব্যাপক সংযোগ ছিল না। এই সংযোগ ঘটেছিল দু'ভাবে- বহু গল্প-উপন্যাসের সরাসরি অনুবাদের মাধ্যমে এবং বিদেশি গল্প-উপন্যাসের অনুসরণ বা অনুকরণ করে বাংলা সাহিত্য রচনার মাধ্যমে। তাঁরা মনে করেছিলেন অনুবাদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যে তার পরিধি অতিক্রম করে সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ হবে। গল্প-উপন্যাসের সরাসরি অনুবাদ হয়েছে মণিলালের 'জলছবি' (১৯১৯), 'ভাগ্যচক্র' (১৯১১) সৌরীন্দ্রমোহনের 'অবন্ধনা', 'নতুন আলো', 'নবাব', 'মাতৃঋণ', 'অসাধারণ', 'পরদেশী'। তবে বিদেশি উপন্যাসের ভাষান্তরে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'আগুনের ফুলকি', 'রবিনসন ক্রুশো' ইত্যাদি। বিদেশি গল্প-উপন্যাসের অনুসরণ বা অনুকরণে বাংলা উপন্যাস রচনাতেও চারুচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'জোড় বিজোড়' (১৯২৪, নুট হামসুনের

‘ভিক্টোরিয়া’ অবলম্বনে), ‘অদর্শনা’ (১৯২৫, বালজাকের ‘Lamour Masque’ অনুসরণে), ‘যমুনা পুলিনের ভিখারিণী’ (১৩৩০), ‘চোরকাটা’ (১৩২৬) ইত্যাদি।

আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে রবীন্দ্র সমসাময়িক এই সমস্ত একাধিক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণীন্দ্রলাল বসু, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য কিছু অনূদিত কথাসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করব। এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখাতে চেষ্টা করব, এই সমস্ত অনূদিত গল্প ও উপন্যাসে ইউরোপ ঠিক কিভাবে এসেছে এবং বাংলার মৌলিক কথাসাহিত্য থেকে এগুলি কোথায় স্বতন্ত্র।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫):

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৮৬৭ সালে দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ফরাসি শিক্ষা শুরু করেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা অনুমান করতে পারি, তাঁর অনুবাদ মূলক গল্পগুলির রচনা শুরু হয়েছিল ১৮৮৪ সালের পর থেকেই। তাঁর ফরাসি গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল ‘অবতার’, ‘নাসপাতির গান’, ‘পাদ্রির কঙ্কাল’, ‘সম্রাটের প্রতিশোধ’, ‘বাচিবার তৃষা’, ‘অনুতাপিনী সন্ন্যাসী’, ‘একবাটি দুধের জন্য’ প্রভৃতি। প্রত্যেকটি গল্পের ভূমিকায় বা শুরুতে তিনি ফরাসি গল্পকার ও গল্পের মূল গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন— ‘অবতার’ গল্পের ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন— ‘এই গল্পের লেখক Theophile Gautier (১৮১১-৭২) একজন কবি এবং ঊনবিংশতি শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্সে যে সকল গদ্য-লেখক আর্বিভূত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইনিই সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। ... তাঁহার গদ্য গ্রন্থ Mademoiseelle de Maupin আমাদের দেশেও অনেকে পড়িয়াছেন, কেন না, ইহার ইংরেজি তর্জ্জমা আছে। তাঁহার লিখিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট গল্প-রচনা আছে, তন্মধ্যে Avatar (অবতার) একটি। ইংরাজী বোধ হয় ইহার অনুবাদ হয় নাই।’[৩]

চন্দ্রালোক: এই গল্পটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ফরাসি গল্পকার মোপাসাঁর গল্প থেকে অনুবাদ করেছেন। গল্পটি দুই তরুণ তরুণীর ভালোবাসার কাহিনি। তাদের ভালোবাসায় গীর্জার সন্ন্যাসী প্রথমে তাদের বাধা দিলেও পরে একদিন সন্ন্যাসী বুঝতে পারে তাদের ভালোবাসা আসলে ঈশ্বরের দান। এরপর তাদের অনুসরণ করে চলে জ্যোৎস্নার আলোতে। দূরে থেকে তিনি প্রেমিক-প্রেমিকা আলিঙ্গনোদ্যত দেখতে পেয়ে লজ্জায় ও বিস্ময়ে পালিয়ে যান। তাঁর মনে হল তিনি যেন এক মন্দিরে অনধিকার প্রবেশ করেছেন।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮)

রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে সেদিন স্বল্পসংখ্যক তরুণ লেখক বাংলা সাহিত্যেকে নতুন ধারায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন, চারুচন্দ্র ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে মালদহ জেলার চাঁচল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা মুক্তকেশী দেবী। কারণ তাঁর বাল্যকাল কেটেছে চাঁচর এবং জিরাট-বলাগড়ে। চারুচন্দ্র বলাগড় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন।[৪] স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তাঁর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মায়— 'আমি যখন সাবেক হিসাবে স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমার বয়স বড় জোর বার বৎসর হবে। আমি সেই বয়সে আর সেই বিদ্যা নিয়ে তখনকার সকল বড় সাহিত্যিকের বই পড়ে শেষ করেছিলাম। বঙ্কিমবাবুর সকল উপন্যাস, মাইকেল, হেম, নবীন প্রভৃতির কাব্য, দীনবন্ধু, গিরিস ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির নাটক আমি পেটুক ছেলের মতো গিলেছিলাম।'[৫]

চারুচন্দ্র সংস্কৃত, ঊর্দু, ফার্সী এবং জার্মান ও ফরাসি ভাষা বেশ ভালোমতো জানতেন। ঊর্দু ও ফার্সী ভাষা তিনি শিখেছিলেন তাঁর পিতা গোপালচন্দ্রের কাছে। চারুচন্দ্র যখন যে-ভাষা বিশেষভাবে চর্চা করেছেন, তখনকার গল্প উপন্যাসে সে ভাষার প্রভাব পড়েছে। "পুষ্পপাত্র" গল্পসংকলনের (১৩১৭) ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'যে সময় যে ভাষার চর্চা করিতেছিলাম সে সময়কার রচনায় সেই নূতন শিক্ষিত ভাষার নেশার ঝোঁক আমার অজ্ঞাতসারেই প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহারও একটা উপভোগের দিক আছে বলিয়া পুরাতন লেখা যেমন ছিল তেমনই

প্রকাশ করিলাম।' আবার "সওগাত" গ্রন্থের (১৩১৮) ভূমিকায় চারুচন্দ্র জানিয়েছেন, 'তিন-চারটি গল্পের প্লট বিদেশী গল্পের ভাব আশ্রয় করিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদেরও কেন্দ্রগতভাবটি আমারই নিজস্ব, বিদেশী গল্পগুলি আমার কল্পনার অঙ্কুরকে পল্লবিত করিয়াছে মাত্র।' চারুচন্দ্রের "ধূপছায়া" গ্রন্থে (১৩১৯) মোপাসাঁ, স্ট্রিণ্ডবার্গ, দোদে, জুল লেমেৎর প্রভৃতি লেখকের গল্পের ভাবানুবাদ স্থান পেয়েছে। চারুচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'আগুনের ফুলকি' (১৩২১) জার্মান লেখক হাউফের গল্পের অনুবাদ। এছাড়াও বিদেশি উপন্যাসের ভাব-বস্তু অবলম্বনে তিনি লিখেছেন— 'যমুনাপুলিনের পুলিনের ভিখারিণী' (১৩৩০), 'চোরকাটা' (১৩২৬), 'জোড়বিজোড়' (১৯২৪), 'অদর্শনা' (১৯২৫) ইত্যাদি।[৬]

চারুচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ার ব্যবস্থা হলে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চারুচন্দ্রকে অন্যতম অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার জন্য আহবান জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ায় তখন বাংলা ভাষার অধ্যাপকদের বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে হত। শুধুমাত্র মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ও বিদ্যোৎসাহের জন্য চারুচন্দ্র 'প্রবাসী' পত্রিকার সহ-সম্পাদনার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার এই দুই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন।

নীলকুঠি:

'ধূপছায়া' গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত গল্পটি। গল্পের প্রেক্ষাপট ফ্রান্স। গল্পকথকের কাকা জাঁ তাঁর জীবনের কাহিনি যা বলেছিলেন, তাই কথক আমাদেরকে শুনিয়েছেন। সেদিক থেকে গল্পটি একটি গল্পের গল্প বটে। গল্পে কথক তার কাকা টাকার উপার্জনের জন্য ফ্রান্সের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতেন। আর এই ঘুরে বেরাতেই একবার উপস্থিত হন ব্লেজিবা নামক ছোট এক স্টেশনে। তার পাশেই দেখতে পান অদ্ভুত ধরনের একটি ছোট বাড়ি। 'সেই বাড়ীখানির রং ফিকে নীল; ...।'[৭] যে বাড়িকে প্রথমবার দেখার চল্লিশবছর পরেও স্মৃতিতে সমান তরতাজা। এবং জাঁ-এর তখন সেই কুঠিরের কাছে মনে হয়েছিল "এমন জায়গায় যারা বাস করে তারা

নিশ্চয় খুব সুখী! ... না আছে তাদের চিন্তা, না আছে তাদের বিরক্তির কোনো কারণ।"[৮] সেই নীলকুঠির সামনে ছোট বাগানে একটি দশ বছরের বালিকা লাটিম ঘুরিয়ে খেলা করছিল। তার 'ফুটফুটে গোলাপী তার রং, পোষাকটি তার বসন্তের সজ্জার মতো, আর তার রেশমী চুলগুলি একটি নীল রেশমী ফিতার ফাঁশে বাঁধা, সর্ব্বাঙ্গে তার উচ্ছল আনন্দের ঢেউ,- আনন্দেরই প্রতিমা সে! ...'[৯] সেদিনই একটু পরেই বালিকাটির নাম জানতে পারে— 'লোরিন্'! এরপর দশবছর ধরে ফ্রান্সের উত্তর থেকে পূর্ব, কখনও লীল কখনও বা ন্যান্সি অন্নচিন্তায় ছুটোছুটি করতে গিয়ে সেই লোরিনের চিন্তার অবসর পায়নি। কিন্তু মার্সেই থেকে কাজ সেরে ফেরার পথে লোরিনার স্মৃতি জেগে ওঠে— সেই নীলকুঠি, সেই বাগান যেখানে একটি তরুণী বয়সে ছিল আজ তার জায়গায় সুন্দরী গৌরী। এক তরুণ বসে সমস্ত প্রাণ দিয়ে লোরিনকে দেখছিল, লোরিনকে তুষ্টির জন্য আপনাকে পলকে পলকে নিবেদন করছিল।

এর অনেক বছর পরে সেই ছোট ব্লেজি স্টেশনে উপর দিয়ে যাতায়ত করার সময় ট্রেন সেখানে দাঁড়ালে লোরিনকে দেখার জন্য কথকের আবারও হৃদয়ের টান অনুভূত হয়। তাকে দেখে একটি ছেলের ডাকাডাকিতে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে একজন মহিলা। ইউরোপীয় সংস্কৃতির রীতি অনুযায়ী, মহিলাকে দেখার পরেই কথক আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে টুপি তুলে তাকে অভিবাদন করে।

কথকের ব্যাবসা উপলক্ষ্য কালাপানিতে জাহাজ-ডুবি হয়েছিল। তখন সেই দুরবস্থার মধ্যেও তার নীলকুঠির কথা মনে পড়েছিল। তখন তার উপলব্ধি হয়, অল্পে সন্তুষ্টি নিয়ে লোরিনের মতো শান্তিতে থাকার বাসনা। অবসন্ন মৃতপ্রায় অবস্থায় এক ওলন্দাজ তাকে জাহাজ থেকে তার দু-দিন পরে জল থেকে তুলে নিয়েছিল। তার পনর-কুড়ি দিন পর ফ্রান্সে ফিরে সে আবারও ব্লেজি-বা স্টেশনে পৌঁছায়। লোরিনকে একবার দেখার জন্য গাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়তে চায়। তখনও কথকের মনে হয় সেই নীলকুঠি তেমনই দাঁড়িয়ে আছে, তেমনই শান্ত আছে। কিন্তু এবার কথক দেখলেন এক বর্ষীয়সী রমণীকে সেই বাগানে— যাকে দেখে কথকের প্রথম লোরিনের পরিণত বয়সের কথা মনে হয়েছে। তাই সেই রমণীকে অতীতের কিছু স্মৃতি কথা বলে বুঝতে পারে তিনি লোরিন নয়। কিন্তু লোরিন যে অতীতে এখানে

থাকতেন তা তিনি জানান প্রসঙ্গক্রমে। স্টেশনের সংলগ্ন এক অতি বৃদ্ধা গিন্নির কথা শুনে জানায়, 'সে যে মাদমোয়াজেল স্তেফানি, কন্ট্রাক্টর সাহেবের মেয়ে, সেই তো লম্বা মতন, চুলে ফিতে বাঁধা... এ সে বৈ আর কেউ নয়! দিজোঁশহরের এক সওদাগরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, আহা বেচারা! তাদের বিয়ে সুখের হয়নি, তারা আলাদা হয়ে আছে।'[১০] পরে ছোট মেয়ের কথা বলতে লোরিন সম্পর্কে জানায়, মেয়েটি ডাক্তার সাহেবের মেয়ে, দশ বছর বয়সেই মারা গেছে। তখন কথক ভাবতে থাকে, 'দশ বৎসর বয়সে, আমি তাকে দেখার কয়েক দিন পরেই, সে মারা গেছে! আর আমি? আমি তার পর এই চল্লিশ বৎসর ধরে তাকে অনুসরণ করে আসছি!...'[১১]

ভূতের ঘটকালী:

'সওগাত' গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত গল্পটি। এই গল্পে সতীশ নলিনীকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চাইলে নলিনীর পিতা রমানাথবাবু সতীশকে তাদের বাড়িতে আসতে ও চিঠি লিখতে নিষেধ করেন। কারণ সে বলে, "আমি তোমার মতো একজন গরীবের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো কি না সে খবরটা নিয়েছিলে কি? আমার মেয়ের বিয়ে দেবো একটা গরীবের সঙ্গে! ভালো তোমার আক্কেল! এখন শুন্‌লে ত যা শোনবার— এখন যাও।"[১২] সতীশ এই অপমানের যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য এবং নিজের প্রেমিকাকে আপন করে নিজের কাছে পেতে সে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করতে থাকে। সে মনে মনে ভাবতে থাকে 'এমন করিয়া তাড়াইয়া দিল! ছি! ধিক জীবনে! এত অপমানের কারণ কি– না, আমি দরিদ্র! যেমন করিয়া পারি অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে।'[১৩] আর এরই উপায় স্বরূপ সতীশ বিলাতযাত্রা করে জাহাজের খালাসি হয়ে। কারণ বিলেত যাওয়ার মতো তার কাছে অর্থ ছিল না। তাই খালাসির কাজ। এর আড়াই বছর পরে সকালে খবরের কাগজে জানতে পারা যায় যে, সতীশ মজুমদার নামে একটি যুবক হাইড্রোসায়ানিক এসিড পান করে ইডেন গার্ডেনে এক কোণে আত্মহত্যা করেছে। এই খবর শোনার পর নলিনী বার বার মূর্ছা যেতে থাকে এবং নিজে নিজে ভাবতে থাকে এটাই কি সতীশের বিলেত যাত্রা! আর ঐ দিনেই বিকেল বেলায় সতীশবাবুর এক বন্ধুর স্ত্রী সতীশের

দেওয়া একটি উপহারের খবর দেয়। এতে নলিনী আবারও উৎফুল্লত হয়, যেন আকাশে চাঁদ সে হাতে পেল উপহার হিসেবে। সতীশ যে মৃত্যুকালেও তাকে ভুলে নি এটা ভেবেই আত্মহারা। তাই তার এই স্মৃতিকে সারাজীবন অক্ষত রাখার সংকল্প করে। সতীশের এই উপহারটি ছিল একটি সুন্দর মার্বেল পাথরের ঘড়ি, বেশি বড় নয় টেবিলের উপর বসানো যায়। ঘড়িটিকে নলিনী হৃদয়ের সমস্ত প্রণয় দিয়ে বরণ করে শয্যার কাছে টেবিলের উপর রেখে দিয়েছিল। আর প্রতিদিন নিজের হাতে ফুল দিয়ে সেটিকে সাজায়, সময় পেলে ঘড়িটির পাশে গিয়ে বসে এবং সেটির দিকে চেয়ে থাকে। একদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙলে নলিনীর মনে হতে লাগল যেন সতীশ তাকে ডাকছে জাগানোর জন্য —

"শুন নলিনী খোল গো আঁখি
এখনো ঘুম ভাঙিল না কি?"[১৪]

নলিনীর প্রথমে এই ঘটনাকে স্বপ্ন বলে মনে করলেও আসলে তা যে স্বপ্ন নয়, তা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারে। সতীশ স্পষ্ট কণ্ঠে বলে—

"তুমি আমারি যে তুমি আমারি
মম বিজন-জীবন-বিহারী?"[১৫]

এরপর নলিনী নিত্য রাত্রে সতীশের কণ্ঠস্বর, বাণী শুনতে পেত। ফলে নেশার মতো নলিনীকে ঘড়িটি পেয়ে বসল। ঘড়িতে রাত বারোটা বাজার পর পরেই মিনিট দশেকের জন্য সতীশের ছায়া করুণ কণ্ঠে প্রণয় নিবেদন করে, তারপর বিদায় নেয়। এই ঘটনা নলিনী বোন কমলকে বললে তা পরীক্ষা করতে গিয়ে সেও একই ছবি প্রত্যক্ষ করে অবাক হয়ে যায়। এরপর নলিনীর পিতাও সেই ঘরে রাত্রিযাপন করে একই বিষয় প্রত্যক্ষ করে এবং হতভম্ব হয়ে যায়। একসময় এই ভূতের উপদ্রব রমানাথের অসহ্য হয়ে ওঠে। নিত্য রোজা, গুনিন ও খবরের কাগজের রিপোর্টার, কৌতুকদর্শীর বাড়িতে অনাবরত আনাগোনা এবং এই ভূত সারাতে একেক জন একেক রকমের উপদেশ দিতে থাকে— কেউ বলে সিন্নি দিতে, কেউ বলে গয়ায় পিণ্ডি দিতে আবার কেউ বলে বাড়িটাই বেঁচে দাও ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে একসময় রমানাথের

মনে হল ‘এসব উৎপাতের চেয়ে সতীশের জামাই হওয়া যে ঢের ভালো ছিল। ...’ আর এমন সময়ই সতীশের আবির্ভাব ঘটল নলিনীদের বাড়িতে। কমল জিজ্ঞেস করে –

“আপনি তা হ’লে বেঁ’চে আছেন? ... যাক, তা হলে বাঁচা গেল। আপনি তা হলে যমের বাড়ীর ফেরত নন।”

“না আপাততঃ বিলেতফেরত সিভিলিয়ান।” [১৬]

সতীশ এবার সেই ভুতুড়ে ঘড়ির কথা বলতে থাকে কমলকে, “তোমার জ্যাঠামশাই আমাকে চিঠি লিখতে পর্য্যন্ত বারণ করেছিলেন। তাই বিলেতে গিয়ে অনেক খরচ করে ঐ ঘড়ীটি তৈরি করাই। ঠিক বারোটা রাত্রে ঘড়ীর ডালার পেছনে একটা বিদ্যুতের আলো জ্বলে ওঠে আর ওর সঙ্গে ফনোগ্রাফ বেজে ওঠে। ঘড়ীর ডালায় হাল্কা রঙে আমার মুখ আঁকা আর ফনোগ্রাফে আমার কণ্ঠ ধরা। নলিনীকে সান্ত্বনা দেবার এই একটা ফন্দি অনেক ভেবে বের করেছিলুম। এ দেখছি হিত করতে বিপরীত হয়ে গেছে, আমি মরে গেছি মনে করে নলিনী বিয়ে করেনি ত?”[১৭] পাশের ঘর থেকে নলিনী এসে সতীশের হাত ধরল এবং সতীশের মুখের উপর সতৃষ্ণভাবে সঠিকভাবে রাখিয়া আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলে, “চল বাবাকে প্রণাম করে আসি।”[১৮]

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬):

সৌরীন্দ্রমোহনের অনেক গল্পের প্লটই বিদেশি মূল থেকে অল্পবিস্তর নেওয়া। তাঁর অজস্র গল্প সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'শেফালি' (১৯০৯), 'নির্ঝর' (১৯১১), 'পুষ্পক' (১৯১৩), 'মৃণাল' (১৯২২), 'যৌবরাজ্য' (১৯২২) ও 'পিয়াসী' (১৯২২) ইত্যাদি। 'পরদেশী' (১৯১০) গল্প গ্রন্থটি বিভিন্ন বিদেশি গল্পের অনুবাদ গ্রন্থ। এছাড়াও সৌরীন্দ্রমোহন অনেক উপন্যাস লিখেছেন, যেগুলির অধিকাংশই অনুবাদ। যেমন—'বন্দী' (১৯১১; উগো), 'মাতৃঋণ' (১৩২২; দেদো), 'নবাব' (ঐ), 'অবন্ধনা' ও 'নতুন আলো' (গোর্কি), 'জনৈকা' (মোপাসাঁ) ইত্যাদি।[১৯]

'ভারতী' (১৮৭৭) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বেশ কিছু বিদেশি গল্পের অনুবাদ করেছেন এবং কিছু বিদেশি সাহিত্য ভাবালম্বনে গল্প রচনা করেছিলেন। "পরদেশী" নামক গল্প সংকলনের 'পূর্বকথা'য় তিনি নিজেই বলেছেন, "গল্পগুলি হুবহু অনুবাদ নহে। স্থল বিশেষ ছায়ামাত্র গ্রহণ করিয়াছি, কোথাও মূল উপাখ্যানের যথেষ্ট পরিবর্তন বা পরিবর্জন করিতে হইয়াছে, আবার কোন গল্প-বা বহু পূর্বে পাঠ করিয়াছিলাম, এখন তাহার ক্ষীণ স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া রং ফলাইয়াছি। মোটের উপর সকলগুলিই আপনার ভাবে গড়িয়াছি। তথাপি সেগুলির বৈদেশিকত্ব একেবারে লোপ করি নাই।"[২০] তাঁর প্রায় সব গল্পেই নকশা জাতীয় রচনা, প্রতিবেদনমূলক আর সেই প্রতিবেদনে আছে সমকালীন জীবনের একটা পল্লবগ্রাহী সাধারণ বাস্তব চিত্র।

মাতৃঋণ (১৩২২):

এই উপন্যাসটি সম্পর্কে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় পূর্বকথায় বলেছেন, ১৩১৮ ও ১৩১৯ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশ হয়। তাতে তিনি আরও বলেছেন, "মাতৃঋণ" প্রসিদ্ধ ফরাসি ঔপন্যাসিক 'দেদো'র রচিত 'জ্যাক' নামক উকৃষ্ট উপন্যাসের মর্ম্মানুবাদ। আর অনুবাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: 'বর্ত্তমান গ্রন্থে দেদোর প্রধান ভাবটিকে ও প্রয়োজনীয় চরিত্রগুলিকে মাত্র বজায় রাখিয়া নিজের ভাবেই আগাগোড়া লিখিয়া গিয়াছি। এদেশের পাঠক সম্প্রদায় কতখানি গ্রহণ করিবেন এবং কোন অংশ তাঁহাদের নিকট বিরক্তিকর ঠেকিবে,

লিখিবার সময় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি। সেজন্য দেদোর রচনার অংশবিশেষ কোথাও একেবারে পরিবর্জ্জন করিয়াছি; কোথাও বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে লিখিয়াছি।'[২১]

আগেই আমরা লেখকের কথা অনুযায়ী জেনেছি মূল উপন্যাসটি ফরাসি। তাই এই উপন্যাসটির প্রায় সকল চরিত্রও ফরাসি। উপন্যাসের শুরুতেই দেখি জাককে তার মাতা একটি বোডিং স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে আসেন। সেখানে স্কুল অধ্যক্ষ ছাত্রের নাম, পদবী ও পিতৃপরিচয় জানতে চাইলে তাতে উপযুক্ত তথ্য দিতে না পারায় জাক-এর মা জাককে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। পরবর্তীকালে আমরা জানতে পারি সেই জাকের মায়ের বিয়ে হয়েছিল তুরানে। তাঁর স্বামী কাউন্ট দ্যা বারাঙ্গি তুরেনের এক বড় বংশের সন্তান, তিনি জমিদার ছিলেন।

জাকের জন্য আবার নতুন আর একটি বোর্ডিং স্কুল দেখা হয়, স্কুলের নাম 'মোরোন্‌ভা জিমনাজ।' স্কুলটি গলির মধ্যে; বাড়িটি যেমন জীর্ণ, অধিবাসীদের জীবনও তেমনই। সেই স্কুলেই জাককে ভর্তি করে দেন। সেখানের সঙ্গীত শিক্ষক লাবাস্যন্দ্র, বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার হারজ্, আর ফ্রান্সের বিখ্যাত কবি আর্জান্তঁ বর্তমানে তিনি শিক্ষা ব্রত গ্রহণ করেছেন তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক। আর সহপাঠি হিসেবে জাক পায় দাহমির রাজপুত্র মাদুকে। ছাত্রাবাসে জাকের প্রথম রাত্রে চোখে ঘুম আসে না, কেবলি তার মায়ের কথা মনে হতে থাকে। ক্রমে রাজপুত্র মাদুর সঙ্গে পরিচয় হলে বিস্ময়ে তার মন ভরে যায়। 'যাহাকে সে সারাদিন নানা ফরমাস খাটিতে দেখিয়াছে, ঝাঁটা লইয়া চারিধারে যে পরিস্কার করিয়াছে, টেবিলে খাবার পরিবেষণ করিয়াছে, প্লেট, গ্লাস, সব সাফ করিয়াছে, সেই ভৃত্য— এই কালো কাফ্রী বালক— দহামির রাজপুত্র।'[২২] সেই রাজপুত্র জাককে দাহমির গল্প শোনায়— সেখানে সে কি সুখে ও কি আনন্দে থাকতেন; সেখান থেকে তাকে একদিন ফ্রান্সের এই স্কুল গহ্বরের মধ্যে বনফিল নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের সমস্ত স্বাধীনতা ও আনন্দ যেন উধাও হয়ে গেল। সকলই আশা করতে থাকে মাদু রাজা হয়ে সব দুঃখ নিমেষেই ঘোচাবে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সংবাদ আসে আশান্তিরা দাহমি অধিকার করেছে এবং মাদুর পিতা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, পিশি ক্যারিকা নিরুদ্দিষ্ট। এর এক-দুই বছর কেটে গেলে মাদুর নামে কোন কেউ অর্থ না

পাঠানোর তাকে এখন স্কুলের ভৃত্যের কাজ নিযুক্ত করেছে। শেষে একদিন মাদু সকালের বাজার করতে গিয়ে স্কুল ছেড়ে চম্পট দেয়, কিন্তু সে চট করে ধরা পরে যায় পুলিশের কাছে। পুলিশের লোক স্কুলে দিয়ে যাওয়ার পর মোরোন্‌ভায় মাদুর পিঠের উপর চলতে থাকে তীব্র কষাঘাত তাতে মাদু মূচ্ছিত হয়ে পড়ে। পরের দিন মাদুর অবস্থা খারাপ হয় ও ভুল বলতে থাকে এবং শেষ রাত্রে মাদুর সকল দুখের অবসান হয়। রাজপুত্রের শবদেহ নিয়ে সারা শহর জুড়ে শোকযাত্রার আয়জন করে এবং সন্ধার সময় সকলে জিমনাজে ফেরে। জাক বন্ধু মাদুর এহেন অবস্থা দেখে শোকযাত্রায় ইচ্ছা করে হারিয়ে গিয়ে পুলিশের ভয়ে ভয়ে সারা দিন রাত হেটে মায়ের বর্তমানে এতিয়েলের বাড়িতে পৌঁছায়। 'একটা সুগভীর আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া মার বুকে মাথা রাখিয়া জাক ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল।'[২৩] এই সময় আর্জান্ত বাড়িতে না থাকায় বিগত সাত দিন জাকের যে সুখে কেটেছে, আর কোনদিন এমনভাবে কাটবে কিনা সে জানে না। 'গৃহে মাতার সঙ্গ, বাহিরে বন, বাগান নদী— ঘরে বাহিরে যত ইচ্ছা, ঘুরিয়া বেড়াও! সর্ব্বত্র সমান অধিকার! বাহিরে মুক্ত আনন্দে ছুটিয়া বেড়ানো, গৃহে মার প্রচুর স্নেহ!'[২৪]

একদিন আর্জান্ত ও ইদা অবসর যাপনের জন্য বেড়াতে গেলে জাক আর্শার কাছে গল্প শোনার জন্য যায়। পরে ঝর বৃষ্টি শুরু হলে তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে একজন টুপিওয়ালাকে যেতে দেখে বাড়িতে নিয়ে এসে আদর যত্নে খাওয়ায়। এমন সময় আর্জান্ত ও ইদা ফিরে এসে এসব দেখে তীব্র তিরস্কার করে জাককে। পরের দিন মায়ের সঙ্গে জাক গির্জা থেকে ফেরার সময় প্রতিবেশী ডাক্তার রিভালের পরিচয় হয়। এখানে আসা অবধি জাকের সম বয়সী বন্ধু না থাকায় নিঃসঙ্গে কাটাতে হয়। এবার ডাক্তারের নাতনী সেসিলকে সঙ্গী হিসেবে পেল। ডাক্তারের ইচ্ছায় তারা এখন দুজনে একটু-আধটু পড়তে শুরু করেছে। ডাক্তারের চিকিৎসার সময়ে মানুষের কাছে আদর-সম্মান দেখে জাকের রুদ্ধ মনের দ্বার খুলে যায়; পড়াশুনায় সে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সেও ভবিষ্যতে ডাক্তার হবার মনে মনে সংকল্প করে। কিন্তু আর্জান্ত লাবাস্যার পরামর্শ অনুযায়ী জাককে কারখানায় কারিকর বানাতে চায়। এতে ডাক্তারের তীব্র আপত্তি থাকলেও মা ইদার সায় থাকায় অনিচ্ছুক জাককে একদিন কারখানায় যেতেই হয়।

জাক ডাক্তার হবার বাসনায় রিভালের দেওয়া বই নিয়ে অ্যাঁদ্রের কারখানায় কাজ শিখতে যায়। সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয় বুদিকের বাড়িতে। কারখানায় 'এই সকল দেখিয়া জাক কেমন স্তম্ভিত হইয়া গেল। কি বিরাট ব্যাপার! অমানুষিক কাণ্ড! এ যেন গল্প-শ্রুত সেই কোন দৈত্য মহা-সমারোহে-নরমেধ-যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য লৌহ-কটাহ ও অন্যান্য যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে অসংখ্য কারিকর নিযুক্ত করিয়া দিয়াছে! ...'[২৫] ম্যানেজারের কথামত রুদিকের হাতে তার কাজ শেখার দায়িত্ব পড়ে। কারখানায় অমানুষিক দুঃখ কষ্টের মধ্যেও জাক তার মায়ের কথা মনে করে কারখানার কাজে কোন ত্রুটি করত না। কারণ 'সে কারিকর হইলে মার দুঃখ ঘুচিবে, মার আনন্দ হইবে। মার সুখের জন্য এ কষ্টটুকু সে আর সহ্য করিতে পারিবে না ? নিশ্চয়ই পারিবে! এ দুঃখ, এ কষ্ট, সে গ্রাহ্যও করিবে না! নিজের সুখের কথা,— সে আর ভাবিবে না।... মার মুখ, মার হাসি, মার স্নেহ!'[২৬] এরপরে সপ্তাহে একদিন রবিবার ছুটি পেলে ডাক্তার রিভালের দেওয়া বই খুলে এক নতুন জগতের সন্ধান পেত। সেই টুপিবিক্রেতা বেলিসেয়ার সঙ্গে জাকের দেখা হয় এখানে, তাতে বেলিসেয়ার প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিল।

রুদিকের মেয়ে জেনেদ ও মাঁজ্যার বিয়ের উপহার এবং জাকের নতুন পোশাক কেনার জন্য মা ইদা তাকে ষাট টাকা পাঠান। জাক উপহার কিনতে বেরিয়ে দুর্ভাগ্যবশত নেশাখোরের পাল্লায় পড়ে নিজের জীবনের চরম অনিষ্ট ডেকে আনে। প্রথমে নেশাখোর নান্তর সঙ্গে বাধ্য হয়ে মদ খেলে সেদিন আর কারখানায় পৌঁছাতে পারে না। পরে কারখানার অন্যান্য কারিকর ও কুলিদের জোরাজুরিতে আবারও মদ খেয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বেলিয়াসেয়ার জাককে নিয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মের নিয়ে যায়, সেখানে ঘুমভাঙতে পুলিশ তাদের জানায় রুদিকের মেয়ে জেনেদের সাড়ে তিনহাজার টাকা চুরির অপবাদে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সারা শহর রাষ্ট্র হয়ে যায় জাক চোর। যদিও পরে চুরির অভিযোগে জাকের উপর চলা নিষ্ঠুর অত্যাচারে ব্যথিত হয়ে রুদিকের স্ত্রী ক্লারিস টাকা চুরি হয়ে যাওয়ার আসল রহস্য প্রকাশ করে দেয়। জানায় ক্লারিস নিজে তার প্রেমিক, রুদিকের ভাই নান্তকে এই টাকা দিয়েছে। পরে কারখানার ম্যানেজার সাহেব জাককে মুক্তি দিয়ে তাকে আনন্দদানের ব্যবস্থা করে।

এই ঘটনার দুই বছর কেটে যায়, জাক নিজের দুর্বল বাহুদুটিকে কারখানার কাজে উপযুক্ত করার এখনো প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এখন তার দৈনিক আয় আধ ক্রাউনের বেশি নয়। কাজের চাপে ও শীত-বৃষ্টিতে একসময় অসুস্থ হয়ে পরে। ময়ের চিঠি আসে "জাক, আপনার দিন কিনিয়া নাও, মানুষ হও, রোজগেরে-ক্ষম হও। যেদিন তুমি আমার ভার লইতে পারিবে, সেই দিন আমি সুখী হইব— সেই দিন আমার সকল দুঃখ ঘুচিবে।"[২৭] পরে একটু বেশি উপার্জনের আশায় সে এবার কাজ নেয় জাহাজে। বেতন মাসিক সাড়ে সাত পাউন্ড। একাজে 'জাক পূর্ব্বে কখনও সমুদ্র দেখে নাই। জল, জল! চারিধারে যতদুর দৃষ্টি চলে, কেবলই জল! অনন্ত অসীম পারাধার। তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিয়া চলিয়াছে— যেন বিপুল হর্ষ ঠিকরিয়া উঠিতেছে। ভ্রমণের নেশা জাককে বিভোর উন্মাদ করিয়া তুলিল।'[২৮] কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জাহাজডুবির ঘটনায় জাক মারাত্মকভাবে আহত হয় ও দু-মাস হাসপাতালে থেকে দুর্বল শরীর নিয়ে আবার ইদার কাছে ফিরেছে। এবার সে মায়ের কাছে তার বাবার কথা প্রথম জানতে পারে।

জাক শরীরকে সুস্থ করতে মায়ের এতিয়েলের শান্ত-নির্জন বাড়িটিতে আসে। সেখানে এসে দেখে ডাক্তারের নাতনী সেসিল এখন 'যৌবন-স্পর্শে সেসিলের সুগঠিত তনুখানি লাবণ্যে ভরিয়া রহিয়াছে— পুষ্প-তরু যেন আজ কুসুম-স্তবকে সাজিয়া উঠিয়াছে! অমল তাহার শোভা, বিচিত্র তাহার বর্ণ! ... কোথাও এতটুকু খুঁত নাই! সজ্জিত সুন্দর বেশে, তাহারই অনুরূপ ভাস্বর মূর্ত্তি! অপূর্ব্ব মধুরিমার চরম বিকাশ!'[২৯] ডাক্তার জাককে তাঁদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া ও যাওয়া-আসার কথা বলে। জাক বুঝতে পারে ডাক্তার রিভাল তাঁর নাতনীকে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা। সেই প্রসঙ্গে ডাক্তার তাঁর মৃত মেয়ে ও সেসিলের মা 'মাদলীন'-এর সকল কথা জানায়। মাদলীনের বিয়ে হয়েছিল নাদিনের সঙ্গে, যে আসলে সে দক্ষিণ রুশবাসী একজন ইহুদী— নাম র‍্যক্স্। একটা হতভাগা জালিয়াত; জালজুয়াচুরি করে জীবিকার সংস্থান করেছিল। পূর্বে বিভিন্ন স্থানে একাধিক বিবাহ করেছিল, তারা সকলে এখনো জীবিত। মাদলীন তাকে ছেড়ে দিয়ে মাসখানেকের মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসে। সেই মিথ্যা বিবাহের সন্তান সেসিল। এই কাহিনি শুনে জাক অভিভূত হয় ও চার বছর পরে বিবাহ করবে প্রতীক্ষা করতে সম্মত হয়। এখন মাঝে

মধ্যে তারা বেড়াতে যায়। বেড়াতে গিয়ে— 'জাকের দুই হাতের মধ্যে সেসিলের হাত—উভয়ের হাতই কাঁপিতেছিল। কি এক আনন্দের মূর্চ্ছনায় উভয়েরই প্রাণ দুর-দুর করিয়া উঠিল। এ কি মোহ। প্রাণের ভিতর এ কি দারুণ উত্তেজনা। ...'[৩০] সেসিল ও রিভালের দেখাভালে জাক তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে ও মনের শক্তি দ্বিগুণ বাড়িয়ে নতুন কারখানায় কারিকরের কাজে যোগ দিতে যায়। সেসিলকে বলে— "যে আমি তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি, সেসিল। তোমাকে যাতে জয় করতে পারি, যাতে তোমার যোগ্য হতে পারি, তার জন্যই আজ আমি কঠোর সাধনায় রত হতে চলেছি!"[৩১] সেসিল জানায়—"জাক, আমি এ চার বৎসর তোমার প্রতীক্ষায় বসে থাকব। চার বৎসর কেন, জাক? যদি চিরকাল, সারা জীবন আমার এমনই প্রতীক্ষা করে কাটাতে হয়, তাও কাটাব। জাক, প্রিয়তম আমার ... এ তুমি নিশ্চয় জেনো!"[৩২]

নতুন কারখানায় কাজ করার জন্য পুরাতন টুপিওয়ালা বন্ধু বেলিসেয়ারের বাসায় যৌথভাবে থাকতে শুরু করে। প্রথমবার কারখানায় কাজে যেতে মনে বেদনা থাকলেও এবারে তার আর এতটুকু বেদনা ও ক্ষোভ ছিল না। প্রতি রবিবার জাক সুশ্রী সুরূপ রাজপুত্র— পরীর দেশ এতিয়েলে গিয়ে সেসিলের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। এইসময় মা ইদা আর্জান্তর কাছে অত্যাচারিত হয়ে জাকের ভাড়া বাড়িতে থাকতে আসেন, যদিও কিছুদিন পরে আবারও সেই কবি আর্জান্তর কাছে তিনি ফিরে যান। জাক বুঝতে পারে তার মায়ের কাব্যিক দুর্বলতা, আর্জান্তর প্রতি দুর্বলতা। তাকে মা ছেড়ে যাওয়ার মাতৃহীনের শূন্যতা তাকে আবার যেন গ্রাস করে। প্রতীক্ষার চার বছরের তিন বছর আজ অতিক্রান্ত, আর একবছরে সে ডাক্তারি পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তারি উপাধি লাভ করতে পারবে; জাক ডাক্তার হয়ে সমাজের সম্ভ্রান্ত স্থানে জায়গা করে নেবে— এ ছিল তার বড় সাধ। সে বলতে থাকে— "... আমি আপনার কাছে যাইতে চাই— আমায় সান্ত্বনা দিন, নহিলে আমি পাগল হইয়া যাইব! আমার এত সাধ, এত কল্পনা, এত আশা, সব ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল—ধূলায় লুটাইল!" [৩৩]

এরপর জাকের মা ইদা এসে আক্ষেপ করতে থাকলে ডাক্তার তীব্রস্বরে বলে, "সর্ব্বনাশ নয়, কড়ায়-গণ্ডায় তোমার পাওনা চুকিয়ে দিয়ে সে আজ ছুটি নিয়েছে, তার সব যাতনার শেষ হয়ে গেছে।"[৪৩] একসময় জাকের মা ইদা প্রায়ই দেখতে আসত, তখন জাকের ভাগ্যেও প্রচুর

আদর-সোহাগ জুটিয়াছিল। জাককে দেখতে এই স্কুলে আসতে আসতে ইদার মনে ধরে জাকের সাহিত্যের শিক্ষক তথা ফ্রান্সের কবি আর্জান্ত। এরপরে আমরা দেখতে পাই এই কবিকে ইদা বিশেষ করে অনুরোধ করে বাড়িতে নিয়ে যায়। এদিকে ছোট জাককে আদর করে নানা কথার মধ্য দিয়ে তার মায়ের কথা, তাদের বাড়ির কথা জেনে নেয়। এরপর মাসের ছুটির দিনে আর্জান্ত ভোজন নিমন্ত্রণ, জাকের থেকে আর্জান্তকে নিয়ে বেশি সময় কাটানো ইত্যাদির ফলে জাকের কাছে আর্জান্ত চক্ষুঃশূল হয়ে দাঁড়ায়। ইদাও ক্রমে ছেলের মানসিক দুঃখ বুঝে আর্জান্তকে নিয়ে এতিয়েলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করে এবং তা জাককে জানায়।

মা চলে যাবার পর জাকের একমাত্র ভরসা ছিল সেসিল। সেসিল তাকে কখনো ত্যাগ করবে না, তাকে কথা দিয়েছে। আর এমন সময়ে সেসিল তার মা-বাবার পাপের কথা জানতে পেরে নিজের ওপর ঘৃণায় মতের পরিবর্তন করে। সে ভাবে জাক এ ঘটনা জানলে নিশ্চয়ই তাকে আর বিয়ে করবে না। এও আশঙ্কায় সে তার দাদাকে বলে “আমার ভুল হয়েছিল। এ বিয়ে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি আগে। আমি জাককে ভালবাসি না।”[৩৪] অনেক বলে সেসিলের এই রহস্যের উদ্ধার করতে না পেরে ডাক্তার জাককে লিখে—সামনের রবিবার তাদের বাড়িতে না থাকার কথা জানায়। জাক এর ঠিক পরের রবিবার ডাক্তারের বাড়িতে এসে তাঁর মুখেই বাগানবাড়িতে বসে সেসিলের মতের পরিবর্তনের কথা জানতে পারে। সেসিল ঘর থেকে জাককে দেখে— ‘দেখিল, সে ধীর পদে নত দৃষ্টিতে চলিয়া যাইতেছে! যেন একটা প্রাণহীন দেহকে কোন্ অনৈসর্গিক শক্তি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে!’[৩৫] পরে দাদা আর একটি রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে সেসিলের এই বিষয়ে সমস্ত জানতে পারে। এঘটনা যে অনেক আগেই জাককে ডাক্তার বলেছে তা সেসিলকে জানাতে আবারো জাককে ফিরে পেতে চায়। দাদামশায় বলে— “তবে চল, সেসিল, আমরাই তার কাছে যাই। সে বেশ হবে। আজ রবিবার, তার ছুটি আছে— বাসাতেই তাকে পাবখন— নিশ্চয়। দুজনে গিয়ে তাকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আসি, চল যাবে দিদি?”

“যাব— এখনই চল, দাদামশায়।”[৩৬]

এতিয়েলের সেসিলের বাড়ি থেকে জীবনের একমাত্র শেষ ভরসা ও বিশ্বাসকে হারিয়ে মানসিকভাবে একেবারে নিঃস্ব হয়ে জাক যখন বন্ধু বেলিসেয়ার কক্ষে প্রবেশ করে তখন তার প্রাণ যেন বেদনায় ফেটে যাচ্ছিল। সে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থেকে অনুভব করতে থাকে 'বুকের মধ্যে যে অসহ্য যাতনা আগ্নেয়গিরির বিরাট দাহের মত অহর্নিশি জ্বলিয়া উঠিতেছে, তাহার জ্বালায় কথা কহিবার প্রবৃত্তিই তাহার মোটে থাকে না।'[৩৭] এই অবস্থায় জাকের শরীর অসুস্থ ধরে নিয়ে লেভ্যান্দ্র্ ও বেলিসেয়ার অবিরাম সেবায়-শ্রুশুষা করতে থাকে। এখন সে রোগতপ্ত দিনগুলি কাটাতে কাটাতে শ্রমজীবী দলের কোলাহল শুনতে পায়। 'কিন্তু কাহার জন্য জাক আজ কাজ করিবে? কিসের আশায়? মা তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, শেষে সেসিলও তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে! এখন তবে কাহার মুখ চাহিয়া, কাহার সুখের জন্য সে কাজ করিবে, মানুষ হইবে? তাহার আজ আর কে আছে, কি আছে, যাহার আশায় অলস ক্ষুব্ধ চিত্তটাকে উত্তেজনায় আশায় রাগিণীতে সে মাতাইয়া তুলিবে?'[৩৮] তাই সে আর বেঁচে থাকতে চায় না। লেভ্যান্দ্র্ ও বেলিসেয়ারকে মুক্তি দিতে চায়। তারা জাককে হাসপাতালে নিয়ে যায়, ডাক্তার দেখে বলে— "এঃ, এ যে খালি কতকগুলো হাড়-পাঁজরা একটা চামড়ার খোলে পূরে নিয়ে এসেছ! ..."[৩৯] হাসপাতালের বিছানায় নার্স তার কাউকে দেখার ইছা করে কি না জানতে চাইলে সে জানায়— 'মাকে শুধু একবার দেখিবার সাধ হয়! সমস্ত প্রাণ আজ মাকে দেখিবার জন্য তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে!'[৪০] তার মা আর্জান্তর নিষেধ উপেক্ষা করে প্রথমেই আসতে পারেননি, যখন এসেছে তখন আর জাক ইহজগতে থাকে নি। কিন্তু জাকের মৃত্যু শয্যা-প্রান্তে সেসিল এসে জাকের তপ্ত ললাট স্পর্শ করে ডাকে, "জাক, জাক,—দেখ, চেয়ে দেখ, আমি এসেছি, আমি সেসিল!"[৪১]

চোখ মেলে জাক দেখিল সত্যই সেসিল! সত্যই সে এসেছে। এবার সে মৃদু হেসে জাক নিজের দুইটি বাড়িয়ে দেয়। দুই হাত দিয়ে সেসিলের কণ্ঠ বেষ্ঠন করে, অনুভব করে 'আঃ, সেই কোমল স্পর্শ— কি মধুর, কি আরামের!'

তাকে এখনো সেসিল ভালোবাসে কি না জনতে চাইলে সেসিল বলে—

"বাসি জাক, বড় ভালবাসি। তোমায় ছাড়া আর কাকেও কখনও ভালবাসিনি আমি—কাকেও না।"

জাক একথা শোনার পর বলে—

"তুমি এসেছ সেসিল,— আমায় দেখতে এসেছ ? আমায় তুমি এত ভালবাস ? আর তবে আমার কোন দুঃখ নেই, কোন অভাব না। এখন আমি হাসি মুখে মরতে পারব।"[৪২]

এরপরেই জাকের মুখের উপর মৃত্যুর ছায়া গাঢ়ভাবে নেমে আসে, মাথা তোলাবার চেষ্টা করে বড় রকমের একটা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯):

ইউরোপীয় (কন্টিনেন্টাল) উপন্যাসের কাহিনি ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় প্রকাশ করার একটা কাজ চলেছিল। এই কাজের দায়িত্ব ভারতী গোষ্ঠীর যে চারজন লেখক নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্য অন্যতম ছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যের আসরে তিনি বেশির ভাগ অনুবাদ মূলক গদ্য রচনা করেছিলেন। তিনি ওলন্দাজ ভাষার লেখক লুই কুপার্স-এর একটি উপন্যাস ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে লিখলেন 'ভাগ্যচক্র' (১৯১১)।[৪৪]

মনীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৩-১৯৭৮):

মণীন্দ্রলাল বসুর জন্ম ১৮৯৭ খ্রিস্ট্রাব্দের ৮ই জুন, মাতুলালয়ে কলকাতার কাশী ঘোষ লেনে। মণীন্দ্রলাল বসু তাঁর মাতৃকুল ও পিতৃকুল সম্পর্কে বলেছেন— 'য়ুরোপীয় বণিক কোম্পানীর মুৎসুদ্দী সওদাগর কাশীনাথ ঘোষ ঊনবিংশ শতাব্দীর উদয়কালে মধ্যকলিকাতার বীডন স্ট্রীট নির্গত কাশী ঘোষ লেন ব্যাপী যে বাসভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার বৃহৎ প্রাঙ্গণপ্রান্তে এক ক্ষুদ্রগৃহে অস্তমিত ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমার জন্ম হইয়াছিল।'[৪৫] এই কাশী ঘোষ লেনের বিশাল বাড়ির সংস্কৃতি-সাধনা ও জ্ঞানচর্চার ব্যাপকতা তাঁর চরিত্রের মধ্যে পড়েছিল। এছাড়া তাঁর চরিত্র গঠনে মা ইন্দিরাসুন্দরী ও মাতামহ অবিনাশ ঘোষের প্রভাব অনেকখানি ছিল।

মাতামহ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এম.এ., বি.এল.। মণীন্দ্রলালের ফরাসি ভাষার প্রথম পাঠ এঁর কাছ থেকেই শুরু হয়েছিল। তাঁর পিতা প্রবোধচন্দ্র ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র। ১৯১৪ সালে মনীন্দ্রলাল হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন ও পরে প্রেসিডেন্সি

কলেজে ভর্তি হন আই. এ. ক্লাসে। এবং ১৯১৬ সালে আই. এ. প্রথম বিভাগে পাস করেন। এর এই কলেজ থেকেই তিনি ১৯১৮ সালে ইংরেজি অনার্স সহ বি.এ. পাস করেন। ১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. এবং ১৯২৪ সালে বি.এল. উপাধি লাভ করে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। উল্লেখ্য, তিনি এই ছাত্র বয়সেই প্রচুর দেশি ও বিদেশি বই পড়েছিলেন, যেমন— রাস্কিনের 'সিসেম্ অ্যান্ড লিলিজ্', টুর্গেনিভের লেখা 'অন দি ইভ', ভিক্টোর হুগোর 'টয়লার্স অফ দি সি' প্রভৃতি।[৪৬]

মনীন্দ্রলাল বসুকে আমরা কল্লোল চেতনার যথার্থ পূর্বসূরী বলতে পারি। সেদিনের আধুনিক গল্পসাহিত্যের দরবারে মনীন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ ... বাংলা সাহিত্যের আসরে ইউরোপের জীবনকে যাঁরা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তিনি হলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর 'রমলা' উপন্যাসটি এদিক থেকে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। উপন্যাসটি বাংলার ১৩২৯ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। এছাড়া তাঁর বেশ কিছু গল্পও ১৩২৭ সাল থেকেই প্রবাসীতে কয়েক বছর ধরে প্রকাশিত হতে থাকে।

ব্যক্তি মণীন্দ্রলাল ও ইউরোপ যোগসূত্র:

মণীন্দ্রলাল কলকাতা হাইকোর্টে দু-বছর (১৯২৩-২৪) ওকালতি করতে করতেই ব্যারিস্টারি পড়াবার সুযোগ পান এবং লন্ডনের লিঙ্কন্স্-ইন-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর পর্যন্ত তিনি ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ছিলেন। ১৯২৫ খ্রিস্টব্দে প্রথম বছর ছিলেন ফ্রান্সের সমুদ্রতীর বার্কপ্লাজে। তখন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য তাকে প্রায়ই লন্ডনে যেতে হয়েছিল। এইসময় তাঁর দেখা হয়েছিল শ্রেষ্ঠ মনীষী রোমাঁ রল্যাঁ ও সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়। ইউরোপে থাকাকালীন সময়ে তাঁর শুধু আইন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষায় মন ভরেনি, আইন শিক্ষার পাশাপাশি তিনি শিখেছিলেন ফরাসি ভাষা। এছাড়াও তাঁর জার্মান ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল এই সময়েই। দেশে ফিরে এসে তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩৩৩-১৩৩৬ সময়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ইউরোপের চিত্রশালার বর্ণনা— 'লুভারের চিত্রশালা', 'কাইজার ফেডরিক মিউজিয়ামের চিত্রশালা', 'ফ্লেমিস চিত্র', 'খারিশ চিত্র' প্রভৃতি সচিত্র বর্ণনা ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত। ইউরোপে যাওয়ার

আগেই প্রকাশিত ‘রমলা’ (১৯২৩), ‘মায়াপুরী’ (১৯২৩), ‘রক্তকমল’ (১৯২৪), ‘সোনার হরিণ’ (১৯২৪) গ্রন্থগুলি। বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর প্রকাশিত হয় ‘কল্পলতা’ (১৯৩৪) গ্রন্থটি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মণীন্দ্রলাল সম্পর্কে লিখেছেন, “বেদ হইতে নীট্‌সে, কালিদাস হইতে শেলী, গতিয়ে বাৎস্যায়ন হইতে ফ্রয়েড্ সবই তিনি ‘গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে’ অধ্যয়ন করেছিলেন।”[৪৭] আসলে তাঁর মন জেগেছিল সেই পুস্তক-ধৃতজ্ঞান-সাগরের তীরে। অন্যদিকে, দেশ-বিদেশের কোনও জীবনেরই কোনও বিশেষ বস্তুভূমির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্বয় ঘটেনি। তবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোগ না থাকলেও সেকালের মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থনৈতিক অবক্ষয়, নৈতিক আদর্শ-বুদ্ধির অবসাদ সম্বন্ধে একনিষ্ঠ সচেতনার অভাব তাঁর কোনো কালেই ঘটেনি। বরং সেই বিনষ্টির পীড়া তাঁর ব্যক্তি এবং শিল্পীর অন্তরকে গোপনে গোপনে যন্ত্রণার্ত করেছে। অনেক পুঁথি পড়া জ্ঞান ও সূক্ষ্ম-মার্জিত রুচির বৈদগ্ধ্য নিয়ে মণীন্দ্রলাল সেই যন্ত্রণামুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন।[৪৮]

রমলা (১৩৬০):

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মণীন্দ্রলালের প্রথম উপন্যাস ‘রমলা’ ‘প্রবাসী’(১৯০১) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে উপন্যাসটি গুরুদাস চট্টপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসের আখ্যানে ইউরোপীয় প্রসঙ্গ:

ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লব ও পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতার অভিঘাতের সঙ্গে মানুষের শিল্পসত্তার দ্বন্দ্ব দেখানোর জন্য লেখক উপন্যাসে দুইটি সমান্তরাল প্রেমকাহিনিকে দেখিয়েছেন, অথচ যাদের উৎসস্থান একটিই পরিবার, তা হল— যোগেশচন্দ্র ঘোষের পরিবার। তাই অ্যাখ্যান ভাগের মাঝখানে তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হলেও শেষ পর্যন্ত তারা একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে, আবার একে অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে পেরেছে। এখানেই লেখকের সার্থকতা ও উপন্যাসটিরও।

আমরা এই উপন্যাসের মধ্যে দুটি সমান্তরাল প্রেমের কাহিনি দেখতে পাই। এই কাহিনি দুটি উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমান গুরুত্ব বহন করেছে, এখানে দুটি কাহিনিই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটিতে রজত ও রমলা এবং অন্য আর একটিতে যতীন ও মাধবী।

উপন্যাসের শুরুতে দেখি, দুই বন্ধু রজত ও যতীন— একজন শিল্পী আর একজন ইঞ্জিনিয়ার। এরা একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তায় সমাজ ও দেশের উন্নতিতে যন্ত্রশিল্পের অবদান প্রসঙ্গে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছে। এরপর প্রসঙ্গক্রমে আমরা জানতে পারি, শিল্পী রজত তার এক্সিবিশনে ছবির (বৈশাখী সন্ধ্যার) দৌলতে হাজারীবাগের এক অর্থবান ব্যক্তির কাছে ছবি আঁকানোর আমন্ত্রণ পায়। সেই উদ্দেশ্যে হাজারীবাগে যোগেশবাবুর বাড়িতে পৌঁছায় এবং সেখানে পৌঁছে যোগেশবাবুর কন্যা মাধবীকে তার ভালোলাগা শুরু হয়, মাধবীরও ভালো লাগে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের এই সম্পর্ক পরিণতি পায় নি। পরিবর্তে সেই বাড়িতেই পিতৃমাতৃহীন আশ্রিতা মেয়ে রমলাকে বিয়ে করে রজত কলকাতায় ফেরেন। কলকাতায় ফিরে রজত তার মামা তুলসীবাবুর কাছে আশ্রয় নেয়। তার এই মামা যতদিন বেঁচে ছিলেন রজতের দাম্পত্য জীবন বেশ সুখে-শান্তিতে, ভালোবাসায় পূর্ণ ছিল। তাদের সন্তান-সন্ততি হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে এই মামাবাবু মারা গেলে তাদের সংসারে অর্থ ও ভালবাসার সংকট দেখা দিতে থাকে, দুজনের মধ্যে ক্রমে দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। নিজেরাও তা বুঝতে পারে, ফলে একে অপরের মধ্যে সেই দূরত্ব ঘুচিয়ে একই সঙ্গে বাস করতে চেয়েছে। কিন্তু এই তাদের এই কৃত্রিম অভিনয় নিজেদেরকে বেশিদিন লুকিয়ে রাখতে পারেনি। এই কৃত্রিমতায় তারা নিজেদের মধ্যে থেকেই বিরক্তিবোধ অনুভব করতে থাকে এবং তাদের দূরত্ব দিনকে দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। দুজনে দমবন্ধ করা পরিবেশে কয়েকদিন একসঙ্গে থাকার পর তারা নিজেরাই নিজেদেরকেই মুক্ত করতে দুজনে অতীতে আবার ফেলে আসা হাজারীবাগে উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, যেখানে তাদের প্রথম দেখা হয়েছিল। সেই হাজারিবাগেই গিয়ে তারা সত্যি সত্যি দু-জনেই মানসিক প্রশান্তি লাভ করেছে। রজত ফিরে পেয়েছে তার শিল্পসত্তাকে। তাই সে আজ দেশ–বিদেশের খ্যাতনাম আর্টিস্ট।

অন্যদিকে, যতীন রজতের হাজারীবাগে যাওয়ার পর বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে গিয়ে কার্যত যোগেশবাবুর মেয়ে মাধবীর মোহে পড়ে যায়। যতীনের প্রস্তাবে মাধবী প্রথমে রাজি না। পরে যতীন তার বাবার কাছে প্রস্তাব দিলে সেই প্রস্তাবে বাবা রাজি হলে মাধবীও রাজি হয়। কারণ পিতা ভাবেন তিনি এবার তার দায়িত্ব মুক্ত হবেন। এরপর যতীন মাধবীকে বিয়ে

করে কলকাতার বাড়িতে নিয়ে আসে। যদিও মাধবী মন থেকে চাইতো শিল্পী রজতকে। কিন্তু তা সে কোনদিন রজতকে বোঝাতে পারেনি। এদিকে যতীন বিয়ে করার মাসখানেক পর থেকেই স্ত্রী মাধবীর থেকে অনেক বেশি সময় দিত কারখানার যন্ত্রের কাজে। যতীনের মাধবীর প্রতি ভালোলাগা আর সৌন্দর্যের মোহ মাসখানেকের মধ্যেই কেটে গেল। স্বামী যথেষ্ট অর্থ-সম্পদ দিয়ে স্ত্রীকে সুখে রাখবার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু মাধবী স্বামীর অভাব, প্রেম ভালোবাসার অভাবে দিন দিন হাঁপিয়ে পড়তে থাকে। যতীন হঠাৎ একদিন বন্ধু রজতের বাড়িতে গিয়ে তাদের সংসারের ভালোবাসা একে অপরের ভালোলাগার সম্পর্ক দেখে ব্যাকুল হয়ে স্ত্রী মাধবীর কাছে ফিরে এসে দেখে মাধবী ঘরে নেই। সে সদ্য এক ইউরোপ থেকে আগত ছেলের সঙ্গে বায়োস্কপে গেছে। এতে যতীনের প্রথমে মাধবীর প্রতি রাগ হলেও পরে বুঝতে পারে তার আসল সমস্যা, নিজেকে মাধবীর কাছে পাত্তা না দেওয়ার কথা। তাই এবার সে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে মাধবীকে আবারও প্রেমের বন্ধনে বাঁধতে চাইল কিন্তু যান্ত্রিক যতীন তাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হল। এরপর ঘটনাচক্রে যতীনের কারখানায় আগুন লাগলে সেই আগুনে নিজেকে শুদ্ধ করার জন্য ছুটে যেতে থাকে। এতে কোনরকমে মাধবী তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে সুস্থ করে তোলেন। কিন্তু কারখানা সেই আগুনের একটি মানুষ পুড়ে যায় এবার যতীনের আত্মোপলব্ধি হয় যে যন্ত্রসভ্যতার মানুষের উন্নতির জন্য সুখের জন্য সে মেতে ছিল, তাতে তার জীবনে কি হল? বারবার নিজের কাছে প্রশ্ন করতে থাকে। তাই সে এবার বেরিয়ে পড়ে মুক্ত জীবন যাপন করার জন্য। বেড়িয়ে পড়ে সুন্দরবনের জঙ্গলে-দ্বীপে সঙ্গে তার স্ত্রী। প্রায় সাত মাস সুন্দরবন থাকার পর বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করার পর একটি দ্বীপ কিনে নেয়। আপাতত তারা ফিরে যায় ভালোলাগার স্থানে— হাজারীবাগে যেখানে এর পূর্বেই শান্তির ঠিকানা হিসেবে বেছে নিয়েছিল তার বন্ধু ও নিকট আত্মীয় রজত। এবার তারাও সেখানে কয়েকদিনের অতিথি হিসাবে থাকে। যদিও তারা সুন্দরবনের কেনা দ্বীপে বিজ্ঞান ও সৃজনশীলতা দিয়েই এক নতুন পৃথিবী গড়ে তুলবে বলে সংকল্প করে।

উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে ইউরোপীয় প্রসঙ্গ:

রমলা: যোগেশবাবুর বন্ধুর মেয়ে। তার মা বিভাকে যোগেশবাবুর একসময় ভালো লাগলেও বিয়ে করতে পারেন নি। পরিবর্তে তার একসময়ের বিলাতফেরত বন্ধুর সঙ্গে বিয়ে হয়। রমলার জন্মের কিছুদিন পরে রমলার বাবা নিউমোনিয়া এবং ক্রিমিনাল ব্যারিস্টারের রাত্রি জেগে হাড়ভাঙা কাজ করার জন্য এবং মা অত্যাধিক মদ্যপান ও মানসিক অশান্তির জন্য মারা যান। এই রমলা একদিন খেয়াল বশত যোগেশবাবুর বাড়ির কাজের ছেলেকে দিয়ে কাচের গ্লাস ভাঙে। পরে মাধবী এনিয়ে জিজ্ঞেস করলে গেটের কাপ ভাঙার গল্প বলে। অন্যদিকে, যতীন তার দাদার বন্ধু হলেও তার দাদা বিলেতে গেলে আর তার কোনও খবর নিতে আসেনি। পরে রজতের এক বন্ধু তাকে পাশ্চাত্যের একাধিক বই উপহার দেওয়ার কথা জানতে পারি।

যতীন: মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা' উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম প্রধান চরিত্র যতীন। এই যতীন চরিত্রটি আগাগোড়াই ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণার আদলে গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের শুরু থেকে যতীনের চরিত্রগত দিক থেকে সাহেবিয়ানা ও আদব-কায়দায় বিলাতিয়ানা। পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লব ও যন্ত্রসভ্যতার মোহে সে মোহিত। সে দেশ, জাতি ও সমাজকে সেই সঙ্গে নিজেকে যান্ত্রিকতায় এগিয়ে নিয়ে চলার চিন্তা-চেতনায় মশগুল। ছাত্রজীবন থেকেই এই আদর্শের বশবর্তী হয়েই যতীন নিজের জীবনকে সেভাবেই গড়ে তুলেছে। বন্ধুর সঙ্গে যতীনের কথাবার্তায় তাই সে বলেছে, "পশ্চিমের লোকেরা এগিয়ে চলেছে দেখো, এই মোটরকারের মত; আর আমাদের দেশ— গোরুর গাড়ির মত ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দে আর্ত্তনাদ করতে করতে কোনমতে চলছে। প্রাণ নেই!"[৪৯] একে তো দেশটা ঝিমিয়ে পড়েছে তার উপর তোমরাও যদি আলস্যের মৌতাত লাগাও তাহলে কি করে চলবে এ কথাগুলি যতীন তার অন্যতম বন্ধু রজতের উদ্দেশ্যে বলেছে। এই ঝিমিয়ে পড়া ও আলস্য কোনো তার দিনই ছিল না এবং তা তিনি পছন্দও করেন না। ছাত্র বয়স থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার সময় তিনি প্রফেসরের সঙ্গে বক্সিং লড়াই করে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে প্রথমে আমেরিকায় ছয় বছর, পরে জার্মানিতে ছ-মাস কাটিয়ে সে এদেশে এসেছে। জার্মানি সম্পর্কে তার মনে হয়েছে, 'হাঁ আশ্চর্য্য দেশ জার্ম্মানি। একটা দেশ বটে, worth living...'[৫০] লোহা হচ্ছে এ যুগের দেবতা। এদেশে কলকারখানার জন্ম দিতে হবে,

প্রতিষ্ঠা করতে হবে শক্তির। জার্মানির মতোই যতীন শক্তি চায়, যে শক্তি দিয়ে সে ইঞ্জিন তৈরি করবে। ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের সুযোগ-সুবিধাকে সে নিজের দেশেও প্রয়োগ করে একটা নতুন বিপ্লব ঘটাতে চায়। মানব শক্তির জন্য, মানব সভ্যতার উন্নতির জন্য, মানুষের সুখের জন্য বিজ্ঞানের শক্তিকে সে প্রয়োগ করতে চায়।

যতীন এখন কলকাতার সাহেব পাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। ঘরটিকে অতি সুন্দরভাবে, সাহেবি ফ্যাশনে সাজানো হয়েছে। আসলে যতীন মাধবীকে সময় দিতে চাইলেও যন্ত্রশক্তি ও কলকারখানা তাকে মাধবী থেকে, স্ত্রী থেকে তার মনকে অনেক অনেক বেশী আকর্ষণ করত। সে সেখানেই ছুটে যেত। ফলে তার কাছে মানবিকতার থেকে মানুষের উন্নতির জন্য যন্ত্র অনেক বেশি গুরুত্ব হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই সে বাড়ি না ফিরে রাতের পর রাত কারখানায় কাটিয়েছে। একটি সময়ের পর সে ঠিক অনুভব করতে পেরেছিল তার এই যান্ত্রিকতার ফলে স্ত্রী মাধবী তার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। আর এতে তার সবথেকে বেশি মনের মধ্যে দাগ কেটে ছিল যেদিন, সে তার বন্ধু রজত ও রমলার গৃহে কয়েক মূহুর্তের আপ্যায়নে আপ্লুত হয়েছিল; বুঝতে পেরেছিল আর যান্ত্রিকতা নয় মানুষ হিসাবে স্ত্রীর কাছে, স্ত্রীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবন যাপন করা উচিত।

ইউরোপীয় সভ্যতার শিল্পবিপ্লবের ফলে সে প্রচুর ধন-সম্পদ উপার্জন করেছিলেন কিন্তু সেই ধন-সম্পদে নিজের মানবিকতা ও স্ত্রীর মর্যাদা ভালোবাসা ক্রমশই হারাতে বসেছিল। তার ঘরবাড়ি সাহেবি আদলে আর কেতাদুরস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ ও গৃহনির্মাণ করলেও সেখানে তাদের অস্তিত্ব রক্ষিত হচ্ছিল না। এবং শেষ পর্যন্ত যখন বন্ধু রজত ও রমলার সংসারে অর্থ সাহায্য করতে গিয়ে বুঝতে পারল অর্থ দিয়ে সমস্ত কিছু সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সেখান থেকে সে চরম অপমানিত হয়ে সেই টাকার বান্ডিল নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ফিরে যাচ্ছিল সেই কারখানার মধ্যে, সে যেতে যেতেই দেখতে পেল সেই কারখানায় আগুন লেগেছে। কারখানায় আগুন লাগাতে এবার তার মনে কষ্ট হল না, বরং সে অনেকটা শান্তি অনুভব করতে থাকল। কারণ সেখানে সে যেন নিজের আত্মতুষ্টি ও আত্মশুদ্ধি করবার জন্য বারবার সেই আগুনের দিকেই ধাবিত হচ্ছিল এতে কোনক্রমে তার স্ত্রী তাকে সেই অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা

করে, সেবা-শুশ্রূষা করে আবার সুস্থ করে তোলে। সুস্থ হওয়ার পর এবার কিন্তু সে আর শুধুই অর্থোপার্জনের দিকে মনোযোগ দিল না; পরিবর্তে নিজের শান্তি খুঁজে পেতে সুন্দরবনের অরণ্য জঙ্গলের মধ্যে দিন যাপন করবে বলে স্থির করে। এতে তার স্ত্রীও সঙ্গী হয় এবং দীর্ঘ সাত মাস তারা সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে ঘুরে বেরিয়ে ও ভালবেসে একটি দ্বীপকে কিনে নেয়। সেখানে ভবিষ্যতে বসতিস্থাপন করবে বলে স্বপ্ন দেখতে থাকে। আর এরই মধ্যে তার বন্ধু দম্পতি সেই পুরনো যেখানে তাদের প্রথম পরিচয়, প্রেম ও ভালোলাগা তৈরি হয়েছিল সেই হাজারীবাগের পাহাড়ে ছোট্ট কুটিরে ফিরে যায়। সেখানে তারাও কিছুদিনের জন্য অতিথি হল। আসলে উপন্যাসের শেষে এসে আমরা দেখতে পাই, একজন যন্ত্রনির্ভর মানুষ যে শুধুমাত্র যান্ত্রিক উপায়ে বেঁচে থাকতে পারে না এবং শুধুমাত্র যন্ত্রনির্ভর করেই যে সমাজের সভ্যতায় ও ব্যক্তির উন্নতি সম্ভব নয় তা যেন ঔপন্যাসিক যতীন চরিত্রটির মধ্যে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই শেষ পর্যন্ত যতীন তার নিজের চিন্তা, আদর্শের কাছে হার মেনে আবারও ফিরে গিয়েছেন সেই প্রকৃতির সান্নিধ্যে। আর অন্যদিকে তার যে বন্ধু একদিন সমস্ত কিছু হারাতে বসেছিল সে আজ দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা আর্টিস্ট হতে পেরেছে।

মাধবী: উনিশ বছর বয়সে তার মা মারা গেলে তখন থেকে সে পিতার দেখভালের দায়িত্ব নেয়। তার পিতা এক মেম শিক্ষাত্রীর কাছে তাকে পড়াশোনা শেখান। এছাড়াও উপন্যাসে তার তুর্গেনিভ-এর নভেল পড়ার কথা, সেখান থেকে পাশ্চাত্যের প্রেমতত্ত্ব আবিষ্কার করার কথা জানতে পারি। মাধবীর স্বামীর সঙ্গ-হীনতায় ইউরোপীয় সাহিত্য পাঠ বেঁচে থাকার রসদ। বিলেত প্রত্যাগত যুবকদের সঙ্গে সন্ধ্যায় বাড়িতে আড্ডা বসানো, কলকাতাকে প্যারিস করার চিন্তা। স্বপ্ন আর যন্ত্রসভ্যতার অভিঘাতে মাধবী ও যতীনের বৈবাহিক জীবন ক্লান্ত হয়ে পড়লে এরপর মাধবী ইউরোপ থেকে প্রত্যাগত এক তরুণের সঙ্গে বায়োস্কপে যায় এবং রোমান্স দেখতে থাকে।

যোগেশচন্দ্র ঘোষ: যোগেশচন্দ্রবাবুর ড্রয়িংরুম সাহেবিয়ানায় সাজানো, তবে সেখানে ভারতীয় শিল্পকলারও নিদর্শন ছিল। যোগেশবাবু ও রমলার বাবা একইসঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন একজন আইসিএস আর একজন ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফেরেন।

এছাড়াও আমরা মণীন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশকিছু গল্পে ইউরোপ প্রসঙ্গ পেয়ে থাকি। যেমন তাঁর 'হলায়ুধের ডায়েরি' গল্পটির সমকালীন (১৯৪৪-৪৫) ইউরোপীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও পটভূমিতে রচিত। এখানে একজন ইউরোপের আকালে যুদ্ধ-বিমান চালিয়ে তার মনের নূতন বাসনার আকাঙ্ক্ষাকে উচ্ছল করে তোলে। তাঁর 'জন্ম-জন্মান্তর' গল্পে আমরা দেখি, ঘরের পাশের বেলাকে ফেলে তরুণ নায়ক বিশ্বপরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ে। কারণ "পৃথিবীর দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে নারীর বিশ্বরূপ দেখিবার জন্য সে উল্লাসিত।" [৫১]

এই পর্বের কথাসাহিত্যিকদের রচনা বিদেশি গল্পের অনুকরণের প্রতি প্রবল আগ্রহের ফলে বাঙালি জীবনের বাস্তব রসানুভূতি খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, এরপরেও আধুনিক কথাসাহিত্যের ইতিহাসে এঁদের ভূমিকাকে আমরা একেবারে অস্বীকার করতে পারি না। এঁরা প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ ও বিশ্বাসের সমর্থক না হয়েও ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বাস্তব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সমাজনিষিদ্ধ দেহচেতনা ও কামনা-বাসনাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন।

উৎস নির্দেশ:

১. দাশ, শিশিরকুমার, *বাংলা ছোটগল্প (১৮৭৩-১৯২৩),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩, পৃষ্ঠা- ১১৫-১৮

২. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৮০, পৃষ্ঠা- ৯৩

৩. ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, *জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী,* প্রথম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র, *জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী-* ২,(স্বস্তি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত), বাগর্থ, কলকাতা, জুন, ১৯৭১, পৃষ্ঠা- ৬

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র, *রবিরশ্মি,* পশ্চিমভাগ, ১৯৩৯, পরিশিষ্ট, দে বুক স্টোর, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৩৩৬

৬. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (পঞ্চম খণ্ড), আনন্দ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮, পৃষ্ঠা- ১৮০

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র, *ধুপছায়া,* ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৯১২, পৃষ্ঠা- ১৩২

৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৩

৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৪

১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪১

১১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪২

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র, *সওগত,* ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩১৮, পৃষ্ঠা- ৭৩

১৩. তদেব

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৮

১৫. তদেব

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৫

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৬

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৭

১৯. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (পঞ্চম খণ্ড), আনন্দ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮, পৃষ্ঠা- ১৭৯

২০. মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রনাথ, পরদেশী, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, পৃষ্ঠা- ১-২

২১. মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রনাথ, সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী (চতুর্থ ভাগ), বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩২২, 'মাতৃঋণ' উপন্যাসের পূর্বকথায় উদ্ধৃত

২২. মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রনাথ, সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী (চতুর্থ ভাগ), বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩২২, পৃষ্ঠা- ৯

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৩

২৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫

২৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৯

২৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪১

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৭

২৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৮

২৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৭

৩০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮০

৩১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৬

৩২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৬

৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৪

৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৭

৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১০

৩৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৩

৩৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৬

৩৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৭

৩৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৮

৪০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২০

৪১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২১

৪২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২১

৪৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২২

৪৪. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড),* আনন্দ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা- ১৭৮

৪৫. মণ্ডল, স্বস্তি, *মণীন্দ্রলাল বসু,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ১৯

৪৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯

৪৭. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, *কল্লোল যুগ,* এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭, কলকাতা- ৭০০০৭৩।

৪৮. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলাসাহিত্যে ছোট গল্প ও গল্পকার,* মর্ডান বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২ পৃষ্ঠা- ৩০৮

৪৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০

৫০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১

৫১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৫৭

চতুর্থ অধ্যায়:

কল্লোলযুগের বাংলা কথাসাহিত্য

মনস্তাত্ত্বিকতায় ইউরোপ

কল্লোল ও কল্লোল সমসাময়িক কথাসাহিত্যের প্রেক্ষাপট:

কল্লোল পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩০ বঙ্গাব্দের প্রথম দিনে। এইসময় ভারত ও ইউরোপীয় জন-জীবনে নৈরাশ্য, নৈরাজ্য ও অনিশ্চয়তায় ডুবে যায়। আর তার প্রভাব বাংলা তথা ভারত-ভূমিতে আছড়ে পরেছিল। কারণ ভারত ছিল তখন ব্রিটিশ শাসিত উপনিবেশ। ১৯১৪ - ১৯১৮ সালের সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষের জীবন-চিন্তা ও নৈতিকতায় আসে প্রবল অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তা ও বেদনার বেদগানের ঢেউ এসে পৌঁছেছিল বাঙালি শিক্ষিত তরুণদেরও মনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কোল ঘেঁষে, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ঘটেছিল রুশ বিপ্লব। এই বিপ্লব (১৯১৭ - ১৯২১) চার বছরের মধ্যে সফলতা অর্জন করে। এই সময়ে মার্কসবাদ, ফ্রয়েড-এর মনস্তত্ত্ববাদ ও আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের প্রভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন ঘটে। ফলে একদিকে যেমন রুশ বিপ্লবের সফলতা, অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী শূন্যতা ও হতাশার পটভূমি— এই দুইয়ের মধ্যে দোলায়িত হতে থাকে ইউরোপ। এই অবস্থায় মানুষ সেদিন ইতি থেকে নেতিতে, স্থির থেকে গতির দিকে ঝুঁকে, একের পরিবর্তে একাধিক বিকল্প খুঁজতে থাকে। ঠিক এই অবস্থায় বাংলার কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা ঠিক কাকে আদর্শ হিসেবে এই সময় গ্রহণ করবে, তাঁদের জীবন প্রত্যয় কি হবে তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আমরা বিদেশি সাহিত্য বলতে কিছুটা ইংরেজি সাহিত্যকে আর কিছুটা ফরাসি সাহিত্যকে বুঝতাম। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপের দ্বার খুলে দেয়, ফলে সাহিত্য ক্ষুধা যায় বেড়ে। ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যের বাইরেও যে ইউরোপীয় সাহিত্যের মহৎ ভাণ্ডার আছে তারও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। এবার ফরাসি, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, নরওয়েজিয়ান, স্প্যানিশ, জার্মান, হাঙ্গেরিয়ান, রাশিয়ান ও জাপানিজ সাহিত্য ইংরেজি অনুবাদে বাংলার বাজারে সহজলভ্য হয়ে উঠল। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হল কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের; বিশেষত গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে আদর্শ হয়ে ওঠে ফরাসি ও রুশ কথাসাহিত্য। সেইসঙ্গে লরেন্স, হাক্সলি, নুট হামসুন, গোর্কির সাহিত্য পাঠ। এই অবস্থায় তাঁরা সাহিত্য রচনা করেছিলেন, ফলে তাঁদের সাহিত্যে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মূল্যবোধ তেমন গুরুত্ব পায়নি। পরিবর্তে সমাজ

নিরপেক্ষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও যাযাবর চরিত্র কেন্দ্রিক সাহিত্য রচনায় তাঁরা উৎসাহী হন। "এই গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে কখনও প্রকাশ পেয়েছে বাস্তব জীবনের প্রতি তীব্র আগ্রহ, কোথাও বা রোম্যাণ্টিক প্রবণতা। কোথাও বা নিঃস্ব নরনারীর অপরিসীম দারিদ্রের ছবি, সেই কঠিন বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রামের অক্লান্ত প্রয়াস, আবার অন্যদিকে কোথাও যৌনচেতনা ও দেহকামনার বাস্তব চিত্রণের মধ্যেও প্রেমের রোম্যাণ্টিক স্বপ্নালুতা। আসলে মৈথুন প্রবৃত্তির প্রতি আধুনিক লেখকদের যে বিশেষ আকর্ষণ, তারও অন্যতম উৎস হচ্ছে এ পর্বের রোম্যাণ্টিক রহস্য-প্রবণতা। মানবজীবনের প্রচ্ছন্ন সত্যকে জানার রোম্যাণ্টিক কৌতূহলই তাঁদের এই বিষয়ে অতি-মনোযোগের অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছিল। এই দুই বিচ্ছিন্ন প্রবণতার উল্লেখযোগ্য প্রতীক হলেন যথাক্রমে গোর্কি ও হামসুন। অর্থাৎ জীবনাশ্রিত বাস্তবতা ও বোহেমীয় রোম্যাণ্টিকতা—এই দুয়ের প্রতি কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখকদের অনেকের যে সমান আগ্রহ, যা হয়ত অনেকক্ষেত্রে স্ববিরোধী, তার পিছনে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বেশ কিছু প্রেরণা যে আছে, সেকথা নিশ্চয় মিথ্যা নয়।"[১] তরুণ বাঙালি লেখকেরা যুদ্ধোত্তরকালে ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে পেয়েছিলেন বাস্তব জনগণতান্ত্রিক চেতনা, যৌনচেতনাবোধ ও মিথুনাসক্তি, প্রেমের মনস্তাত্ত্বিকতা, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের পুনর্বিচারে নতুন মূল্যবোধ। আর সেই নতুন মত ও পথ তরুণ লেখকেরা বেশি করে পেয়েছিলেন গোর্কি, হামসুন, টুর্গেনিভ, চেখভ প্রমুখের লেখার মধ্যে। তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে, রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে ও প্রচলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে।

‘কল্লোল’(১৯২১) পত্রিকা:

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগ ‘ফোর আর্টস’ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রথম অধিবেশন হয় ৮ই জুন ৮৮ বি হাজরা রোডে। গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, সুনীতি দেবী এবং সতীপ্রসাদ সেন ছিলেন ফোর আর্টস ক্লাবের সদস্য। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প ও কারুশিল্প— ইত্যাদি চর্চা করাই ছিল এই ক্লাবের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু পরবর্তীকালে ফোর আর্টস ক্লাব দু’বছর পরে উঠে গেলে এর প্রাক্তন সদস্যরাই ‘কল্লোল’ পত্রিকাটি প্রতষ্ঠা করেন। গোকুল নাগ ও তাঁর বন্ধুদের ‘ফোর আর্টস’ ক্লাবকে কেন্দ্র করে অচিন্ত্যকুমারদের একটি মাসিক পত্রিকা বের করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু আমরা দেখি তার আগেই ক্লাবটি উঠে যায়। কল্লোল যুগ গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার বলেছেন, ‘আমার ব্যাগে দেড় টাকা আর দীনেশের ব্যাগে টাকা দুই— ঠিক করলুম ‘‘কল্লোল’’ বের করব।’ স্নিগ্ধ উত্তেজনায় উজ্জ্বল দুই চোখ মেলে গোকুল তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। বললে, ‘সেই টাকায় কাগজ কিনে হ্যান্ডবিল ছাপালাম। চৈত্র সংক্রান্তির দিন রাস্তায় বেজায় ভিড়, জেলে পাড়ায় সং দেখতে বেড়িয়েছে। সেই ভিড়ের মধ্যে দুজনে আমরা হ্যান্ডবিল বিলোতে লাগলাম।’[২] ‘তারপর একদিন ‘‘কল্লোল’’ অফিসে এসে উপস্থিত হলাম। ১০/২ পটুয়াটোলা লেন। মির্জাপুর স্ট্রীট ধরে গিয়ে বাঁ-হাতি। ‘‘কল্লোল’’ অফিস!’[৩] এই হল কল্লোলের জন্ম বৃত্তান্ত। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে ১লা বৈশাখ প্রকাশ পায় কল্লোল পত্রিকা। এর সম্পাদক হন দীনেশরঞ্জন দাশ। সহ-সম্পাদক ছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগ। পত্রিকার দাম ছিল প্রতি সংখ্যা চার আনা, পরে পাঁচ আনা। পত্রিকাটি চলেছিল সাত বছর (১৯২১-১৯২৯)।

‘কল্লোল’ পত্রিকাটি প্রথমে গল্প-মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হলেও ১৩৩১ বঙ্গাব্দ থেকে কবিতা, উপন্যাস, অনুবাদ ও প্রবন্ধ ছাপা শুরু হয়। প্রথম তিন বছর অর্থাৎ ১৩৩০-১৩৩২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত কল্লোল নিয়মিত প্রকাশিত হলেও চতুর্থ বছর থেকে তা অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং সপ্তম বছরে (পৌষ ১৩৩৬) পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটি প্রকাশের সময় অন্যান্য পত্রিকার মত এর ভূমিকা ও সম্পাদকীয় নিবেদন ছিল না।

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক:

'কল্লোল'(১৩৩০), 'কালিকলম'(১৩৩৩) ও 'প্রগতি'(১৩৩৪)— এই তিন পত্রিকার তরুণ লেখকবৃন্দ কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক নামে পরিচিত। এঁরা হলেন দীনেশ রঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অজিতকুমার দত্ত, মনীশ ঘটক ওরফে যুবানাশ্ব, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁরা রবীন্দ্রোত্তর যুগ প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তবে কল্লোল পত্রিকা প্রকাশের নির্দিষ্ট কোনও উদ্দেশ্য না থাকলেও কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের বিভিন্ন লেখায় কিছু লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। এগুলি হল—

> ১. 'যাকে'কল্লোল যুগ' বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে-বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।'[৪]
>
> ২. 'কল্লোল' সে যুগটাই সাহসের যুগ, সে সাহসে রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো।'[৫]
>
> ৩. 'রবীন্দ্র থেকে সরে এসেছিল "কল্লোল"। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলেকায়।'[৬]

এইসব লক্ষণ বা দাবি নিয়ে কল্লোল তার সাত বছর সময়কালে বাংলা সাহিত্য ও সমাজে প্রবল আড়োলন তুলেছিল-

> '"কল্লোল" বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন। ... এক দিকে বেগ, আরেক দিকে বল। এক দিকে ভাঙন, আরেক দিকে সংগঠন, একীকরণ।'[৭]

আমরা কল্লোল গোষ্ঠীর বিভিন্ন লেখকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসুর কথাসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করব। আমরা এই আলোচনায় অনুসন্ধান করে দেখার চেষ্টা করব মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাদের লেখায় ইউরোপ ঠিক কিভাবে এসেছে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬):

অচিন্ত্যকুমারের প্রথম কথাসাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে 'কল্লোল' পত্রিকায় ১৩৩০ সালে তাঁর 'বেদে' উপন্যাস প্রকাশের মাধ্যমে। তাঁর সমগ্র কথাশিল্পের জগত অনুসন্ধান করলে দেখব তাঁর লেখায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর চিত্তসংকট, সংশয়, হতাশা আর স্বপ্নভঙ্গের মর্মবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। এর অন্যতম কারণ অচিন্ত্যকুমার কৈশোর ও যৌবন জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয় এবং নৈতিক জীবনের অধঃপতন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, 'স্বদেশী আন্দোলন ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কিভাবে বাঙ্গালীর জীবনের মূল্যকে শিথিল করে বাঙ্গালী যুবকদের নিক্ষেপ করেছে অতলন্ত হতাশার গহ্বরে। তাদের জীবনবোধ যেন আবর্তিত হয়েছিল, জিজ্ঞাসা ও নৈরাশ্য সংগ্রাম ও অপূর্ণতা এই দুই যতির মধ্যে।'[৮] সেই সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের কৃতী ছাত্র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ছাত্র অবস্থা থেকেই নরওয়ে ঔপন্যাসিক নূট হামসুনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'প্যান'–এর বঙ্গানুবাদ করেন। পরবর্তীকালে হামসুনের 'প্যান' উপন্যাস অবলম্বনে রচনা করেন 'বেদে' (১৯২৪)।

'বেদে'(১৯২৪):

অচিন্ত্যকুমারের প্রথম কথাসাহিত্য 'বেদে' উপন্যাসটি ১৩৩৩ সালে 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি পৃথক ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদেই এক একটি নায়িকার নামে নামাঙ্কিত। এগুলি হল— আহ্লাদী, আসমানি, বাতাসী, মুক্তা, বনজ্যোৎস্নায় ও মৈত্রেয়ী। এরা কেউ অভিজাত ঘরের মেয়ে, কেউবা দরিদ্র রমণী আবার কেউবা বেশ্যার মেয়ে। উপন্যাসে দেখা যায়, নটরু-আহ্লাদি বা কাঞ্চন– আহ্লাদির মধ্যে এক নির্মোহ প্রেমের প্রকাশ। তারা আশ্রম জীবনের অবকাশে প্রায় সকলেই অপরিণত বয়সেই একে অপরের প্রতি প্রেমে আকৃষ্ট হয়েছে, কাছে এসেছে। এরপর কাঞ্চনের জীবনে এসেছে আসমানি বাতাসি, মুক্তা, বনজোৎস্না ও মৈত্রেয়ী। আর প্রত্যেকেরই প্রেমের স্মৃতি সে বয়ে চলেছে পথচলার আনন্দে।

উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের নাম আহ্লাদী। এখানে নয় বছর বয়সের কাঞ্চন, তার থেকে বয়সে ছোট বেশ্যার মেয়ে আহ্লাদী ও নটরুর ভালোবাসার গল্প প্রত্যক্ষ করি। কাঞ্চন পরিচয়ে তার নাম পচা বললে আহ্লাদী তার নাম দেয় কাঁচা। আসলে পচা ওরফে কাঁচা ওরফে কাঞ্চনের স্পষ্ট কিছু পরিচয় নেই। কোথায় তার ঘর, কোথা থেকে এল বা তার মা কে— তা সে জানে না। তার জীবনে যেমন বর্তমান বা অতীত নেই, তেমনি ভবিষ্যতও নেই। সে হল স্রোতের অনুকূলে ভেসে চলা শ্যাওলা। কোথায় কখন কতদূর যাবে তার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। চলমান পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটে। মৈত্রেয়ীর আখ্যানে কাঞ্চন বলেছে, "আমি একটা কি? চালগুলো নেই, মাথা গোঁজাবার ঠাঁই নেই, আমার মধ্যে স্থিরতা নেই, সামঞ্জস্য নেই। আমি কাউকে এত ভালবাসতে শিখিনি মৈত্রেয়ী, যে, সারাজীবন তাকেই ভালবাসব।"[৯] তাই তো কাঞ্চন কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হতে ছয়-ছয়টি নারীর সংস্পর্শে এসেছে; সমাজের নীচুতলা থেকে শুরু করে উচুতলা পর্যন্ত। আসলে পুরুষ জীবন সংগ্রামে বার বার ব্যর্থ হচ্ছে, আহত হচ্ছে— তার সেই ব্যথা ও ব্যর্থতার উর্দ্ধে জীবন তৃষ্ণার চরিতার্থতার প্রতীক হিসেবে তার রোমান্টিক মনে বিরাজ করেছে নারী— যার স্পষ্ট রূপ পুরুষ জানে না। 'বেদে'র নায়ক কাঞ্চন তাকেই খুজেছে— আহ্লাদী থেকে মৈত্রেয়ী পর্যন্ত।

"বেদে" উপন্যাসে দেখি, আহ্লাদির প্রতি আকৃষ্ট কাঞ্চন ও নটুর। আহ্লাদি ও মাস্টারের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা টিমুদা ও আসমানির মিলন সত্ত্বেও কাঞ্চনের হাতে তার সোনার হার উপহার দেওয়া বা কাঞ্চনকে ভালোবাসা সত্ত্বেও গোবিন্দের সঙ্গে মৈত্রেয়ীর মিলনের মধ্য দিয়ে নারীর ভালোবাসার মধ্যে একনিষ্ঠতার পরিবর্তে বহুগামিতার মনস্তাত্ত্বিকতার নিদর্শন পেয়ে থাকি। অন্যদিকে, নায়ক কাঞ্চন নয় বছর থেকে একুশ-বাইস বছর পর্যন্ত যেমন ছন্নছাড়া বেদের ন্যায় নানা বর্হিমুখী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে, ঠিক তেমনি মনস্তাত্ত্বিকভাবে একের পর এক ছয়জন নারী— আহ্লাদী, আসমানী, বাতাসি, মুক্তা, বনজ্যোৎস্না ও মৈত্রেয়ীর সংস্পর্শে এসেছে এবং তাঁদের ভালোবেসেছে। কিন্তু তাঁর ভালোবাসা কোথাও একনিষ্ঠভাবে একজনের কাছে আটকে থাকেনি, মন থেকে কোথাও পরিতৃপ্তি পায়নি। আসলে আমরা কাঞ্চনের মধ্যে

সেই যুগের হতাশা, ব্যর্থতা ও প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ ও সংস্করের বিরুদ্ধে মুক্তির পিপাসা কাজ করেছে। আর তা করতে গিয়ে উপন্যাসের মধ্যে কোথাও কোথাও যৌন চেতনার আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে, এটা স্বীকার করতেই হবে। 'ফ্রয়েড, হ্যাভলক এলিস প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা নরনারীর হৃদয়ের এই বহুগামিতাকে লক্ষ্য করেছেন। নরওয়ের সাহিত্যে বিশেষভাবে ন্যুটহামসুনের কথাসাহিত্যে নরনারীর হৃদয়ের এই বহুকামিতার, মিথুনাসক্তির উল্লেখ আছে এবং মনে হয় বেদে উপন্যাসে তার প্রভাব আছে।' [১০]

আকস্মিক (১৯৩০):

এই উপন্যাসটি অন্যনামে 'প্রগতি'তে ১৩৩৫-৩৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এর নামকরণ করেন 'আকস্মিক'।

গ্রামের কয়েকজন মহিলা ভোর বেলায় নদীর ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হয় হাটে কিছু বিক্রিবাটা করতে। সেখানেই অনতিদূরে রজনী একটি সদ্যপ্রসূত প্রায় মৃত শিশুকে দেখতে পায়। নিস্তারিণী শিশুটিকে কোলে তুলে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আগুনের তাপ দিলে শিশুটি বেঁচে যায়। আর সেই দিনেই গিরি অনাহারে, অনাদরে মারা গেলে সকলে নদীতে ফেলে দিয়ে আসে। এদিকে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটি পরবর্তীকালে শশীর কাছে মানুষ হয়, তার নাম রাখ, রাখহরি। এখানে যুদ্ধোত্তর কালের গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক সংকট ও মানুষের প্রবল ক্ষুধাকে লক্ষ্য করা যায়। এই শশী পরে গায়ক পঞ্চুর ঘটকালীতে তারই গ্রামের দামিনীকে বিবাহ করে। বিয়ের পর থেকেই দামিনী রাখর প্রতি রোষান্বিত, শুচিগ্রস্ত। রাখকে উঠানে কলাপাতা নিয়ে খাওয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে হত— কোনদিন বা খাবার দিত, আবার কোনোদিন খাবার দিত না। একদিন প্রচণ্ড খিদেয় দীর্ঘক্ষণ খাবার না পেয়ে দামিনী পুকুরে স্নানে গেলে রাখ ও তার সঙ্গী কুকুরটিকে নিয়ে রান্না ঘর থেকে খাবার আনলে তাকে গাছে বেঁধে কঞ্চি দিয়ে প্রহার করে। শশী সেদিন দূরের হাট থেকে বিকেলে ফিরে এসে এ ঘটনা দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে দামিনীকে লাথি মারে। দামিনী তখন বাড়ি থেকে চলে গেলেও রাতে ঘরে ফিরে এসে মাটির মেঝেতে শুয়ে পরে। সেইসময় শশী তার কাছে গিয়ে আদর-সোহাগ করবে বলে ভাবতে থাকে। কিন্তু কাছে

যায়নি। পরে অনেক রাত্রে সেই দিনই পঞ্চুর গানের আওয়াজ পেতেই ঘর থকে বেড়িয়ে তার কাছে যায়। পঞ্চুকে জানায় সে আর শশীর সঙ্গে থাকবে না, তার সঙ্গেই এখন যেতে চায়। কিন্তু পঞ্চু নেশা করে থাকায় তাকে সেসময় সঙ্গে নেয় না। এইসব কথাই আড়াল থেকে শশী শুনতে পায়। পরে দামিনী ঘরে এসে শুয়ে পড়লে শশী তাকে গলা টিপে হত্যা করে তার পরনের শাড়িকে দড়ি করে ঘরে ঝুলিয়ে দেয়। ছেলে রাখকে সঙ্গে নিয়ে অনেক রাতে মেলায় যায়। সেই মেলায় শহুরে বাবুদের সঙ্গে স্থানীয় জমিদারের ঝামেলায় মেলার দোকানে আগুন লাগলে শশী হারিয়ে যায় রাখর কাছ থেকে। রাখ শশীকে খুঁজতে গিয়ে দেখা পঞ্চুর। পঞ্চু তখন খুঁজছিল বহুরূপী নিকুঞ্জের বউ কুঞ্জকে। পঞ্চু কুঞ্জকে না পেয়ে রাখকে নিয়েই বাড়ি ফেরে।

গায়ক পঞ্চুর সঙ্গে এক ঝড়ের রাতে শ্মশানে বন্ধুত্ব হয় বহুরূপী নিকুঞ্জের। নিকুঞ্জের স্ত্রী পঞ্চুকে সেই ঝরের রাতে ঘরের মধ্যে প্রথম দেখে ভয় পেয়ে চোর বলে চিৎকার করে। কয়েকদিন পরে অবশ্য মধ্যেই তাদের মধ্যে ভাব জমে। এখন আর পঞ্চুর সকালের চা কুঞ্জের হাতে না খেলে চলে না। প্রতিদিন সকালে এসে চা খাওয়ার জন্য দাওয়ায় বসে থাকে, পঞ্চুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গরম জল পায়ে পড়ে গেলে পঞ্চুই পায়ের বাম হাতে নূপুর খুলে দিয়ে ডান হাতে শ্রুশুষা করে। কয়েকদিন পরে নিকুঞ্জ এক শ্রদ্ধের বাড়িতে প্রচুর তারির নেশা করে বাড়ি ফিরতে থাকে; সেইসময় সঙ্গে পঞ্চুর আবার তাড়ি খেয়ে আর একটি মরা পোড়ানোর কথা বললে সে রাজী হয়ে শ্মশানে যায়। শ্মশানে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে থাকে, পঞ্চুর জ্ঞান থাকলেও মাটিতে পড়ে থাকে; কিছু বলতে পারে না। অন্য সবারই নেশা তখন সপ্তমে। নিকুঞ্জকে পড়ে থাকতে দেখে তারা মৃত ভেবে তাকেও সবাই মিলে ধরে চিতায় তুলে দেয়, তার উপরে দেয় পড়ে থাকা অবশিষ্ট কাঠ। বাড়ি ফিরে তারা প্রচার করে দেয় নিকুঞ্জ তারি খেয়ে মারা গেছে। এদিকে তার স্ত্রী কুঞ্জ বাড়ি ছেড়ে চলে যায় শহরে সাহেবের সঙ্গে। কিন্তু পাড়াশুদ্ধ রটে যায় পঞ্চুই কুঞ্জকে লুকিয়ে রেখেছে। তাই পঞ্চু মনে মনে সংকল্প করে কুঞ্জকে যে করে হোক খুঁজে বের করবে ও তাকে নিয়েই ঘর করবে।

কুঞ্জের সঙ্গে দেখা হয় কয়েক বছর পরে, তখন তার খাদ্য-বস্ত্র–বাসস্থান কোন কিছুই আর নেই বললেই চলে। সে নিজেই বলেছে, 'এসেছিলাম বিবি সেজে, এখন একেবারে বাঁদির

বেহদ্দ। ঢালের বদলে ঢোল সওদা করেছি।'[১১] অনেক বুঝিয়ে কুঞ্জকে পঞ্চু তার বাড়িতে আনতে সক্ষম হয়। অবশ্য কুঞ্জর মনে অভীপ্সা ছিল তার স্বামী নিকুঞ্জের খবর করা। এনিয়ে তাদের মধ্যে মানান্য ঝামেলাও হয়। পঞ্চু কুঞ্জকে বলে, 'অত পোষাকি সতীপনা এতদিন তোমার কোথায় ছিল, কুঞ্জ ? ধোবাবাড়ি ছিল বুঝি? একটা সামান্য বেশ্যা হ'য়ে তুমি যে সীতা-সাবিত্রীর রিহার্সেল দিচ্ছ। তোফা! —হ্যাঁ, দিচ্ছি বৈ কি। এই বেশ্যা তোমার মত পঞ্চাশটা কুকুর রেখেছে পা চাট্‌বার জন্যে। তুমিই সীতা-সাবিত্রীর কি বুঝবে?'[১২] তাই যখন পঞ্চু তার ভবঘুরে গায়ক জীবন ছেড়ে তাকে নিয়ে নতুন গানের দল বেঁধে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে তখন কুঞ্জ রাতের অন্ধকারে পঞ্চুর ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছে স্বামী নিকুঞ্জের খোঁজ নিতে। সেখানে দেখা না পেয়ে সে আবারও চলেছে কলকাতার পথে আর সেসময় তার বোটে পঞ্চু আর রাখ এসে হাজির। বুদ্ধিমতী কুঞ্জ বলে, 'পঞ্চুরই জন্য ও পঞ্চুরই হাত ধরিয়া ভরসাহীন ভবিষ্যতের নদীতে সাঁতার কাটিবে। ও যে মোটেই একাকী পলাইয়া আসিতেছিল না, ... '[১৩] কলকাতার নিজের থাকার স্থানে নিয়ে গিয়ে সে পুরো ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যায়। 'আমাকে আপনারা বাঁচান, আমাকে বাঁচা বিধু— বলিতেই-বলিতেই কুঞ্জ কাঁদিয়া ফেলিল আর কি। ... এই লোকটা আমার সর্বনাশ করেছে,— আমাকে মদের সঙ্গে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে চেয়েছিল, আমার জিনিসপত্র গয়নাগাঁটি সব কেড়ে নিয়েছে। তবু ওর খাঁই মেটে না, এখানে পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে—'[১৪] লোকগুলি তখন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে পঞ্চুকে আক্রমণ করে পথে রেখে যায়।

কুঞ্জর সন্তানের প্রতি অপার স্নেহ। তাই সে 'ঘুমন্ত রাখ-র গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে কুঞ্জ ভাবিতে লাগিল— জীবনে ও এমনিই একটি ছায়া চাহিয়াছিল, গ্রীষ্মাবসানে একটি বিস্তীর্ণ ও সুশীতল মেঘছায়া।'[১৫] কুঞ্জ এবার নতুন বিপদের মধ্যে পড়ে রাখকে নিয়ে। রাখকে নিয়ে এই বাড়িতে বাস করা সম্ভব নয়, অথচ উপার্জনের অন্য পথ নেই। ঘরভাড়া বাকি পড়ে যায়। এরকম অবস্থায় শীতের রাতে তার এক পরিচিত খদ্দেরের মদের বোতল ও পকেট ভরা টাকা দেখে সে বেড়িয়ে পড়ে। রাখ সঙ্গে যেতে চাইলে তাকে নেয় না। কুঞ্জ ফিরে এসে দেখে ঘরের সমস্ত জিনিস টুকরো করে, ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড করেছে— একেবারে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে রাখর উপরে ঝাপিয়ে পড়ে। কুঞ্জ শক্ত হাতে রাখর মাথার চুল ধরে ঘরের বাইরে বের করে

দেয়। রাখকে বের করে দিলেও কুঞ্জ বাইরের জনযাত্রার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। যদি কোনদিন ছেলে আবার আসে সেই আশায় এ-বাড়িটা কুঞ্জ ছাড়তে পাড়ে না। ভাড়া দিতে না পারার জন্য এখন সে ওপর তলা থেকে নিচের কয়লার ঘরে স্থান নিয়েছেন। সেখানেই পঞ্চু নিকুঞ্জের নাম নিয়ে কুঞ্জকে ভোগ করতে এসে দেখে কুঞ্জ এখন 'শ্মাশানশায়ী কঙ্কাল' যেন বীভৎস মৃত্যুকে মুখোমুখি প্রত্যক্ষ করে— আতঙ্কে পিছিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে চলতে শুরু করে। সে ভাবতে থাকে এই কুঞ্জের রূপে মুগ্ধ হয়ে গ্রাম থেকে শহরে এসেছে, পকেট মেরেছে, এমনকি মানুষকে খুন করেও টাকা জোগার করেছে। কুঞ্জের এই অবস্থায় চিকিৎসা ও খাদ্যের জন্য টাকাগুলি দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চলতে থাকলে উল্টোদিক থেকে একটি যাত্রীভর্তি বাস এসে তাকে চাপা দেয়। এদিকে কুঞ্জকেও বাড়ি থেকে রাস্তায় তাড়িয়ে দেয়।

বিবাহের চেয়ে বড় (১৯৩১):

উপন্যাসটি প্রথম ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ছোটগল্প নামে প্রকাশিত হয়। এটিই পরে 'বিজলীতে' উপন্যাস আকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে আমরা দেখি, প্রভাত নিজের বিবাহ অনুষ্ঠানে বড় বোনকে বাড়িতে আনার জন্য ট্রেন যাত্রা করে মধ্যপ্রদেশের এক বুনো গ্রামে। সেই ট্রেনের মধ্যেই পরিচয় হয় নীরেন ও তার বোন অশ্রুর সঙ্গে। যদিও প্রভাত প্রথমে জানায় তার দাদা শীগ্‌গির কালাপানি পেরিয়ে বিলেতে যাবে, তাই যাবার আগে সকল আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করা হচ্ছে; আর সে অনেকটা থানাদার হয়ে কাজ করছে। প্রভাতের কথার অনুষঙ্গ ধরেই তার বোন সম্পর্কে নীরেনও জানায় 'বোকা মেয়েটাকে কত বললুম, বি-এ পাশ করলি, চল আমার সঙ্গে। ভয়েই ঘাবড়ে গেছে। বিলেত দেশটা যে মাটির এ মোটা কথাটাই ওকে বোঝাতে পাচ্ছি না।'[১৬] পরে তাদের কথা মতোই প্রভাত মাসির বাড়ি যায়, সেখানে প্রভাতের সঙ্গে অশ্রুর একান্ত নিভৃতে কথা ও নিজের হাতের মধ্যে অশ্রুর হাত রাখার মধ্যে অনেক ভবিষ্যত প্রভাত খুঁজে পায়। তার অনুভব হতে থাকে বিবাহ করাই জীবনের সব নয়। 'কেন যেন মনে হলো এ হাতের মধ্যে অনেক-অনেক ভবিষ্যৎ। ঝাঁ ঝাঁ রোদ— হঠাৎ যেন জ্যোৎস্নার মতো মিঠে লাগে,

প্রভাতের মন মদির হয়ে উঠেছে। না, বিয়ে করে করে তার জীবনের সমস্ত সম্ভাবনার পথ সে বন্ধ করে দেবে না। এখুনি তার ঘরবন্দী হবার সময় আসেনি। না, টাকাই জীবনের সব কিছু নয়। মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচে না। যদি জীবনে সে একটা প্রেম পায় তা বিবাহের চেয়ে বড়।’[১৭]

ষাট টাকা মাইনের কেরানি প্রভাত। এই টাকা দিয়েই বাড়িভাড়া, বাপের বাতের কবরেজি চিকিৎসা, সংসারে খাই-খরচ, ছোট দুইবোনের বিয়ের জন্য টাকা জমানোর পর আর অবশিষ্ট বিশেষ কিছু থাকে না। অগত্যা বাবা প্রভাতের বিয়ে ঠিক করলেন, চার হাজার টাকা বরপণ পাওয়া যাবে এই আকর্ষণে। ‘মেয়ের খুঁত আছে বলেই অতগুলো রূপোর চাকতি। একে অমাবস্যা তায় একখানা পা ছোট। তা সে যাই হোক, টাকা পাওয়া নিয়ে কথা। টাকাই ফর্সা, টাকাই কুলীন।’[১৮] কিন্তু তার পরেও আশ্রুর সংস্পর্শে এসে তার দিদি ও বাবা উভয়কে মিথ্যা কথা বলে এই বিবাহকে ভেঙে দেয়। দিদিকে বলে, ‘— কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, বাবার হঠাৎ স্ট্রোক হয়েছে। বিয়ে পিছিয়ে গিয়েছে। আমাকে এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে।’[১৯] আর পিতাকে টেলিগ্রাফ করে বলে, ‘বিয়ের দিন পিছিয়ে দিন, আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ।’[২০] এরপর তাদের সঙ্গে ট্রেনেই কলকাতায় ফেরার পথে প্রভাত শিয়রে বসে ঘুমন্ত লাবণ্যময় প্রশান্তিরত অশ্রুকে অতি সন্তর্পণে দর্শন করতে থাকে। কিন্তু তার পরেও অশ্রুর ঘুম ভেঙে যায়, প্রভাতকে ঘুমাতে বলে। প্রভাতকে স্মরণ করে দেয় তার কলকাতা পৌঁছেইতো দশটা-পাঁচটা অফিস করতে হবে। তাই এখন প্রভাতের ঘুমানো উচিত বলে জানায়। এতে অশ্রুর প্রতি আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। ‘হঠাৎ যখন আপনাকে দেখলাম, আপনি প্রতিবেশী আত্মীয়ের মতো আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে কথা কইলেন, স্নেহ করে খেতে দিলেন, এই উষ্ণ সান্নিধ্যটুকু দিলেন— ভাবতে অবাক লাগল এর জন্য আমার কী তপস্যা ছিল? অযোগ্য হতভাগ্য— একটা অক্ষম গরীব কেরানী—’[২১] তার কিছুদিনের মধ্যেই প্রভাতের দুটি বোনই একথালায় বাসি খাবার খেয়ে কলেরাতে মারা যায়।

কলকাতায় ফিরে প্রভাত অশ্রুর বাড়িতে গেলে অশ্রু তাকে আদর-যত্ন করতে কোন ত্রুটি রাখে না। তিনতালার নিজের ঘরে বিছানা পেতে দেয়, এমনকি এখন দুপুর বেলায়

বাড়িতে কেউ নেই সেটা নিশ্চিত করে দেয়, কোমল ও শুভ্র আঙুলগুলি অতি ধীরে ধীরে প্রভাতের কপালে ও চুলে বুলিয়ে আদর করে— প্রভাত এই আতিথ্যেয়তা কখনও ভাবতেও পারেনি। প্রভাতের ভাবনায় আসে মৃত বোন দুটির কথা, মায়ের শোকশয্যার কথা আসে। এই অবস্থায় অশ্রু বলে— 'একটা বাইক কিনে নিলে তোমার খুব সুবিধে হবে। আমি টাকা দেব, মনোমত দেখে একটা কিনে নিও। কি, মোটর-বাইক কিনবে? সঙ্গে সাইডকার?'[২২] এরপরেও দু-একদিন যাতায়তে প্রভাত বুঝতে পারে অশ্রুর বাড়ির লোকেরা তাকে সেভাবে পছন্দ করে না। পরে অশ্রুর জ্যেঠতুতো বড় দাদার বিয়ের নেমন্তন্নে এসে প্রভাত বন্ধুত্বের কথা বলে। 'তুমি যদি আমার বন্ধু থাকো— এ বুঝি তারও চেয়ে দুঃসাহসিক। বিয়ে বড়ো জিনিস হতে পারে, কিন্তু বন্ধুতা বুঝি তারও চেয়ে বড়ো-

> হ্যাঁ, বন্ধুতা—স্ত্রী-পুরুষে বন্ধুতা— একসঙ্গে সংসার না করেও বন্ধুতা। সজ্ঞান, সক্রিয়, সংযত বন্ধুতা।'[২৩]

বছর পরে আসে অশ্রুর বিয়ের নিমন্ত্রণ-চিঠি, পাত্র বি. সি. এস. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। প্রভাত অনেক ভেবে যখন অশ্রুর বিয়েতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সেই সময়েই অশ্রু পালিয়ে তাদের বাড়িতে এসে প্রভাতের সঙ্গে মালা বদল করে। প্রভাতকে আলিঙ্গন সে করে জানায়, এখন স্কুল শিক্ষকতা করার জন্য দার্জিলিং মেলে জলপাইগুড়ি যাবে।

তিনবছর কেটে যায়, প্রভাতের মাইনে বেড়ে নব্বই টাকা হয়। বাবা মারা গেলে প্রভাতের সংসারে এখন মা আর অন্ধ ভাই নাটু। মা এবার প্রভাতকে বিয়ে কথা বলে। প্রভাত মাকে বিবাহের কতরকম অসুবিধা তা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বোঝাতে থাকে। 'বাংলা দেশের মেয়েদের তো তুমি চেন না মা, তারা স্বামীকে মা'র কোল থেকে কেড়ে রাখে। সংসারের শেষ প্রান্তে মাকে নির্বাসন দিয়ে বৌয়েরা স্বামীর কাঁধে সওয়ার হয়ে রাজত্ব চালায়। তোমার ছেলে হয়ে তোমার এই লাঞ্ছনা সইবো না, মা!'[২৪] এর চেয়ে আমরা এই বেশ ভাল আছি। কিন্তু মা বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্রী ঠিক করে। আর এরই মধ্যে অশ্রুর জলপাইগুড়ি থেকে চিঠি আসে। চিঠিতে প্রভাতকে চাকরিতে ছুটি না মিললে ইস্তাফা দিয়ে হলেও অতিসত্বর জলপাইগুড়ি পৌঁছাতে বলে। এবার প্রভাত মাকে সবকিছু বলে অফিসে তিন দিনের ছুটি নিয়ে অশ্রুর কাছে

পৌঁছায়। তিনবছর পরে অশ্রুকে দেখে মনে হয় 'গ্লাশের কিনারা বেয়ে উপচে-পড়া উচ্ছ্বসিত সুরার ফেনার মতো অশ্রুর যৌবন, ঊষার অঞ্জলি-উৎসারিত আলোর নিবেদনের মতো।'[২৫] অবশ্য সেখানে একদিন থেকেই অশ্রুর পরিকল্পনা মতো পরের দিনই তারা কলকাতার ট্রেনে উঠে পড়ে। সেখানেও অশ্রুকে প্রতি নিশ্বাসে দেখার জন্য প্রভাত রাত জেগে থাকতে চায়। পরে অবশ্য দু'জনেই নারী-পুরুষ-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তর্কালোচনা চলতে থাকে। প্রভাত বলে 'বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে যে-প্রেম— সে যতই সত্য হোক— অনেকটা সমাজের দাবি, সংসারের সুবিধে। বিয়ের আগে যে প্রেম— সে যতই সত্যই হোক— বিয়ের পর তার অস্তিত্ব নেই, সে অস্ত গেছে।...'[২৬] অন্যদিকে অশ্রুর মতে, 'যেখানে আনন্দ নেই অথচ কর্তব্য আছে দাসত্ব আছে, সেইটে পাপ। যেমন ধরো, আজ যদি তোমাকে বিয়ে করি, পরশুই সেটা পাপ হয়ে দাঁড়াবে, কেননা আনন্দ যাবে মরে। তাই করবো না বিয়ে— আনন্দকে জীইয়ে রাখতে চাই। বিয়ে বড়ো না, আনন্দ বড়ো?''[২৭] রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টি চিরজীবী হোক তাতে ক্ষতি নেই। 'তিনি চিরকাল বিরাট পর্বতের মতো পথ জুড়ে বসে থাকবেন আর আমরা সমস্বরে তাঁর সাহিত্যিক দীর্ঘায়ুতার জন্যে জয়ধ্বনি করবো, আমাদের সময় এত অপর্যাপ্ত নয়। রবীন্দ্রনাথকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখাবার মানেই বাঙলা সাহিত্যটাকে রসাতলে পাঠানো। যে-রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাধা হয়ে আছেন আমাদের বাঁচতে হলে তাঁকে আঘাত করতেই হবে।'[২৮] বিশ শতাব্দীতে কোন স্বপ্নবিলাসী সত্যিকারের খাটি মাটির কবি হতে পারেন না। তাতে শ্লীল-অশ্লীলতার প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে না। কিন্তু অশ্রু বলে, 'রবীন্দ্রনাথকে ডিঙোনো সোজা, সমকক্ষ হওয়াই কঠিন সাধনা-সাপেক্ষ।'[২৯] আকাশের সাহিত্যই হোক— মাটির নাম করে আমরা পাঁকের উপাসক হতে চাই না। তোমরা সব অতি-আধুনিক, তোমাদের মাথা খেয়েছে পাশ্চাত্য সাহিত্য। 'য়ুরোপের ছাড়া-কাপড় পরে তোমরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে যে সমস্যার সমাধানে কলম শানাচ্ছ সে-সব সমস্যাই ধোঁয়া, মনগড়া! য়ুরোপে যেটা জীবন মরণের কথা, সেটা তোমাদের কাছে রঙিন ভাববিলাসিতা মাত্র।'[৩০] সাহিত্য খালি যৌনসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলে তা হবে অস্বাস্থ্যকর। ট্রেন কলকাতায় চলে এলে হোটেলে কয়দিন থেকে বিহার হয়ে এলাহাবাদে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। তাতে আবারো সফর সঙ্গী হিসেবে অশ্রু আবারও প্রভাতকেই যেতে বলে। এরই মাঝে

অশ্রুর কাকা ঠিকানা খুঁজে তার কাছে আসে। অশ্রু যে কোনো অবস্থাতেই আর বাড়ি যাবে না সেটা স্পষ্ট করে দেয়। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই অপ্রত্যাশিতভাবে প্রভাতের আগমন হলে এই প্রভাতকেই সমস্ত নষ্টের নায়ক বলে মনে করে সেখান থেকে বেড়িয়ে যান। এখানেই জানতে পারে তার ছোট ভাই তিনুকেও বাড়ি থেকে বেড় করে দিয়েছে তাকে সাহায্য করার অপরাধে। এখন সে জাহাজের খালাসি সেজে বিলাতে যাচ্ছে। এবার অশ্রু জানায় সে জলপাইগুড়িতে থাকার সময় নির্মল নামে এক পুরুষের ভালোবাসায় পড়েছিল। কিন্তু অশ্রুর প্রেমের পরিণতি বিবাহ নয় ও বিবাহের পরিণতি সন্তানজনন নয় জেনে নির্মল সে প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। নির্মল বিয়ে করেছিল ইন্দিরা দেবীকে, যদিও তাকে আন্তরিকতা দিলেও অন্তর দিতে পারেনি। আর ইন্দিরাও রমাপতিকে মনে মনে চেয়েও বিয়ে করতে হয়েছিল নির্মলকে। আসলে অশ্রু এইরকম সামান্য সংসারে পরে তার প্রকাণ্ড ভবিষ্যতকে কুণ্ঠিত ও সংকুচিত করে রাখতে চায়নি।

অশ্রু এবার কলকাতা ছেড়ে পূর্বের পরিকল্পনামাফিক দিলদার নগরে পুষিদিদির বাড়িতে যায়। সেখানে 'ছোট বাসা, তিনটে ঘর— টিনের চাল, ভেতরে একটুখানি উঠোন। তিনটি ঘর ভরে কিলবিল করার জন্যে বিধাতা যেমন পুষিদির কোলে ছ'টি সন্তান দিয়েছেন তেমনই উঠোন ভরে দিয়েছেন আগাছা। ... কোলে মুমূর্ষু সন্তান, ... '[৩১] এরকমই এক পরিবারে কয়েকদিন থাকার পরে যখন কলকাতায় প্রভাতের সংসারে আসে তখন সে গৃহবধূ ন্যায় সাংসারিক হয়ে উঠেছিল। প্রভাতের মাও মনে মনে মেনে নিয়েছিল তাকে পুত্রবধূ হিসেবে, শুধু আনুষ্ঠানিকতার বাকি ছিল। তাই তিনি ছোট ছেলে নাটুকে বৌদি বলে ডাকতে বলেছিল। কিন্তু যত দিন যেতে থাকে, ততই ক্রমে মায়ের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে তারা একসঙ্গে থাকতে চাইলেও বিয়ে করতে রাজি নয়। এই অভিমানে তিনি বাড়ি থেকে চলে যান, কিন্তু তারা বিয়ে করে না। প্রভাত আবারো বলে, 'বিয়ে আর সকলের জন্য হোক, আমাদের জন্যে নয়। আমরা বিবাহের চেয়ে বড়ো!'[৩২] অশ্রু আবারও দার্জিলিং মেলে চলল স্কুল টিচারি করতে জলপাইগুড়ি। প্রভাতের হাত স্পর্শ করে বলে 'বলেছি তো, যখনই ডাকবে তখনই ফিরব। একবার আমি ডেকেছিলাম, এবার তুমি ডেকো।'[৩৩]

এই উপন্যাসটিকে মনে করা হয় অচিন্ত্যকুমারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। ঔপন্যাসিক ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব, সুখবাদী তত্ত্ব, অস্তিত্ববাদ প্রভৃতি দর্শনের আলোকে নারী ও পুরুষের প্রেমকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বকে সামাজিক ও সাংসারিক চিরকালীন প্রথাকে অস্বীকার করে তাদের স্বাধীনসত্তাকে স্বীকার করেছেন।

আমরা আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকা অশ্রুর উপলব্ধিতে শুনতে পাই "আমি আছি– এর চেয়ে বড় জ্ঞানাবিষ্কার মানুষের আর কী হতে পারে?"[৩৪] আর এই একই উপলব্ধি দেখা যায় প্রভাতেরও "আমরা প্রিয়াকে ভালোবাসি না, ভালোবাসি আমরা আপন আত্মাকে— যে আত্মা নারীকে প্রিয়া করে দেখেছে। তাই সে আমাদের সব চেয়ে বড়ো বন্ধু, যার মধ্যে নিজেকেই বেশি করে দেখতে পাই। ... প্রেমে আমাদের আনন্দ যতো অহংকার তার চেয়ে ঢের বেশি। এই অহঙ্করে বিধাতাও আমাদের সমকক্ষ নন। তাই প্রেম যখন মরে, বেদনার চেয়ে অপমান এই জন্যেই বেশি লাগে যে, অহংকার যায় ধুলিসাৎ হয়ে।"[৩৫] পরবর্তীকালে এই অস্তিত্ববাদ আমাদের শিখিয়েছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নতুন এক ব্যাখ্যা। যার বিরোধিতা করেই প্রভাত মায়ের কাছে উত্তর দিয়েছে "বিয়েটাকেই নরনারীর সম্পর্কের চরম পরিণতি মনে করে আত্মবঞ্চনার দিন চলে গেছে।"[৩৬]

আসলে অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্য ভাবনায় যে, আমরা মর্ত্যপ্রেম, আস্তিক্যবাদী জীবনদর্শন, বোহেমীয় বা যাযাবর চেতনা ও দেহমনজাত ভোগাকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাই তা আসলে সেই যুগেরই মানস প্রতিচ্ছবি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮):

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কল্লোল লেখক গোষ্ঠীর অন্যান্য লেখকদের মত প্রেমেন্দ্র মিত্র-ও পরিবর্তিত যুগ-পরিবেশে জীবন-জিজ্ঞাসা, হতাশা ও সংশয়ে বিদ্ধ হয়েছিলেন। মানুষ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর মৌলিক জিজ্ঞাসা ছিল—

'মানুষের মানে চাই—
গোটা মানুষের মানে।
রক্ত, মাংস, হাড় মেদ মজ্জা,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ কাম, হিংসা সমেত—
গোটা মানুষের মানে চাই। ... ' ('মানে', প্রথমা)

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও তাঁর সহগামী লেখক গোষ্ঠী তাঁরা 'মানুষের মানে' খুঁজতে গিয়ে তার 'রক্ত, মাংস, হাড় মেদ মজ্জা' কোন কিছুকেই বাদ দেননি। এর ফলে অনেক রচনায় কিছু অবাস্তব, স্বপ্নাতুরতায় অসংযম ও উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছে তাতে কিছু সন্দেহ নেই।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও তাঁর সমসাময়িক কালের বাঙালি লেখকেরা রুশ সাহিত্যের প্রতি একটু আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই সময়েই (১৩৩৩) দেখি 'কালিকলমে'র প্রথম সংখ্যায় গোর্কীর স্মৃতিকথার কিছুটা অনূদিত হয়। এবং ঐ বছরেই মহেন্দ্র রায় অনুবাদ করেন 'ম্যাক্সিম গোর্কী' নামক একটি প্রবন্ধ। এসমন্ধে কল্লোলীয়রা বলেছিল "রুশ সাহিত্যে বাঙ্গালী দেখেছে বেদনার সিন্ধু মন্থন করে জয়মালা গলে মানবের অন্তরের বিজয়লক্ষ্মী উঠেছে। ... তার মনে একটা অনুভূতি জেগেছে যে এই বেদনার পথ দিয়েই বুঝি আমাদের যাত্রাপথ।"[৩৭] প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন, "জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি হামসুন গোর্কীর পাঠশালায় গিয়ে থাকি তাতে দোষ কি? এতদিন তো সাহিত্যের সংজ্ঞা জীবনের বড় বেশী যোগ ছিল না। জীবনকে দেখবার দৃষ্টিই ছিল দুর্লভ।"[৩৮] প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজে যে হামসুন গোর্কীর পাঠশালায় নিয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেই জীবনাভিজ্ঞতারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর লিখিত উপন্যাসগুলির মধ্যে। আমরা সে বিষয়েই এখন আলোচনা করব।

পাঁক (১৯২৬) :

লেখকের এই উপন্যাসের নিবেদন অংশে বলেছেন, '... যত দোষ-ত্রুটিই থাক 'পাঁক'(১৯২৬) উপন্যাসে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে প্রথম যে একটি নতুন রাস্তা খোঁজার চেষ্টা ছিল, এ-কথা নিন্দুকেরাও স্বীকার করেন। সেই নতুন রাস্তার হদিস কী করে পেয়েছিলাম তাই বোঝানোর পক্ষে সংবাদটার কিছু মূল্য আছে।'[৩৯]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাসটিতে মুচি পাড়ার সমাজ জীবনের চিত্র অঙ্কিত হতে দেখা যায়। চড়ক সংক্রান্তির আনন্দমুখর দিনে দেখা যায় তিন কড়ির বৌ এর সঙ্গে কালাচাঁদের বোন পাঁচি ও কনে বৌয়ের ধার দেওয়া-নেওয়ার কারণেই কলহের সূত্রপাত ঘটে। কালাচাঁদের পিতার আর্থিক অবস্থা খুব বেশি খারাপ ছিল না। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর কালাচাঁদ তার 'কাঁচাবুদ্ধি' নিয়ে বিষম বিপাকে পরে যায়। দশ বছর আগে বিয়ে দেওয়া বোন বিধবা হয়ে শ্বশুরবাড়ির মার খেয়ে বাড়িতে এসেছে, এদিকে তার বিশেষ কিছু কাজ জানা ছিল না, ফলে আয়-উপার্জনের পথ একেবারে বন্ধ হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় পাঁচি 'নিজের মাকড়ি বিক্রি করে, তাগা বন্ধক দিয়ে, মরা মায়ের দেওয়া দড়িহারটা পর্যন্ত বাঁধা রেখে পাঁচি বছরখানেক চালালে যাহোক করে। ... অবশেষে যেদিন সব শেষে চাল-ডাল বাড়ন্ত হল সেদিন সে ভোরবেলা উঠে হাঁড়ি-কলসি নেড়ে আবার বিছানায় গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, ময়লা বালিশের ভেতর রুক্ষ চুল সমেত মাথাটা গুঁজে।'[৪০] এই পরিবেশে নায়ক কালাচাঁদের উপলব্ধি হয়, "এই জীবন থেকে কোনো দিন রেহাই পাবার কোন আশাও সে দেখতে পাচ্ছিল না, মৃত্যু ছাড়া।"[৪১] অন্যদিকে, 'শহরে রাস্তায় রাস্তায় তখন চির-ভিখারি ইতর ছোট জাতের দল বচ্ছরকার পরবে মদ খেয়ে, সং সেজে ঢোল বাজিয়ে বিদ্‌ঘুটে চিৎকার করতে করতে গাজন-সন্ন্যাসী সেজে চলেছে।'[৪২]

এরপর কালাচাঁদের জীবনে অনেক চড়াই-উতরাই ঘটে। একটি কাজও পায়, কিন্তু তাদের দারিদ্র উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকে। এরজন্য যে সে একা দায়ী নয়, বরং এরজন্য দায়ী সমাজ, সমাজের কিছু শোষণকারী ব্যক্তি। কালাচাঁদ দিনের পর দিন কাজ করে যায় শুধু বোন ও তার অন্নবস্ত্রের সংস্থান করার জন্য। কিন্তু তার কর্মক্ষেত্রে দেখি, ঠিকাদার ও মালিকেরা নানারকম মানসিক অত্যাচার করতে থাকে— কাজে খুঁত ধরা, একটু দেড়িতে এলে পয়সা কেটে

নেওয়া, ভালোবাসার মানুষকে অন্যত্র কাজ দেওয়া এবং সর্বোপরি মজুরি না দেওয়া ইত্যাদি সবই চলতে থাকে। এদিকে বোন পাঁচির লজ্জা নিবারণের একটিও কাপড় না থাকা ও কিনতে উপায় করতে না পারায় কালাচাঁদ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পরে। এদিকে 'সমস্ত রাত দুখী ভাই-বোন দুটিতে ভিজে মেঝেতে ভিজে কাপড়ে জলের ঝাপটায় অর্ধেক নেয়ে জেগে কাটালে ভোরের প্রতীক্ষায়। কিন্তু কীসের প্রতীক্ষা? ভোর হলে তাদের কী লাভ? পরবার কাপড় নেই। মজুরি পাবার আশা নেই। হাতে কাজও নেই। এখন কতদিন কাজ মিলবে না ভগবান জানেন। কোন আশায় তারা ভোরের প্রতীক্ষা করছে? এই বর্ষাকাল এসে পড়ল, চালে পাতা নেই, পুরনো দেয়ালের মাটি ধুয়ে যাবে— ভাড়া দেবার সংস্থান নেই, মেরামত করারও ক্ষমতা নেই।'[৪৩] পরে বাধ্য হয়ে সে নেত্যর কাছে গিয়ে কাপড় ধার করে বোনকে এনে দেয়। নেত্য অনেক আশা করে এবার হয়তো তাদের বিয়েটা হবে, স্বপ্ন দেখে কষ্ট হলেও তারা দিনগুজরান করবে দুজনের আয়-উপার্জনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বোন পাঁচি। সে কিছুতেই রাজী হয় না, আর কালাচাঁদও বোনকে ফেলতে পারে। ফলত তাদের প্রেম আর পরিণতি পায় না। আসলে বেকার কালাচাঁদ, তার বাপ-মা মরা বিধবা বোন পাঁচি ও কালাচাঁদের প্রণয়িনী নেত্য, তিনকড়ি মুচি, আহ্লাদীর মা— সকলেই এই পঙ্কিল পরিবেশে হাপিয়ে ওঠে। এর থেকে মুক্তি খোঁজে, ব্যর্থ হয়ে আবার এরই মধ্যে এসে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। আর যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আর্তনাদ করে। কারণ এরা দরিদ্র নিঃসহায় হলেও, এদের মধ্যে স্নেহ, মমতা, প্রেম ইত্যাদি মনুষ্যত্বের নানা বৃত্তি এখনও বেঁচে আছে। তাই এদের যন্ত্রণা এত বেশি। লেখক কয়েকটি 'স্কেচ' তারই চিত্র এঁকেছেন।

তিনকড়ি সকাল থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে গাধার খাটুনি খেটেও সংসারে মুচিপাড়ার মধ্যে সব থেকে বেশি কাঙালির হাল। এরজন্য পাড়ার সকলে তিনকড়ির বৌকে দায়ী করে বলে, 'বৌটা নচ্ছার, একেবারে লক্ষ্মীছাড়া আখখুটে'। ছেলে-মেয়েগুলো রোগা লিকলিকে, পাঁজরার হাড় গোনা যায়। এখন দশ বছরে আহ্লাদী দু বছরের হাবাকে কোলে নিয়ে ও ন বছরের শশী দু পয়সা ভিক্ষা করে বেড়ায় রাস্তার মোড়ে। কম বয়সের বাবুকে দেখলে সে বলে 'বাবু, তোমার রাঙা রাঙা বউ আসবে, বাবু তোমার গোড় লাগি, রাঙা ছেলে হবে বাবু—'[৪৪]

আর বেশি বয়সের বাবু দেখলে বলে 'বাবু, এই বাচ্চার জন্যে এক পয়সার মুড়ি কিনব বাবু, সারাদিন খায়নি বাবু, দুধের বাচ্চা বাবু, বাবু তুমি রাজা হবে—'[৪৫] দিনের শেষে বৃষ্টিতে ভিজে আর কিছু পাবার আশা নেই জেনে বাড়ির দিকে ফিরতে থাকে, এমন সময় মোড়ের কাছে মোটরের আওয়াজে পিছলে রাস্তায় পড়ে যায় আর অন্য একটি গাড়ি ছেলেটির বুকের উপর দিয়ে চলে যায়।

এই ঘটনার সময়ে এক খ্রিস্টান পাদরি রেভারেন্ড স্ট্যান্‌লি আহ্লাদীকে তাদের অনাথাশ্রমে নিয়ে যান সুস্থ করার জন্য। দুর্ঘটনার কথা মুচিপাড়ার কেউ জানেও না আর আহ্লাদীর খোঁজও কয়দিন ধরে যখন মিলছিল না, তখন হঠাৎ করে সেই খ্রিস্টান পাদরির সঙ্গে ফরসা কাপড় সেমিজ পরে হাজির হয়। সাহেব মুচি পাড়ার আরও অনেককে তাদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা করাতে চাইলেও কেউ কেউ রাজি হয় আবার কেউ কেউ রাজি হয় না, আহ্লাদীর বাবা তিনকড়িও রাজি হয় না। এরপর সাহেব ফিরে চলে যায়। রেভারেন্ড স্ট্যান্‌লি ইংলন্ডের এক সম্পন্ন পরিবারের ছেলে, অক্সফোর্ডে এম. এ. করে বাইশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে ভারতে এসেছে। তাঁর 'মনে হত ব্যস্ত ইউরোপের কারখানার জগৎ থেকে সে একটা ভিন্ন জগত— স্বপ্নময় চিরগোধূলিবেলার। রবিবাবুর কবিতা তখন ইউরোপে সবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ... হায়! কল্পনার ভারতবর্ষে আর সত্যকার ভারতবর্ষে কি এত প্রভেদ হতে পারে? স্ট্যান্‌লির সব স্বপ্ন চূরমার হয়ে গেল। গরিব তেমনই এখানে খেতে পায় না— স্বার্থ নিয়ে মানুষে মানুষে তেমনই কামড়া-কামড়ি—দারিদ্র তেমনি বীভৎস, তেমনই নিষ্ঠুর, তেমনই সীমাহীন। মজুররা তেমনই শীর্ণ বুভুক্ষু অশিক্ষিত কদর্য।'[৪৬]

'পাঁক' উপন্যাসে লেখক কেবল পঙ্কিল পরিবেশের চিত্রই তুলে ধরেন নি, সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। সে পথ হল সমাজতন্ত্রের পথ। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের ভাবাদর্শ ও মার্ক্সীয় চিন্তা-ধারা যুদ্ধোত্তর যুবামানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছিল। চারিদিকে ব্যর্থতা, হতাশা ও অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তির একটা নতুন আশ্বাস বহন করে নিয়ে এসেছিল এই সমাজতন্ত্রের বাণী। তারই আদর্শ প্রতিনিধি হলেন বিলেতফেরত অশান্ত কর্মকার। তিনি অক্সফোর্ডের এম. এ. ডিগ্রি পেয়ে ইকনমিক্সে প্রথম স্থান নিয়ে সেখানেই

অধ্যাপনার সুযোগ পেলেও তা প্রত্যাখ্যান করে চলে আসে দেশে। এখন তিনি সমাজের দুঃখ-দারিদ্র দূর করতে চান, কিন্তু সাহেবে সঙ্গে তার মত ভিন্ন। তিনি নিজের বাপের ঠিক নেই বলে লেকের কাছে বলে গর্ব অনুভব করেন। তিনি মনে করেন, 'আমি তো পৃথিবীতে আজ দেখছি দেশ নেই, জাতি নেই — শুধু আছে দুটো বিরাট দল, একটা হচ্ছে যারা অবিচার অন্যায় করে, আর একটা যারা পৃথিবী জুড়ে এই পরগাছাদের রসদ জোগায় আপনাদের কলজের রক্ত দিয়ে। আমার কাছে দেশ নেই, স্বদেশীয় হুজুক বুজরুকি—'[৪৭] তিনি আরও বলেন, 'দেশ দেশ করে চেঁচালে দেশের উন্নতি হয় না। আর যদি বা দেশ এই চিৎকারেই হঠাৎ স্বাধীন হয়ে পড়ে তাতে কী লাভ? মজুরের মুখের ভাতে পুষ্টিকর উপকরণ কতটুকু বাড়বে? চাষার ভাঙা চালায় ক-টা ছিদ্র দিয়ে বৃষ্টির জল আর শীতের হাওয়া আশা নিবারণ হবে? কুলির কদর্য, নোংরা, মানুষের বাস করার অযোগ্য বস্তির কতটুকু শ্রী ফিরবে?'[৪৮] আদর্শ মানবসমাজ যে কোন একদিনে গরে ওঠে না তা তিনি বোঝাতে বলেছেন— 'এক পলকে আদর্শ মানবসমাজ গড়ে ওঠে না। দু-হাজার বছর হতে চলল যীশু মানবের জন্য প্রাণ দিয়ে গেছেন। বুদ্ধ দেহ রক্ষা করেছেন আরও আগে। মানুষ আর কি কাঁদে না? ... ফরাসি বিপ্লব চেয়েছিল এক যুগে পৃথিবীতে স্বর্গ আনতে। এই অধৈর্যকে নিন্দা করার ধৃষ্টতা আমার নেই, কিন্তু এই অধীরতা যে নিষ্ফল এটুকু বলার সাহস আমার আছে। আদর্শ মনবসমাজের জন্যে আদর্শ মানব দরকার। সমস্ত মানব একদিনে আদর্শ হয়ে ওঠে না, পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করে বটে।'[৪৯] সমাজতন্ত্রের এমন স্পষ্টভাবে মর্মকথা বাংলা কথাসাহিত্যে খুব কমই প্রকাশ পেয়েছে।

১৯০৭ সালে গোর্কীর 'মা' উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ হয় এবং তার কিছুকাল পরেই সেটি ভারতে এসে পৌঁছায়। গোর্কী এই উপন্যাসের দ্বারা সমাজের নীচুতলার শ্রমজীবি মানুষের সত্যকার জীবনকলার প্রতি মধ্যবিত্ত তরুণ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী আকর্ষণ করে। আর বাংলা উপন্যাসে শ্রমজীবিদের মুখপত্র সংহতিতে প্রকাশিত হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাসটি। সংহতির একটি আলোচনায় বলা হয়েছে, "১৩৩০ সালের বৈশাখে প্রকাশিত 'সংহতি' নামে শ্রমিকদের মুখপত্রে নারায়ণ ভট্টাচার্যের 'দিনমজুর', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচনা 'বাঙালী

ভাইয়া' কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' রুশসাহিত্যের, বিশেষত গোর্কীর প্রেরণাসঞ্জাত মনে করলে বোধ হয় খুব ভুল হবেনা।”[৫০]

যুদ্ধোত্তরকালে নরনারীর মনের জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচন করতে গিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখলেন মানুষ আজ অনেক পরিমাণে বিকৃত ও অসুস্থ। তার প্রেম চেতনাও সহজ-স্বাভাবিক নয়। দ্বিধা, সংশয়, অবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে মানুষের সহজাত যৌবনবৃত্তিকে বিচিত্র ও জটিল করে তুলেছে। 'হয়তো' (১৯৩২) গল্পে মহিম ও লাবণ্যের দাম্পত্যের সম্পর্ক জটিল ও রহস্যময়। সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হৃদয়ের মধুর সম্পর্ক অনেক দূরের কথা, প্রতি মুহূর্ত সন্দেহ করে গেছে। মহিম লাবণ্যকে ভালোবাসে, আবার গভীরভাবে সন্দেহও করে। সেই সন্দেহের বিষাক্ত বাতাস সমগ্র গল্পজুড়ে বয়ে চলে। 'কী বিশ্বাস নারীকে করা যায়? কী তাহার প্রেমের মূল্য? আজ যে ভালোবাসিয়াছে কাল বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তাহার কতক্ষণ! ... ভালোবাসা, জীবনে যদি আপনাকে অপমানই করে তখন তাহাকে মৃত্যুর মধ্যে অমর করিয়া রাখিলে ক্ষতি কী?'[৫১] শেষ পর্যন্ত এক দুর্যোগের রাত্রে এক ভাঙা সেতু থেকে মহিম লাবণ্যকে ফেলে দেবার চেষ্টা করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব বিষয়ক চিন্তা ও চেতনা আমাদের মধ্যে বিপুল পরিমানে সঞ্চারিত হয়। একাধিক গল্পে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এরকমই একটি গল্প 'স্টোভ'। বাসন্তীর স্বামী শশিভূষণ মল্লিকা নামের একটি মেয়েকে অবিবাহিত জীবনে ভালোবেসেছিল, সেই মল্লিকা একদিন হঠাৎ বাসন্তীর সংসারে চলে এসে আড়োলন তোলে। সংসারের ভাঙা স্টোভটি বাসন্তীর মনের প্রতীক, যে কোন মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে কিন্তু ফাটে না। 'স্টোভটা হঠাৎ দপদপ ক'রে ওঠে, তারপর আঁচটা কেমন নিবে যায়। বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই মল্লিকা একটু স'রে ব'সে পাম্প দিতে আরম্ভ করে। স্টোভের শিখাটা বেড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে কর্কশ আওয়াজটায় সমস্ত ঘর ভ'রে যায়।'[৫২] ওদের দাম্পত্য জীবনেও অনেক বিস্ফোরণের আয়জন থাকে, কিন্তু তা ফেটে পড়ে না।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪):

বুদ্ধদেব বসু শৈশবেই তাঁর দাদার কাছ থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার হাতে খড়ি পেয়েছিলেন। 'আমার ছেলেবেলা' নিবন্ধে লেখক বলেছেন, "আমি তখন আরো একটু বড়ো হয়ে উঠেছি— শীতের সন্ধ্যায় দাদামশাই আমাকে পড়ে শোনাতেন শার্লক হোমস-এর কাহিনী পর্যয়, শেক্সপীয়র থেকে কোনো কোনো দৃশ্য; ... আর এমনি করেই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি আমার অন্তরঙ্গ করে তুলেছিলেন।"[৫৩] শৈশব পেরিয়ে কৈশোর ও যৌবনে পাশ্চাত্য সাহিত্যের জগতে পৌঁছোতে সাহায্য করেন প্রভু গুহঠাকুরতা। তিনি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাস করেছেন। বুদ্ধদেব বসু তা স্বীকার করে বলেছেন, "দেশ-বিদেশের সাহিত্য নিয়ে তিনি কথা বলেন আমার সঙ্গে; আমাকে পড়তে দেন হুইটম্যান, আর এমন অনেক লেখকের উপন্যাস ও গল্পের বই যাদের নামগুলো অদ্ভুত এবং অনিংরেজ।"[৫৪] প্রভুচরণ পরবর্তীকালে আমেরিকায় প্রবাস করলেও তাঁর সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল। তাঁর কাছ থেকে তিনি নিয়মিত চিঠি ও নানাদেশের বই পেয়েছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে বিভিন্ন রত্ন এনে বাংলা সাহিত্যকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন "পাশ্চাত্যের আর্ট ও সাহিত্যের সংগে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা জন্মাতে না পারলে আমাদের সাহিত্যের কখনও পূর্ণ বিকাশ হতে পারে পারবে না।"[৫৫]

বুদ্ধদেব বসুর গল্প-উপন্যাসে আমরা বাংলাদেশের সামগ্রিক জনজীবনের ছবি তথা পল্লীবাংলার সাধারণ নরনারীর জীবনের সুখ-দুঃখের ছবি ততটা প্রতিফলিত হতে দেখি না। পরিবর্তে তাঁর লেখায় নাগরিক জীবনের দুঃখদ্বন্দ্বময় জীবনসংগ্রামকে তিনি চিত্রায়িত করেছেন। আসলে তিনি ছিলেন নাগরিক জীবনের শিল্পী। তাঁর পাত্র-পাত্রীরা নাগরিক, সামাজিক মর্যাদায় উচ্চপর্যায়ে অবস্থিত বা সমপর্যায়ের। এরা রোম্যান্টিক প্রেম ও অন্তজীবনপ্রকাশ করতে কলকাতার নাগরিক জীবনের অবতারণা করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর আত্মপরিচয় মুখ্যত কবি হিসেবে। এই কবি স্বভাবের সুক্ষ্ম পরিচয়ও পাওয়া যায় তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলিতে। গল্প বা উপন্যাসের নামকরণগুলির মধ্যেই এই কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন— 'সাড়া' (১৯৩০), 'রডোডেনড্রন গুচ্ছ' (১৯৩২), 'মন দেওয়া নেওয়া' (১৯৩২), 'যেদিন ফুটলো কমল' (১৯৩৩),

‘ধূসর গোধূলি’ (১৩৪০), ‘বাসর ঘর’ (১৯৩৫), ‘রজনী হল উতলা (১৩৩৩)’, ‘ঘরেতে ভ্রমর এলো’ (১৩৪২) ‘ঝুট’, ‘এমিলিয়ার প্রেম’ প্রভৃতি।

রডোডেনড্রনগুচ্ছ (১৯৩২):

বুদ্ধদেব বসুর ‘রডোডেনড্রনগুচ্ছ’ উপন্যাসের শুরুতেই স্কুল টিচার সুমিত্রার গ্রাম্য জীবন-যাপনের তিতিবিরক্ত এবং নাগরিক জীবনের প্রতি আসক্তি দেখতে পাই। সুমিত্রা নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রথমে ইস্টিমারে ও পরে ট্রেনে করে কলকাতায় পৌঁছানোর কথা, শীলার পড়াশুনা ও পরীক্ষার প্রসঙ্গ এবং চন্দ্রিকার ডায়েরিতে লেখা জীবন দর্শন ইত্যাদির কথা আমরা জানতে পারি। ইস্টিমার নদীর পার ঘেঁষে যেতে থাকলে সুমিত্রার মনে হয় ‘জঙ্গল, তারি ফাঁকে-ফাঁকে দু’-একখানা কুঁড়ে ঘর; হ্যাংলা পেট-মোটা, কালো-কালো সব ছেলেমেয়ে, ... মেয়েরা— তা’রাও অর্ধনগ্ন— হাঁ করে তাকিয়ে আছে— কী সব মুখ! একেবারে শাদা কাগজের মত, পশুর মুখের মত ... ওখানে মানুষ বেঁচে থাকে? বেঁচে থাকে না ; জ্বরে, কলেরায়, অনাহারে, সাপের কামড়ে, আঁতুর ঘরে— বেশির ভাগই মরে;’ [৫৬] আর কলকাতায় পৌঁছানো মাত্রই তার সমস্ত পথের ক্লান্তি ও জীবনের গ্লানির শুধু মুক্তিই ঘটেনি, মুক্তির আনন্দও অনুভব করতে থাকে। অচিন্ত্যকুমারকে বুদ্ধদেব বসু নারায়ণগঞ্জ থেকে চিঠি লিখেছেন— “ভাই অচিন্ত্য, নারায়ণগঞ্জে কয়েক ঘন্টা halt করে আজ সন্ধ্যায় বাড়ি এসে পৌঁছেছি! টুনু আগেই এসেছিল। ...”[৫৭]

এই উপন্যাসের নায়িকা নীলিমা নাগরিক জীবনের সুখভোগিনী। তার ব্যক্তিগত আহার, নিদ্রা, প্রসাধনী ইত্যাদি শারীরিক সুখ-স্বচ্ছন্দের বাইরে আর কোন কিছুতেই আগ্রহ ছিল না। এমনকি তার বিয়ে প্রসঙ্গে মায়ের যে উদ্বেগ ও কৌশল তাকে সে উপহাস করেছে। তাই আমরা দেখি, নায়ক পুরন্দরকে একান্তে পেয়েও “নীলিমা নির্বিকার, আত্মস্থ, প্রশান্ত। নীলিমা তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল— তুমি বিয়ে কর না পুরন্দর? শান্ত সস্নেহ স্বরে নীলিমা বললে আমার ত মনে হয় তোমার এখন বিয়ে করা উচিত।”[৫৮] কিন্তু পুরন্দর ভীরু যুক্তিবাদী বুদ্ধিমান, তাই সে নীলিমাকে শুধু প্রেম নিবেদনের স্বপ্নই দেখেছে বারবার আর আত্মশ্লাঘা করেছে নিজের অবাস্তব শিল্প প্রতিভাকে নিয়ে। তার ইনটেলেক্টচুয়াল জীবনের অন্তসারশূন্যতা এতটাই যে, বীরেন

চক্রবর্তীর মতো লঘুচিত্ত লম্পট ব্যক্তিকে কখনও ঘৃণা করে আবার কখনও সঙ্ বা ভাঁড় বলে। কিন্তু সেই বীরেন চক্রবর্তীর ভাঁড়ামি ও চাপল্যে যখন তার প্রেমিকা নীলিমাকে আনন্দ উপভোগ করতে দেখে তখন সে নিজেই ভেঙ্গে পড়ে।

'রডোডেনড্রনগুচ্ছ' উপন্যাসের নায়ক পুরন্দর নীলিমাকে প্রেম নিবেদনের উদ্দেশ্য করে "দৃঢ় পদে সংকল্পিত চিত্তে নীলিমার ঠিক পাশে গিয়ে দাঁড়াল।" কিন্তু নীলিমাকে বলতে শুনি— "কী করছো বলো তো? তোমাকে আজ এত সুন্দর দেখাচ্ছে কেন?" যদিও মনে মনে সে ঠিক করে নেয় তার স্পষ্ট উচ্চারণ, বলার ধরন, সুর, শব্দে জোর দেওয়ার ভঙ্গি ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত পুরন্দরের আর বলা হয় না। এমনকি তার মনের কথা মুখে আসার আগেই নীলিমা বলে চলে যায়— "তোমাকে আজ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে পুরন্দর। তোমার চুল ছাঁটা চমৎকার হয়েছে।"[৫৯] স্বাভাবিকভাবেই নায়কের মধ্যে নৈরাশ্য প্রকাশ পেতে দেখি। পুরন্দর এবার ভাবতে থাকে— "কেনই বা সে এখানে বসে আছে?... তিক্তভাবে সে উপলব্ধি করলে যে বই পড়া ছাড়া আর কোনো কাজেরই সে উপযুক্ত নয়; সমস্ত জীবন এ ছাড়া আর কিছু সে করেও নি।"[৬০]

রজনী হল উতলা (১৩৩৩):

১৯৩৩ সালে 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প হল 'রজনী হল উতলা'। এই গল্পে মানুষের আদিম যৌনপিপাসার চিত্র ফুটে উঠেছে। এক ব্যারিস্টার পরিবারে পড়তে আসা আঠারো বছর বয়সের ছেলেকে রাত্রে বিভিন্ন বয়সি ব্যারিস্টার কন্যারা গোপনে শরীর নিবেদন করত। দিনের আলোয় ছেলেটি বুঝতে পারে না আগের রাতে কে তার কাছে গিয়েছিল, ফলে প্রত্যেককেই সে সন্দেহ করে। গল্পের নায়ক এ কাহিনি বলেছে বউ নীলিমাকে। এখানে নরনারীর সম্ভোগ-প্রবৃত্তি ও যৌন আকাঙ্ক্ষার উৎসের সন্ধান পাওয়া গেলেও তা একান্ত স্থূল ও কঠিন প্রত্যক্ষ বিষয়রূপে বর্ণিত হয়নি। ফলে গল্পের কাহিনি নিছক দেহসর্বস্ব অ্যাখ্যায়িকায় পর্যবসিত হয়নি, পরিবর্তে গভীর তাৎপর্য ও মহিমার আস্বাদ এনে দিয়েছে আমাদের। "রজনী-হল উতলা!' হালের মাপকাঠিতে হয়তো ফিকে, পানসে। কিন্তু এরই জন্য সেদিন চারদিকে তুমুল হাহাকার পড়ে গেল,— গেল, গেল, সব গেল— সমাজ গেল! সাহিত্য গেল, ধর্ম গেল, সুনীতি গেল! জনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলা পত্রিকায় প্রতিবাদ ছাপলেন— শ্লীলতার সীমা মানলেন না, দাওয়াই বাতলালেন লেখককে!'[৬১]

এমিলিয়ার প্রেম:

এ গল্পের নায়ক ভাস্কর চিত্রশিল্পী, সে বার বছর ইউরোপে কাটিয়ে এসেছে। আর এমিলিয়া দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রীকন্যা, তার জন্ম ইতালিতে। এক বিলাতি হোটেলের নাচের আসরে দু'জনার সাক্ষাৎ হলে দুজনের মধ্যে জেগে ওঠে প্রেমের উন্মাদনা। পরে দিনের পর দিন শারীরিক উত্তেজনায় মিলিত হতে থাকে। কিন্তু এমিলিয়ার জীবনের পূর্ব প্রেমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে ভাস্করের মনে ঈর্ষা ও সন্দেহ জাগে। এই সন্দেহের বশে মিলনের চরম মুহূর্তে এমিলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাস্করের মনে হয় 'এই তো চরম, এই তো চরম মুহূর্ত। সে ফিরে এসেছে আমার কাছে; এর বেশি কখনো আমাকে ভালোবাসবে না, এর বেশি আমি তাকে ভালোবাসব না।... '[৬২] এই মুহূর্তকে চিরন্তন করে রাখার ইচ্ছায় 'ভাস্করের দুই হাত এমিলিয়ার গলার উপর নামলো। প্রিয় স্পর্শে হাসি ফুটল এমিলিয়ার ঘুমন্ত মুখে। এত ভালবাসা কোনখানে ধরবে? এই শরিরে? না, রক্তমাংস শুধু বাধা দেয়, অসীমকে শৃঙ্খলে বাঁধতে চায় এত তার স্পর্ধা! ছিঁড়ুক সেই শৃঙ্খল!

আস্তে-আস্তে, অতি গভীর প্রেমে, ভাস্করের জোরালো আঙুল গভীর হয়ে বসে গেলো এমিলিয়ার গলার। ফুলে উঠলো নীল শিরা। এতক্ষণে, এতক্ষণে পরিপূর্ণতা! এমিলি, আর কি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে তুমি? এখন চিরকাল তুমি আমার, চিরকালের মধ্যে তুমি আমার।'[৬৩]

যেদিন ফুটলো কমল (১৯৩৩):

বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসের মধ্যে 'নাগরিক প্রেম' জীবনের চিত্র এঁকেছেন। উপন্যাসের নায়ক পার্থপ্রতিমের ভাবনার তা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সে মনে করে বিরহ-বেদনার স্পর্শে প্রেম পূর্ণতা পায়, দেহের কামনাকে বর্বরের মতো চরিতার্থ করার মধ্যেই মানুষের জীবনের সার্থকতা নয়। 'সভ্য মানুষের ভালোবাসা, তাই, দীর্ঘ সময় নেয়, অনেক স্তর অতিক্রম করতে-করতে তা নিজেকে প্রস্তুত করে তোলে পূর্ণতার জন্য। অনেক তাতে বিচ্ছেদ, অনেক দূরত্ব। তা শুধু কাছে পেতেই ব্যগ্র নয়, কাছে পাওয়ার নিবিড়তাকে সে সুরময় করে তুলতে চায় নানা অন্তরাল

দিয়ে—নয়তো তার মন তৃপ্ত হয় না।'[৬৪] 'দেহের রহস্যে বাধা' এই প্রেমকে কবি বুদ্ধদেব আশ্চার্য উপমা-রূপক ও বাণীশিল্পের যাদুতে মানব হৃদয়ের সেই রহস্যের রূপরেখা অঙ্কন করেছেন।

বাসর ঘর (১৯৩৫):

এই উপন্যাসে পরাশর ও কুন্তলার দীর্ঘদিনের পরিচয় ও তারা একে অপরকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। কিন্তু তারপরেও ব্যারাকপুরের বাসায় তারাভরা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে পরাশর ভাবছে— 'যে-মেয়ে তার এতদিনের চেনা, একি সেই মেয়ে ?... দু'জনের মধ্যে জন্ম নিলো বিশাল রহস্যময় নদী, স্বপ্নের মত কানে এসে লাগছে আতঙ্কের কালো জলের কলরোল। এ-নদী কোথায় গেছে, কত ঘূর্ণিতে, কত আবর্তে, কত প্রচণ্ড ঢেউ তুলে অন্ধকার বিসর্পিল স্রোতে কোন্ পরিপূর্ণতার সময়হীন দিগন্তহীন সমুদ্রে। ...'[৬৫] এখানেও আসলে কবি ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব কুন্তলা ও পরাশরের প্রণয়ের নিঃসঙ্গ অনুভূতি ও রহস্যকে শিল্পরূপ দিয়েছেন।

লাল মেঘ (১৯৩৪):

বুদ্ধদেব বসুর 'লাল মেঘ'(১৯৩৪) উপন্যাসের চরিত্রগুলি উপস্থাপিত হয়েছে নিজেদের বা তাদের সহ-চরিত্রগুলির চেতনা প্রবাহের মাধ্যমে। উপন্যাসের মূল চরিত্র মাত্র তিনটি— অবিনাশ, শোভনা ও সন্ধ্যা। অবিনাশের সঙ্গে শোভনার খুব অল্প বয়সেই বিয়ে হয়। শোভনার সংসারের সুখ ও সাফল্যের দানা ধীরে ধীরে বেঁধে উঠে। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে অতি অপরিণত বয়সেই যৌবন বাসনা নিয়ে সে মৃত্যু শয্যায়। এরকম অবস্থায় ঔপন্যাসিক অবিনাশ চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করেছেন এক চেতনা স্রোতের অপূর্ব সুন্দর উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। "অবিনাশ চোখ তুলে তাকালো। দেয়ালের উপর ইলেকট্রিক পাখার ঘূর্ণ্যমান ছায়া। চিকচিক করছে সন্ধ্যামণির কালো চুল। তার গালে আজ অনেকদিন পর একটা লালচে আভা। আর হঠাৎ অবিনাশের মনে পড়লো বিলেত থেকে ফিরে এসে সেই প্রথম সন্ধ্যামণিকে দেখেছিলো। উষ্ণ লাল রক্ত যেন চামড়ার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, এমনি রং। টলটলে তরল চোখ, প্রাণের আলোয় টলোমলো। মাঝে মাঝে খামাকা সে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, হাত দিয়ে মুখ ঢাকছে : যেন

হঠাৎ অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে নিজের সৌন্দর্য। কী ভালো তার লেগেছিলো, কী খুশি সে হয়েছিলো ওকে দেখে। এ যেন ফুলের উন্মীলনের মতো, উজ্জ্বল চিতাবাঘের লাফিয়ে ওঠার মতো। কোনো আশ্বাস যেন, ঈশ্বরের আশ্বাস। ...”[৬৬]

এই হৃদয়াবেগকে ঝেড়ে ফেলে পরক্ষণেই সে ফিরে আসে বাস্তবতায়— স্ত্রীর মৃত্যু শয্যায়। এই অবস্থা থেকে সে মুক্তি পেতেই সন্ধ্যামনিকে তার বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তাতে তার মানসিক বিদ্রোহ থেকে মুক্তি মেলে না। আসলে এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক খুব সুন্দরভাবে মানবমনের চেতনাস্রোতের সঞ্চরনের পথ ও তার ফলশ্রুতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে— “চেতনার প্রান্তদেশ, সেখানে চলো। সেখানে ঘন অন্ধকার ; ডুব দাও সেই অন্ধকারে। সেখানে হয়তো সত্যের দেখা পাবে। সেই অন্ধকারের বুক ফেটে সত্য জ্বলে উঠবে সূর্যের মতো, কোনো সংশয় থাকবে না। ... মনের মধ্যে কী আছে কে জানে? কী না থাকতে পারে, কী না লুকিয়ে থাকতে পারে সেই অন্ধকারে? বাইরের জীবনে প্রতি মুহূর্তে তাকে চাপা দিয়ে যাই। তাতে দোষ কী? স্পষ্ট করে দেখবার সাহস যদি না থাকে, কী করবো? সত্যকে মুখোমুখি দেখতে গেলে হয়তো সইবে না, সমস্ত জীবনে আগুন ধরে যাবে?”[৬৭]

অকর্মণ্য (১৯৩১)

এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু সুক্ষ্ম শাণিত বিদ্রুপের সাহায্যে তৎকালীন শিক্ষিত যুবচিত্তে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন উপন্যাসের প্রভাব কথা বলার পাশাপাশি সেই প্রভাব তাদের শিল্পসৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে কীভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তাকেও দেখিয়েছেন। উপন্যাসে অনসূয়া উপলব্ধি করেছে— “দিনকাল খারাপ পড়েছে; সব ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে এবং তা এত তাড়াতাড়ি যে চোখ মেলে দেখবার বা বোঝবার সময়ও নেই। কে বলে যুদ্ধের আগুন নিভেছে? পৃথিবীসুদ্ধ আগুনের হাওয়া ছুটেছে, তার তাপে বাংলাদেশের কোমল, আর্দ্র মাটি শুকিয়ে কঠিন হয়ে উঠেছে— অথচ, আশ্চার্য! ... তারপর আজকালকার সব উপন্যাসগুলো— ফ্রেঞ্চ, নরওয়েজিয়ান, রাশিয়ান— কী নয় ? এমনকি, ইংরেজি পর্যন্ত। সে অবিশ্যি বেশি পড়েনি—

ইচ্ছে করেই পড়েনি। তার কাছে ভারি অসুস্থ মনে হয়— দেবতারা জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছেন; দেবতারা— তা ঠিক। ... কিন্তু অসহ্য ছটফটানি এদের, জীবনটাকে গুঁড়িয়ে পুড়িয়ে উড়িয়ে ফুরিয়ে দিতে চায়—"[৬৮]

উপন্যাসের নায়ক শশাঙ্ক চরিত্রের চারিত্রিক দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে নায়িকা রিনির ২৫শে চৈত্র তারিখের ডায়েরিতে। "এমন লোক আমি দেখছি, যে আসলে অত্যন্ত কর্মক্ষম, কিন্তু নিজেকে অলস বলে ভাবতে ভাবতে যে বাস্তবিক যদ্দুর সম্ভব অলস হয়ে গেছে। সে যে অলস, এই কথা ভাবতে তার ভালো লাগে, তাই তার আলস্য কখনো ঘুচবে না। ..."[৬৯] রুশ বিপ্লবের পূর্ববর্তীকালে তুর্গেনিভ তাঁর গল্প ও উপন্যাসের নায়ক খুঁজেছিলেন তরুণ বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে। তিনি লক্ষ্য করেন এই সময়ে তরুণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নত চিন্তা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোন সুযোগ ছিল না। ফলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় ইচ্ছা শক্তি ও দৃঢ়তার অভাব এবং অবস্বাদগ্রস্ত নিষ্ক্রিয়তা।

বুদ্ধদের বসুর 'রডোডেনড্রনগুচ্ছ' উপন্যাসের নায়িকা সুখবাদিনী, জীবনকে সে খুব সহজ-স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করে। বোদলেয়ারের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট নগরপ্রীতি, এই নগরপ্রীতি ছড়িয়ে আছে বুদ্ধদেবের উপন্যাসের পাতায় পাতায়। 'প্রগতি' পত্রিকার ১৩৩৫ সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু মার্সেল প্রুস্তের উপন্যাসের একটি অংশ অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে তিনি ভূমিকায় লিখেছিলেন, "আধুনিকতম ইউরোপীয় সাহিত্যে একটা গভীর অন্তর্মুখীনতা এসেছে। ... প্রুস্ত কোনো গল্প বলেন না, তাঁর কোন প্লট নেই, সুনির্দিষ্ট কোনো আরম্ভ বা শেষ নেই। প্রস্ত-এর চরিত্র আত্মপ্রকাশের জন্য কোনো বিরাট ঘটনার অপেক্ষা রাখে না ...।" প্রুস্ত-এর চরিত্রধর্মের সঙ্গে বুদ্ধদেবের কোন মিল না থাকলেও তাঁর রচনারীতির বিকাশ বুদ্ধদেবের শিল্পী-মানসকে আনুকূল্য দান করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কল্লোল গোষ্ঠীর অনুবাদ সাহিত্য:

কল্লোলীয় যুগে বেশ কিছু লেখক ছিলেন, যারা একাধিক বিদেশি গল্প ও উপন্যাসের অনুবাদ করেছেন। এঁদের মধ্যে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিড়ালের স্বর্গ'। কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবীর 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত 'জাঁ ক্রিসতফ্' (১৩৩১), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিও টলস্টয় থেকে 'গমের দানা ডিমের মত বড়' এবং ফরাসী ঔপন্যাসিক Mercel Proust-এর রচনা অবলম্বনে 'কুমারী হুদিয়ের 'স্বামী', সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ফরাসী লেখক Andre Godard-র অনুসরণে লেখেন 'কবির উত্তরাধিকারী', বিজয় সেনগুপ্ত হাঙ্গেরীয় লেখক Koloman Mikszath-র অনুসরণে 'পোষাকের দাম', অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় ইটালিয়ান লেখক Masuccio Salerno-এর 'Friends in Love' (১৪১৫) অবলম্বনে 'উৎসবের রাতে' এবং শামসুর নাহারের মানবতা প্রভৃতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে এদেশের যুবসমাজের মধ্যে ফ্রয়েড ও অন্যান্য মনস্তত্ত্বিকদের বিভিন্ন গ্রন্থ ও ভাবধারার প্রচার ও প্রসার ঘটে এবং সেই সঙ্গে রুশবিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা তাদের প্রভাবিত করে। কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের চিত্তেও এই নবচেতনা-সঞ্চারের ফলে তাঁদের মধ্যে কেবল তত্ত্বচিন্তাই মুখ্য হয়ে ওঠেনি, পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায় রচিত উপন্যাস ও গল্প ইত্যাদি সৃজনশীল সাহিত্যেরও এক ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিংশ শতাব্দীর ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা, অবিশ্বাস ও সংশয়বাদী জিজ্ঞাসু পিপাসা বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। শুধু রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই তাঁদের পিপাসা সম্পূর্ণ হয়নি। তাঁরা হাত বাড়ালেন পশ্চিমের দিকে। শুধু ইংরেজি নয়, কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের দিকে— রুশ, ফরাসি, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ইত্যাদি। তাঁদের মনের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে ইউরোপীয় সাহিত্যের অনেক ভাবসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেল। গোর্কির বিখ্যাত উপন্যাস 'মাদার' ইংরেজিতে অনুবাদ হয় ১৯০৭ সালে। 'কালিকলম' পত্রিকার প্রথম বছরেই (১৩৩৩) গোর্কির স্মৃতিকথার অংশবিশেষ অনূদিত হয়। দ্বিতীয় বছরে (১৩৩৪) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় গোর্কির 'বদ্রেজিন' অনুবাদ করেন। বিশেষত বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বাঙালি লেখকদের সাহিত্য-সাধনার অন্যতম আদর্শ হয়ে ওঠে রুশ সাহিত্য। উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালির

লেখকদের যোগাযোগ গড়ে ওঠতে শুরু করে। ১২৯৮ সালের আশ্বিনে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রস্পার মেরিমীর গল্প অবলম্বনে প্রমথ চৌধুরীর 'ফুলদানী'। পরে অনুবাদ করেন 'কয়ার্মেন' গল্পের অনুবাদ। এছাড়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সহ আরও অনেক লেখক ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় করে দিয়েছিলেন। 'সাহিত্য', 'মানসী' ও 'মর্মবাণী' এবং 'সবুজপত্রে' তাঁদের ছোটগল্পের সঙ্গে উপন্যাসেরও অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। হুগোর 'বন্দী', দোদের 'মাতৃঋণ', 'নবাব', মোপাসাঁর 'জনৈকা' ইত্যাদি উপন্যাস ও প্রচুর গল্প প্রকাশিত হয়। ফরাসি কথাসাহিত্যিক রোঁম্যা রলাঁ-র প্রভাব খুব গভীরভাবে পড়েছিল বাংলার তরুণ লেখকদের মধ্যে। তাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' 'কল্লোল' পত্রিকায় ১৩৩১-এর মাঘ সংখ্যায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন, ''কল্লোলের'' সে যুগটাই সাহসের যুগ, সে সাহসে রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো। শুধু সুত্রপাতের সাহস নয়, সম্পূরণের সাহস। সেই সাহসে একদিন আমরা বিশ্বের প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের মিত্রতা দাবি করে বসলাম, নিমন্ত্রণ করলাম আমাদের যজ্ঞসভায়। ...'[৭০]

যুদ্ধোত্তরকালের বেকার সমস্যা, অর্থসংকট ও প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ ভাঙনের দিনে স্ক্যান্ডিনেভীয় ঔপন্যাসিক নুট হ্যামসুনের 'প্যান' বা 'হাঙ্গারে'র নায়কের ভবঘুরে, অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় ও যৌনবিদ্রোহী চরিত্র অভিনব ও যুগোপযোগী বলে বাঙালি লেখকদের মনে হয়েছিল।[৭১] তবে এই সমস্ত লেখকদের সমস্ত রচনাই এসেছিল মুখ্যত ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে কোন কোন ইংরেজ কথাসাহিত্যিকের চিন্তাধারায় সংশয়, অবক্ষয়, দেহচেতনা ও ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব তাঁদের গল্প-উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়, এঁদের প্রতিও বাংলার তরুণ লেখকদল আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডি এইচ লরেন্স ও অলডাস হাক্সলি। অলডাস হাক্সলি যুদ্ধোত্তর জীবনের কৃত্রিম বন্ধ্যারূপ, বুদ্ধিজীবীদের জীবনের অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও স্ববিরোধিতাকে তাঁর গল্প উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। ইংরেজি কথাসাহিত্যের জেম্‌স জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌, ডরোথি রিচার্ডসনের ব্যবহৃত Stream of consciousness-এর প্রভাব অনেক বাঙালি লেখকের লেখায় পড়েছে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের মানস প্রবণতা সম্পর্কে বলেছিলেন, "বস্তুত কল্লোলযুগে এ দুটোই প্রধানসুর ছিল এক প্রবল বিরুদ্ধবাদ, দুই বিহবল ভাব বিলাস। একদিকে অনিয়মাধীন উদ্দামতা, অন্যদিকে সর্বব্যাপী নিরার্থক কাব্য। একদিকে সংগ্রামের মহিমা, অন্যদিকে ব্যর্থতার মাধুরী। আদর্শবাদী যুবক প্রতিকুল জীবনের প্রতিঘাত নিবারিত হচ্ছে— এই যন্ত্রণাটা সেই যুগের যন্ত্রণা। ... একদিকে যেমন তার বিপ্লবের অস্থিরতা, অন্যদিকে তেমনি বিফলতার অবসাদ। যাকে বলে ম্যালাডি অব দি এজ বা যুগের যন্ত্রণা তা কল্লোলের মুখে স্পষ্ট রেখায় উৎকীর্ণ। ... দুই ভাবের অবিভূত সংমিশ্রন ছিল কল্লোল। কখনো উন্নত্ত, কখনো উন্ননা। কখনো সংগ্রাম, কখনো বা জীবনতৃষ্ণা। প্রায় তুর্গেনিভের চরিত্র।"[৭২]

উৎস নির্দেশ:

১. রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালিন বাংলা কথাসাহিত্য,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০, পৃষ্ঠা- ২২৫

২. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, *কল্লোল যুগ,* এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭, পৃষ্ঠা- ৫

৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬

৪. বসু, বুদ্ধদেব, *রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক,* সাহিত্যচর্চা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা- ১১৪

৫. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, *কল্লোল যুগ,* এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭, পৃষ্ঠা- ১৭৭

৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৩

৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০

৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৮

৯. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী,* (প্রথম খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯, পৃষ্ঠা- ১৪১

১০. বসু, দেবকুমার, *কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ১৬৯

১১. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী,* (প্রথম খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯, পৃষ্ঠা- ৭১

১২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৯

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৩

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৪

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৯

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৯

১৭. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী,* (দ্বিতীয় খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯, পৃষ্ঠা- ১৩৮

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৭

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৮

২০. তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৯

২১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৯

২২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৫

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৫

২৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬০

২৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭০

২৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯৬

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯৮

২৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০১

২৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০২

৩০. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০৭

৩১. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৩৯

৩২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩০

৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬৫

৩৪. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী,* (দ্বিতীয় খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯, পৃষ্ঠা- ৩০২

৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮৭

৩৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৫

৩৭. রুশ সাহিত্য ও তরুণ বাঙালী: নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। কল্লোল: ৪র্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা- ৬১

৩৮. ১৩৩৩ সালে কালিকলমে প্রকাশিত প্রেমেনবাবুর পত্র থেকে

৩৯. দাশগুপ্ত, সুরজিৎ, *প্রেমেন্দ্র মিত্র শতবার্ষিকী সংকলন* (সম্পা.) মিত্র ও ঘোষ পার্বলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪১০, পৃষ্ঠা- ৪১।

৪০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৫

৪১. প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পাঁক, ১৩৮২, পৃষ্ঠা- ৯২

৪২. দাশগুপ্ত, সুরজিৎ, *প্রেমেন্দ্র মিত্র শতবার্ষিকী সংকলন* (সম্পা.) মিত্র ও ঘোষ পার্বলিশার্স প্রা: লি:,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪১০, পৃষ্ঠা- ৪৫

৪৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৭

৪৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬১

৪৫. তদেব

৪৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৪

৪৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৮

৪৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৮

৪৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৫

৫০. রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০, পৃষ্ঠা- ১৬৪, ফুট নোট ৩২

৫১. ভট্টাচার্য, সৌরীন, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প,* (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা প্রথম প্রকাশ, ২০০১, পৃষ্ঠা- ৫২

৫২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৫

৫৩. বসু, বুদ্ধদেব, *আমার ছেলে বেলা,* এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০, পৃষ্ঠা- ১৫

৫৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮২

৫৫. প্রগতি, আষাঢ়, ১৩৩৪

৫৬. চক্রবর্তী, যোগজীবন (প্রকাশক), *বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ,* (দ্বিতীয় খণ্ড), গ্রন্থালয়, কলকাতা, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮২, পৃষ্ঠা- ২৯১-৯২

৫৭. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, *কল্লোল যুগ,* এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭, পৃষ্ঠা- ১৭০

৫৮. চক্রবর্তী, যোগজীবন(প্রকাশক), *বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ,* (দ্বিতীয় খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮২, পৃষ্ঠা- ৩৭৪

৫৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬৯

৬০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৭৭

৬১. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, *কল্লোল যুগ,* এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭, পৃষ্ঠা- ১৭০

৬২. ভট্টাচার্য, জগদীশ, বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৫৯, পৃষ্ঠা- ১০৬

৬৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৭

৬৪. চক্রবর্তী, যোগজীবন (প্রকাশক), *বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ,* (তৃতীয় খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৬ পৃষ্ঠা- ২৭৪

৬৫. চক্রবর্তী, যোগজীবন (প্রকাশক), *বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ,* (পঞ্চমখণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮৪, পৃষ্ঠা- ৫৩

৬৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৮

৬৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩১ - ৩২

৬৮. চক্রবর্তী, যোগজীবন (প্রকাশক), *বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ,* (প্রথমখণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮১, পৃষ্ঠা- ১৪০-১৪১

৬৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭৫

৭০. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, *কল্লোল যুগ,* এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১৭৭

৭১. রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০, পৃষ্ঠা- ১৬৬-১৬৯

৭২. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, *কল্লোল যুগ,* এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭, পৃষ্ঠা- ৬১

পঞ্চম অধ্যায়:

প্রমথ চৌধুরী ও প্রভাতকুমার

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ইউরোপ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইউরোপীয় সংযোগ সূত্রের সন্ধান:

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বর্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। এদিক থেকে হিসেব করলে দেখা যায় তাঁর জীবনকালের ব্যাপ্তি খুব বেশি নয়। পিতার রেল বিভাগে বদলির চাকরি সূত্রে বাল্যকাল থেকেই তাঁকে জামালপুর, ঝাঝা, দিলদারনগর ইত্যাদি স্টেশনে কাটাতে হয়েছে। ফলে ছাত্রজীবন কেটেছিল তাঁর একাধিক স্কুলে। প্রভাতকুমারের ছাত্রজীবন সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী— প্রভাতকুমার এন্টান্স পাস করেন জামালপুর এইচ. সি. ই. স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে ১৮৮৮ সালে, এফ. এ পাস পাটনা কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে ১৮৯১ সালে এবং বি. এ. পাস করেন পাটনা কলেজ থেকে ১৮৯৫ সালে।[১]

প্রভাতকুমার বি. এ. পাস করার পর জামালপুর স্কুলেই শিক্ষকতা শুরু করেন। এরপর সিমলাতে Commissary General in Chief – অফিসে অস্থায়ীভাবে কাজ শুরু করলেও তার অল্প কিছুদিন পরেই সেখান থেকে ফিরে এসে কলকাতায় Director General of Telegraph এর অফিসে স্থায়ীভাবে চাকরি করতে শুরু করেন। এই সময় সাহিত্যচর্চার মধ্যমে ঠাকুরবাড়িতে তিনি বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠেন। এই কালপর্বে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের সম্ভাবনাও তৈরি হয়। জানা যায়, সরলা দেবীর উপযুক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ অর্থব্যয়ে প্রভাতকুমারকে ১৯০১ সালের ৩রা জানুয়ারি ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেতে পাঠান। এই সময় প্রভাতকুমার ডাক বিভাগে কাজ করতেন। ঠাকুরবাড়ির প্রস্তাব মতো তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বিলেতে যাত্রা করেন, ব্যারিস্টারি শেখার জন্য। প্রভাতকুমার বিলেতযাত্রা সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন তাঁর 'য়ুরোপে পদার্পণ' (১৩১৫ বঙ্গাব্দ) রচনাটিতে। তিনি লিখেছেন, 'ইংরাজি ১৯০১ সাল ১৮ই জানুয়ারি, ভূমধ্যসাগর বক্ষে পি এণ্ড ও কোম্পানির "অষ্ট্রেলিয়া" নামক জাহাজ খানি ছুটিতেছে। ৫ই জানুয়ারি বোম্বাই ছাড়িয়াছিলাম,— আজ দুই সপ্তাহকাল একাদিক্রমে মাতা বসুন্ধরার স্পর্শবিরহিত-প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। আজ জাহাজে আমার শেষরাত্রি। কাল প্রাতে জাহাজ

মার্সেল্‌স্‌ বন্দরে পৌছিবে। সেখানে একবেলা থাকিয়া জাহাজ আবার লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিবে। কতক লোক মার্সেলসে নামিবে, বাকী লণ্ডনযাত্রী সমস্ত পথই জাহাজে যাইবে। ধন্য তাহারা–যাহারা নামিবে না। ধন্য তাহাদের ধৈর্য্য! সমুদ্রকে নমস্কার— আমি স্থলচর প্রাণী, জীবনের অষ্টাবিংশতি বৎসর স্থলে কাটাইয়াছি,– সুখে কাটাইয়াছি– কিন্তু জলে দুই সপ্তাহেই আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে।'[২] শেষ পর্যন্ত ১৯ শে জানুয়ারি ১৯০১ সালে প্রায় ভোর ৮ টায় তিনি মার্সেলস বন্দরে পৌঁছান। সেখান থেকে প্রথমে ট্রেনে করে প্যারিস হয়ে পরদিন লন্ডনের চেয়ারিং ক্রশ স্টেশনে পৌঁছেছেন। তারপর জার্মান পণ্ডিত Sir Osweld-এর বাড়িতে এসে পৌঁছান। এখানেই তিনি তাঁর প্রবাসকালের দিনগুলি যাপন করেছিলেন। Sir Osweld এবং তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে তিনি আত্মীয়দের মতোই ছিলেন— এবং এই বিদগ্ধ মানুষটির সাহর্চয্য এবং সান্নিধ্যে তাঁর জীবন ধন্য হয়েছিল। সেকথা প্রভাতকুমার তাঁর 'য়ুরোপে পদার্পণ'-এ অকপটে স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন "... তাঁহাদেয় আদর অভ্যর্থনা ও আত্মীয়বৎ ব্যবহারে আমি অত্যন্ত তৃপ্ত হইলাম। সে দিনটি গৃহিণীর জন্মদিন ছিল। পরে, অনেক সময়ে, আমাকে দেখাইয়া তিনি লোককে বলিতেন– "He is my birth-day present from L." (আমি ল– মহাশয়ের নিকট হইতেই ইহাদের নিকট পরিচয়পত্র লইয়া গিয়াছিলাম)। [৩] সম্ভত এখানে উল্লিখিত 'ল'– মহাশয় প্রভাতকুমারের অন্যতম সুহৃত এবং হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি লোকেন পালিত মহাশয়ের কথাই বলতে চেয়েছেন। কারণ তাঁর থেকেই পরিচয়পত্র নিয়ে তিনি রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তখন দত্ত মহাশয় লন্ডনের ৮২ নং টলবট্‌ রোডে থাকতেন এবং এই জর্ম্মন পণ্ডিতের পরিবার তাঁর সুপরিচিত ছিল। পরদিন দত্ত মহাশয়ের পরামর্শ ও সাহায্যে এবং মিস্‌ ম্যানিং এর আনুকূল্যে প্রভাতকুমার Middle Temple-এ ভর্তি হন।[৪]

প্রভাতকুমার ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মিডিল-টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। তবে ব্যক্তিগতভাবে প্রভাতকুমার যে সুখ-স্বপ্ন নিয়ে বিলেতে গিয়েছিলেন – সেই স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত তাঁর সফল হয়নি। সরলা দেবীর সঙ্গে পারিবারিক কারণে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে পারেননি। বিশেষত জানা যায়, তাঁর মায়ের আপত্তিতেই তা

সম্ভব হয় না। ফলে তাঁর হৃদয়ে এক দুরপনেয় ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। স্বভাবতই যে, কলকাতাকে কেন্দ্র করে তাঁর যে সাহিত্যমুকুল বিকশিত হতে শুরু করেছিল সেই কলকাতা পরিত্যাগ করেন এবং সুদূর দার্জিলিং-এ চলে যান। তবে বিলেত যাত্রার অভিজ্ঞতা যে তাঁকে বিষেশভাবে ঋদ্ধ করেছিল, এবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তিন বছরের অধিক সময় তাঁর ইংল্যান্ড প্রবাসজীবনের ফল ফলেছিল সুদূরপ্রসারী। কারণ বিলেত বাসকালেই প্রভাতকুমার নিয়মিতভাবে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসে পড়াশুনা করে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তুলেছিলেন। প্রভাতকুমারের ব্যক্তিজীবনে এই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়াশুনা পরবর্তীকালে কতটা কাজে লেগেছিল তাঁর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। **১৩২১** বঙ্গাব্দের **২৫**শে আশ্বিন রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়া ভ্রমণের সময়কালে প্রভাতকুমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনের কিছু অংশ—

> ... রবিবাবু বলিলেন— " কাশ্মীরের দৃশ্যের খুব সুখ্যাতি শুনি। তুমি ত গিয়াছিলে।"
>
> প্রভাতবাবু বলিলেন— " না, আমি কখনও যাই নাই।"
>
> একথা শুনিয়া রবিবাবু বিস্মত হইয়া বলিলেন— "যাও নাই? — তবে রমাসুন্দরীতে ও সব বর্ণনা লিখিলে কেমন করিয়া ?"
>
> প্রভাতবাবু হাসিয়া বলিলেন— "ও সমস্ত বিবরণ, বৃটিশ মিউজিয়ামে বসিয়া আমি লিখিয়াছিলাম।" [৫]

বিলেতে থাকাকালীন সময়ে সেখানকার মধ্যবিত্ত পরিবারের মন-মানসিকতাকে প্রভাতকুমার গভীরভাবে উপলবদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ আমরা আগেই জেনেছি, তিনি ভাগ্য করে একটি মধ্যবিত্ত ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে তাঁর প্রবাস জীবন কাটাতে পেরেছিলেন। এই পরিবারের সৌজন্যে তিনি বহু সমশ্রেণিভুক্ত মধ্যবিত্ত বিলাতি পরিবারের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই পরিচয় তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেক স্বচ্ছ এবং হৃদয়কে উদার ও প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছিল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর অনেকে তাঁকে বিলেতের সমাজ ব্যবস্থা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি জানিয়েছেন, '... আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন— ইংরাজ স্ত্রী-সমাজে সতীত্বের

মর্য্যাদা কিরূপ? আমি উত্তর দিই, বড় বড় ঘরের কথা আমি জানি না, সে দলের সহিত মিশিবার কোন সুযোগ পাই নাই— কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা বলিতে পারি, — তাঁহাদের মধ্যে সতীত্বের মর্য্যাদা যে আমাদের অপেক্ষা কম এমন বোধ হয় না। তবে শহরবাসী নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে– অর্থাৎ যাহারা কারখানায় বা দোকানে গতর খাটাইয়া খায়, তাহাদের মধ্যে সতীত্ব জিনিসটি খুব সুপ্রাপ্য নয়। আমি তিন বৎসরকাল সে দেশে একটি মধ্যবিত্তশ্রেণীর পরিবারমধ্যে, পরিবারস্থ একজনের মতই বাস করিয়াছিলাম। সেই সূত্রে আরও অন্যান্য পরিবারের সহিতও আমার মেলামেশার সুযোগ হইয়াছিল। তাহাদের সকলের বাড়ীতে বড় বড় মেয়েরও অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু এই তিন বৎসরের মধ্যে, কি বিবাহিত, কি অবিবাহিত, পরিচিত কোনও মেয়ে সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও অপবাদের কথা আমি শুনি নাই।'[৬] এই বিলেতপ্রবাসের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে তিনি অনেক গল্প রচনা করেছেন। তার মধ্যে 'দেশী ও বিলাতী' গল্পগ্রন্থের বিলাতী অংশের গল্পগুলি অন্যতম।

প্রভাতকুমারের ইউরোপীয় প্রবাস জীবনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত:

প্রভাতকুমার ইংল্যান্ডে থাকাকালীন অধ্যয়নের অবসরে সুবিধা বুঝে পরিচিতদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন সেদেশের বিশ্ববিখ্যাত পুরাতন স্মৃতিসৌধগুলি দেখার জন্য। প্রবাসজীবনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং স্মৃতিকথাগুলি বিধৃত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন রচনার[৭] মধ্যে এগুলি হল —

১। স্ট্রাটফোর্ড–অন্‌-এভ্‌নে একবেলা — ভারতী, ভাদ্র ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

২। অ্যাবট্‌সফোর্ড — ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

৩। ব্রাইটন — প্রবাসী, পৌষ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

৪। য়ুরোপে পদার্পণ – প্রবাসী, পৌষ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

৫। বিলাতী থিয়েটার – প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

৬। ইংরাজ রমণী — বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত, সৌন্দর্য গ্রন্থে বিধৃত।

৭। ডাইনী চরিত — ভারতী শ্রাবণ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ।

৮। রাজ-কাহিনী – প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

৯। মহারাণীর অন্ত্যেষ্টি সমারোহ — ভারতী, বৈশাখ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ।

প্রভাতকুমারের লেখালেখি ও ইউরোপীয় প্রবণতা:

বাংলা ছোটগল্পের পথচলার পথে রবীন্দ্রনাথের পরেই যাঁর নাম আমাদের কাছে উঠে আসে তিনি হলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি মূলত 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর গল্পগুলি প্রকাশিত হয় 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'মানসী', 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি পত্রিকার পাতায়।

প্রভাতকুমারের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নবকথা' প্রকাশিত হয় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে, পরে প্রকাশিত হয় 'ষোড়শী' (১৯০৬), 'দেশি ও বিলাতী' (১৯০৯), 'গল্পাঞ্জলি' (১৯১৩), 'গল্পবীথি' (১৯১৬), 'পত্রপুষ্প' (১৯১৭), 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৪), 'বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৬), ও 'জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩১) এর গল্প সংকলন। তবে গল্প সংকলনের পাশাপাশি 'রমাসুন্দরী' (১৯০৮)', 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২), 'রত্নদীপ' (১৯১৫), 'জীবনের মূল্য' (১৯১৭), 'সিঁদুর কৌটা' (১৯১৯)-এর মতো উপন্যাস রচনাতেও প্রভাতকুমার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অনন্য গল্পরীতি, কৌতুকরস সৃজন, ক্ষমতাপরায়ণ, উদার জীবনদৃষ্টি, ইচ্ছাপূরণের তৃপ্তি, সহজ সরল গার্হস্থ্যরস পরিবেশনে তিনি ছিলেন অনবদ্য। তাই এসম্পর্কে সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন "গল্প বলবার একটা সহজাত ক্ষমতা, precision এবং ঘটনা-সংস্থানের সুকৌশলে প্রভাতকুমার খুব সহজেই পাঠকের চিত্তে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন।" [৮]

প্রভাতকুমারের বিদেশি প্রেক্ষাপটের সংক্ষিপ্ত ধারণা:

প্রভাতকুমারের গল্পগ্রন্থগুলির দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখব, কতগুলি তিনি গল্প লিখেছেন যেগুলি ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে বা পটভূমিতে লিখিত। সেই সঙ্গে আমরা বলতে পারি, প্রভাতকুমারই প্রথম বাংলা গল্পের ভূগোলকে ভারত থেকে সুদূর লণ্ডন পর্যন্ত বিস্তৃত করলেন। বিদেশি পটভূমিকায় রচিত এই গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকে যেমন বিস্তৃতি প্রদান করেছে, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের পরিচয় করে দিয়েছে বিদেশি জীবনযাত্রা ও তাদের চরিত্রকে। প্রভাতকুমারের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নবকথা'-এর 'বেনামী চিঠি' (ভাদ্র, ১৩০৫, প্রদীপ) গল্পের মধ্যে দিয়েই তার শুভ সূচনা হয়েছে বলা যায়। দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'ষোড়শী'তে বিভিন্ন

রকমের মোট ষোলোটি গল্পটি আছে। এগুলির মধ্যে ‘ছদ্মনাম’ (মাঘ, ১৩০৮, ভারতী) গল্পটি ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। পরবর্তী তৃতীয় গল্পগ্রন্থ ‘দেশী ও বিলাতী’। এর ‘বিলাতি’ অংশের আছে চারটি গল্পেই ইউরোপীয় প্রেক্ষাপট রচিত। এই গল্পগুলি হল — ‘মুক্তি’ (আষাঢ়, ১৩১২, প্রবাসী), ‘ফুলের মূল্য’ (ভাদ্র, ১৩১২, প্রবাসী), ‘পুনর্মূষিক’ (কার্ত্তিক, ১৩১২, প্রবাসী), ‘প্রবাসিনী’ (আষাঢ়, ১৩১৬, প্রবাসী)। চতুর্থ গল্পগ্রন্থ ‘গল্পাঞ্জলি’-র ছয়টি গল্পের মধ্যে ‘বিলেতফেরতের বিপদ’ (আশ্বিন, ১৩১৮, বঙ্গদর্শন), ও ‘মাতৃহীন’ (চৈত্র, ১৩১৭, মানসী) গল্প দুটি ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। পঞ্চম গল্পগ্রন্থ ‘গল্পবীথি’ (১৯১৬) এই গল্পগ্রন্থে মোট আটটি গল্পের মধ্যে ‘লেডি ডাক্তার’ (আশ্বিন, ১৩২০, মানসী) ও ‘কুমুদের বন্ধু’ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২, ভারতবর্ষ) ইউরোপের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ ‘পত্রপুষ্প’ (১৩২৪ বঙ্গাব্দে)। এখানে মোট ছয়টি গল্প সংকলিত হয়েছিল। এই গল্পগুলির মধ্যে ‘কুকুর ছানা’ (আশ্বিন, ১৩২৩, মানসী ও মর্মবাণী) গল্পটি ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। পরবর্তী ‘বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প’ (১৯২৬), গল্পগ্রন্থেও মোট নয়টি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলির মধ্যে ‘সতী’ (বৈশাখ, ১৩৩২, মানসী ও মর্মবাণী) ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে লিখিত। এছাড়া ‘যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প’ (১৩৩৫ বঙ্গাব্দে) গ্রন্থের মোট সাতটি গল্পের মধ্যে ‘বিলাতী রোহিনী’ (১৩৩২) গল্পটি ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। এছাড়াও বিলেত প্রবাসকালে তিনি যেসমস্ত রচনা করেছিলেন তার তালিকা মোটামুটি এরকম ‘কলির মেয়ে’ (ভারতী, আশ্বিন ১৩০৮), ‘ধর্মের কল’ (ভারতী, আষাঢ় ১৩০৮), ‘প্রণয় পরিণাম’ (ভারতী,ভাদ্র ১৩০৮), ‘ছদ্মনাম’ (ভারতী, মাঘ ১৩০৮), ‘বাস্তুসাপ’ (ভারতী, বৈশাখ ১৩০৯), ‘সচরিত্র’ (ভারতী, ফাল্গুন ১৩০৮), ‘ভুল শিক্ষার বিপদ’ (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯), ‘এক দাগ ঔষধ’ (ভারতী, পৌষ ১৩০৮ পতন নামে প্রকাশিত) প্রভৃতি। আমরা এখন এইসমস্ত গল্প বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করব তাতে ঠিক কীভাবে ইউরোপ প্রসঙ্গ এসেছে।

প্রভাতকুমারের গল্পে ইউরোপীয় প্রবণতার বিশেষত্ব:

১। বিলেতি শিক্ষা ও প্রভাতকুমারের গল্প:

প্রভাতকুমারের গল্পগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গল্পের নায়কেরা প্রবাসী ছাত্র। বিলেত তথা ইউরোপে তারা পদার্পণ করেছে সেদেশের শিক্ষা অর্জন করতে। করণ সেই সময়ে বাঙালিদের মনের মধ্যে একটা ধারণা হয়েছিল যে, ইউরোপে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা না নিলে চাকরি বা অর্থ উপার্জন করা সম্ভব নয়। তাই ব্যারিস্টারি, সিভিল সার্ভিস, ইঞ্জিনিয়ারিং, ভেষজ-রসায়ন ইত্যাদি একাধিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে সাতসমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিলাতে পৌঁছাত। আবার এইসব বিষয়ের মধ্যে ব্যারিস্টারি ছিল সবার সেরা এবং সবার লক্ষ্য। কারণ ব্যারিস্টারিতে আয় উপার্জন ও সামাজিক মর্যাদা ছিল সবথেকে বেশি। আর যারা নেহাত ব্যারিস্টারিতে সফল হত না তারা বাকি অন্যান্য বিষয় নিয়ে ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরত। তবে এই বিলাতফেরতরা দেশে ফিরলে কখনও কখনও তাদের প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে প্রবেশ করতে হত। আবার কখনও তাদের আদর-আপ্যায়নেরও সীমা-পরিসীমা থাকত না। প্রভাতকুমারের একাধিক গল্পে এই বিষয়গুলি খুব সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

আমরা যদি গল্পগুলির দিকে তাকাই তাহলে দেখব, 'ছদ্মনাম' গল্পের সতীশ বাল্যকাল থেকে সাহেবিয়ানায় আকৃষ্ট। পরে সে বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরে। 'বেনামী চিঠি' গল্পে নায়ক রামসুন্দরের বাল্যকাল থেকেই বিলাত যাবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাবা-মায়ের আপত্তিতে সে কলেজে আইনবিদ্যা অধ্যায়ন করতে থাকে। এরপর ঘটনাচক্রে পূজার ছুটিতে শ্বশুরবাড়ি গেলে শ্বশুরই তার বিলাত যাবার বন্দোবস্ত করে দেন। কারণ শ্বশুরের পরামর্শ ছিল, এখানে যা দিনকাল পড়েছে তাতে বিলেত না গেলে কিছুই হবে না। ফলে সুযোগ বুঝে রামসুন্দর ভাবীকালের সুফল লাভের আশায় শ্বশুরের অর্থে পরদিনই বিকাল বেলা বিলাত যাবার সমস্ত কিছু ঠিক করে ফেলে এবং রাত তিনটার মেল-ট্রেনে বিলেত যাত্রা করে। পরবর্তীকালে রামসুন্দর, মিস্টার রামসুন্দর নাম নিয়ে বিলেত থেকে ফিরে এলাহাবাদের হাইকোর্টে ব্যারিস্টারের ব্যাবসা শুরু করে এবং তাতে দুই বছরের মধ্যেই পশার জমে যায়। 'কুকুরছানা' গল্পে বাবা ও শ্বশুর উভয়ই শরৎকুমারকে বিয়ে দিয়ে বিলেতে পাঠান ব্যারিস্টারি ও সিভিল

সার্ভিস পাস করার জন্য। আসলে সে সময় সিভিল সার্ভিস পাস বিলেত ফেরতরা যে সমাজে যথেষ্ট গুরুত্ব পেতেন তা 'প্রবাসিনী' গল্পে অতুলের ভাবনার মধ্য দিয়ে লেখক প্রকাশ করেছেন। অতুল তাঁর সিভিল সার্ভিস পাস বন্ধু হেমচন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন, 'সিভিল সার্ভিস পাস করিয়াছে, দেশে ফিরিয়া গেলে বিলাতফেরত-মাঝে হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে। বিবাহযোগ্য কন্যাগণের মাতারা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিবেন। নীলামের ডাকে সর্বোচ্চ দরে হেম নিজেকে বিক্রয় করিবে।'[৯] তবে ব্যারিস্টারি শিক্ষার পাশাপাশি 'কুমুদের বন্ধু' গল্পে দেখি, ভেষজ- রসায়ন চর্চার জন্য কুমুদকে তার পিতা বিলেতে পাঠান। আবার 'সতী' গল্পে ধীরেন ঘোষালকে তার বাবা ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন। কারণ তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং শিখলেই তার বাবা একটি জাহাজ নির্মাণের কারখানা করবে বলে স্থির করেছিল।

শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিলেতে বা ইউরোপ গেলে সকলেই যে তাতে সফলতা পেত এমনটা নয়। যেমন আমরা 'প্রবাসিনী' গল্পে দেখি, দুই বন্ধু হেমচন্দ্র দত্ত ও অতুলচন্দ্র মিত্র জুন মাসের গ্রীষ্মাবকাশে কলকাতা থেকে বিলেতে গিয়েছিলেন সিভিল সার্ভিস ও ব্যারিস্টারি পড়তে। তাদের মধ্যে হেমচন্দ্র দত্ত দক্ষতার সঙ্গে বিলাতে গিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যারিস্টারি শিক্ষায় এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়। কিন্তু অপর বন্ধু অতুলচন্দ্র মিত্র ছয় বছর বিলেতে থেকে পড়াশুনা করলেও বিশেষ কিছু সফলতা অর্জন করতে পারেনি। অতুলচন্দ্র থেকে যে এমনটাই হতে পারে তা অনেকটা জেনে-বুঝেই তার অভিভবকেরা বিলেতে পাঠিয়ে ছিলেন। তাই অভিভাবকের তরফ থেকে বলাই ছিল, 'বিলাতে পৌঁছিয়া সিভিল সার্ভিসের জন্যেও একবার চেষ্টা করিবে, বারেও নাম লেখাইবে। সিভিল সার্ভিসে কৃতকার্য হও উত্তম; না হও, ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিবে।'[১০] অতুলচন্দ্রের মতোই 'পুনর্মুষিক' গল্পেও ঠিক একই রকমভাবে বারীন্দ্র চ্যাটার্জিকে তার খুড়ো আইনবিদ্যা অধ্যয়ন করার জন্য বিলেতে পাঠিয়েছিলেন। তিনিও সফল হতে পারে নি। বিলাতে আসার দুই বৎসর হলেও সে এখনও পুস্তক কেনা, পড়া বা আইনের বক্তৃতা শুনার সুবিধা করে উঠতে পারেনি। তবে এবার দেশ থেকে টাকা এলে এইসমস্ত কিছুই করবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। যদিও তার এই প্রতিজ্ঞা তিনি কোনো দিনই রাখতে পারেনি। একইরকম 'মাতৃহীন' গল্পের কথক শরৎ মিত্রের ক্ষেত্রেও সেটাই দেখতে

পাই। তিনিও অধিক উপার্জনের আশায় ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতেই বিলেতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে দ্বিতীয়বারেও কৃতকার্য হতে পারে না। অবশ্য তাতে সামান্যতম আক্ষেপ বা অনুশোচনা কিছুই নেই। কারণ কথক নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা ও সেইসঙ্গে যুক্তি দিয়ে বলেছে, 'যে সারা বৎসর আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি নানা গুরুতর কার্যে নিরতিশয় ব্যস্ততা, প্রযুক্ত পাঠ অভ্যাসের মোটেই সময় পাই নাই। পাস হইতে পারিব না এই ধারণা পরীক্ষার পূর্ব হইতেই আমার ছিল এবং লিখিয়া আসিয়া সে মত পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন বিবেচনা করি নাই।'[১১] কিন্তু তাতেও কোন খেদ না থেকে বরং নিজেকে ভাগ্যবানই মনে করেছে। তার মনে হয়। "উঃ ভাগ্যিস ফেল হইয়াছি। নহিলে তো ব্যারিস্টারি পরীক্ষা দিবার মতি হইত না। বৎসরখানেক পরিশ্রম করিলেই সব পরীক্ষাগুলি পাস করিতে পারিব— টার্ম তো আমার কমপ্লিট করাই আছে। ব্যারিস্টারিতে বিপুল অর্থোপার্জন আমার অদৃষ্টে রহিয়াছে, বিধিলিপি কে খণ্ডাইতে পারে? আমার পিতা ব্যারিস্টারি করিয়া বিস্তর টাকা রোজগার করিয়াছিলেন— আমিও বাপকা বেটা হইব, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।"[১২] শুধু তাই নয় যারা সিভিল সার্ভিস পাস করেছে তাদের সম্পর্কে তার ভাবনা, "আহা বেচারিরা সারাজীবন খাটিলেও মাসে দুই তিন হাজার টাকার বেশি উপার্জন করিতে পারিবে না। আর দশ বৎসর পরে হাইকোর্টের সেই প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার, মক্কেলকুলের মাথার মণি, মিস্টার শরৎ মিত্র?"[১৩] আবার কোনো কোনো অর্থশালী বঙ্গীয় যুবক উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতে গিয়ে সেখানে লাগামহীন জীবন-যাপন করে বিপথগামী হত তার উদাহরণ 'বিলাতী রোহিনী' গল্পের নায়ক সুধাংশুশেখর।

২। বাঙালির বিলেত ভীতি ও প্রভাতকুমারের গল্প:

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালিসমাজের যারা বিলাতে যেতেন তাঁদের অধিকাংশেরই মনোগত অভিপ্রায় ছিল বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে স্বদেশে এসে অধিক অর্থ উপার্জনের পথ সুগম করা। প্রবাসী ছাত্র-যুবকের অনেকে ভবিষ্যত জীবনে সোনালী স্বপ্নে বিভোর হয়ে বিলেতে আত্মকেন্দ্রিক বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজ সংসারে সংস্কার বদ্ধমূল থাকার ফলে বিলাত প্রত্যাগতদের সেই সমাজ-সংসারে মেলা-মেশা করা সহজ

এবং স্বাভাবিক ছিল না। কারণ বাংলার রক্ষণশীল সমাজ কখনো কখনো এই বিলেতফেরতদের 'একঘরে' করে রাখত। তাই বিলেতফেরতদের 'প্রায়শ্চিত্ত' করে রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে আপস করে চলতে হত। তবে উনিশ শতকের শেষের দিকে উচ্চশিক্ষার কারণেই হোক বা সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণেই হোক, বঙ্গীয় রক্ষণশীল সমাজ তখন এই বিলেতফেরতদের সমাজচ্যুত করার পরিবর্তে তাদের প্রতি ক্রমশ সম্মান প্রদর্শন করতে থাকে। উল্লেখ্য, প্রভাতকুমার নিজেও এই 'জাত যাওয়া' সংস্কারের প্রকেপে পড়েছিলেন। শোনা যায়, এই সংস্কারের জন্য তিনি বাইরের বাড়িতেই বেশিরভাগ সময় থাকতেন কিন্তু দিনান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। মাতৃভক্ত প্রভাতকুমার কিছুতেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারতেন না।[১৪] প্রভাতকুমারের ব্যক্তি জীবনের এই অভিজ্ঞতার কথা তাঁর একাধিক ছোটগল্পে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে এসেছে— 'বিলেত ফেরতের বিপদ' গল্প তার একটি অন্যতম উদাহরণ বলা যেতে পারে। এই গল্পে বিলেত ফেরতদের সম্পর্কে নব্যব্রাহ্ম অতুলবাবুর বলেছেন— 'বিলেত-ফেরতরা কি সহজ লোক? এমন অপকর্ম নেই যা তারা বিলাতে গিয়ে করে না। আর, এখানে ফিরে এসেই বা কি? এক একটি মদের পিপে বল্লেই হয়। ... আর ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের যে কি রোগ হয়েছে— বিলাত ফেরত নইলে তাঁদের পছন্দই হয় না। কেন রে বাবু— যারা বিলাত যায়নি তারা কি মানুষ নয়?'[১৫] আর সমাজকর্তাদের এইরকম মনোভাবের কারণেই বিলেতফেরত ছেলেদের জন্য সেদিন সাধারণ পিতা-মাতাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। প্রভাতকুমারের লেখা 'বেনামী চিঠি' তাই দেখি, রামসুন্দরের পিতা-মাতা ছেলের বিলেত যাওয়ার কথায় নানাভাবে শঙ্কিত হতে থাকে। কথকের কথায়, 'সে তাঁহার এই বৃদ্ধ দশায় বুকে শেল মারিয়া বিলাত চলিয়া গেল? ভাবিলে— আর কি সে বাঁচিয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিবে? যদি ফিরিয়া আসে তবে জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত হইয়া আসিবে; তাহাকে আর ঘরে রাখিতে পারিব না— শ্রাদ্ধের পর্যন্ত সে অধিকারী থাকিবে না। হয়তো একটা খ্রিস্টানীকে বিবাহ করিয়া আনিবে, এমনও তো অনেক লোকে করিয়াছে। সকলই ইংরাজি শিক্ষার দোষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ...'[১৬] এরপর হরিবাবু চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে বিলাতফেরত বন্ধু হাইকোর্টের উকিল জীবনকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে ভূত-ভবিষৎ

জেনে নিয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হয়। বন্ধুর পরামর্শে টেলিগ্রাম মারফৎ হরিবাবু এলাহাবাদে ছেলের সন্ধান পেলেও এই টেলিগ্রামেই পরোক্ষভাবে তার ছেলের বিলেত যাওয়ার করণ হয়ে ওঠে। একইরকম বিলেত-ভীতি দেখতে পাই, 'বিলাতি রোহিনী' গল্পে। সুধাংশুশেখর বিলেতি মেমসাহেবকে বিয়ে করবে স্থির করে পিতামাতাকে চিঠি লিখলে তাঁরা প্রথমে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে এই ভেবে যে, ভবিষ্যতে আর পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডেরও আশা পর্যন্ত থকবে না। সেজন্য পরে বিলেতফেরত বন্ধুর পরামর্শে বন্ধুসহ সত্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় বিলেতে গিয়ে উপস্থিত হয় ও নানারকম কৌশল করে ছেলেকে বিলেত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

বাঙালির ইউরোপ ভীতির অন্যতম আর একটি কারণ হল বিলাতি সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব। প্রভাতকুমারের 'মুক্তি' গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র নরেন-এর মতো অনেক বাঙালি ছাত্র বিলেত যাওয়ার আগে পর্যন্ত 'অত্যন্ত নিরীহ, কিছু বোকাসোকা রকমের' থাকে। যাকে নিয়ে দেখতে 'নিতান্তই হিন্দুঘরের মা-মাসি-পিসির অঞ্চলের' বলে মনে হত। এমনকি পরিজনেরা লন্ডনে হারিয়ে যাওয়ার ভয় পেত। সেই তিনমাস লন্ডনে থাকার পর নিরামিষভোজী নরেনের মুখে এখন সর্বদা পাইপ, হুইস্কির গ্লাস পাশে থাকে। বন্ধুদের সঙ্গে পানশালার সঙ্গ থেকে অধিক রাত্রে যখন বাড়ি ফেরে, এতটাই নেশাগ্রস্থ হয় যে, বাড়ির অসুস্থ স্ত্রীর পাঠানো পকেটের চিঠিগুলি পর্যন্ত পড়ার সামর্থ্য থাকে না। ব্যাঙ্কের জমা রাখা টাকা শেষ করে আশ্রিতা ল্যান্ডলেডির কাছে পর্যন্ত বাকি করে। শেষ পর্যন্ত দেশ থেকে স্ত্রী নির্মলা বিলেতে এসে নরেনকে এইরকম সংকটময় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দেন।

৩। বাঙালির ইউরোপ প্রীতি ও প্রভাতকুমারের রচিত গল্প:

বাংলায় দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যবিত্ত সমাজের একটা বড় অংশ মানুষদের মধ্যে বিলেত-প্রীতি তৈরি হয়েছিল। এই মধ্যবিত্ত সমাজের অনেকেই সেদিন বিলেত পাড়ি দিয়েছিল। আবার অনেকের সেই সাধ থাকলেও সাধ্য না থাকায় তা সেই সময় পূরণ করতে পারেনি। পরবর্তীকালে নিজের ছেলেকে বা জামাইকে বিলেতে

পাঠিয়ে সেই স্বপ্ন পূরণ করতে চেয়েছেন। প্রভাতকুমার এইসমস্ত বিষয়কেই তাঁর গল্পের আঙ্গিনায় নিখুঁতভাবে তুলে এনেছেন।

প্রভাতকুমারের ‘বেনামী চিঠি’ গল্পে ছেলের শ্বশুর নিমাইবাবু এরকমই একজন চরিত্র। যিনি বিলেত যেতে না পারলেও সবসময়ই সাহেবিয়ানায় মুগ্ধ ছিলেন। তাই নিজের নিমাই লাল নামকে অদ্ভূতভাবে Nemye Loll বলে ইংরেজিতে উচ্চারণ করতেন। এবং পরিধানে হ্যাটকোটধারী, প্রণামের পরিবর্তে শেক্‌হ্যান্ড করেন, ইংলিশ ডিনারের ভয়ানক পক্ষপাতী। এই নিমাইবাবুর কাছে হঠাৎ এসে পরে জামাইয়ের পিতার টেলিগ্রাম, সেও কিনা বিলেত যাত্রা প্রসঙ্গে। টেলিগ্রামে লেখে রামসুন্দর বিলাত পালাবার আয়োজন করছে। তাকে যে করে হোক আটক কর। এতে খুব স্বাভাবিকভাবেই নিমাইবাবু অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় বলে— “তুমি বিলাত যাইবার ইচ্ছা করিয়াছ? বেশ তো— অতি উত্তম কথা।” এমনকি আরও বলেন, “... তোমার পিতা দায়ে পড়িয়া তোমাকে খরচ জোগাইবেন সত্য, কিন্তু তোমার আচরণে তিনি দুঃখিত ও রুষ্ট হইবেন। তাহাতে কাজ নাই। আমি তোমার সমস্ত খরচের ভার লইলাম। ... তুমি আমার নিজের টাকায় বিলাতের ব্যয় নির্বাহ কর।”[১৭] আবার ‘লেডি ডাক্তার’ গল্পের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ পুরাদস্তর সাহেব না হলেও “ভাবাপন্ন সাহেব”। তাই বাবু বললে রেগে না উঠলেও সাহেব বলে অবিহিত করলে খুশি হয়, ধুতি পরতে আপত্তি না থাকলেও পায়জামা-সুটই সুরুচিসম্মত মনে করেন এবং পাচক ব্রাহ্মণ থাকলেও খানসামা খলিল মিঞা মুরগি রান্নায় বেশি স্বাদ অনুভব করেন। এমনকি মা তার বিবাহ ঠিক করলে তিনি বলেন, “... তুমি যে পাত্রী স্থির করেছ, তাকে নয় মা। সে পুণ্যিপুকুর পুজো করা, বোধোদয় পড়া, ঘোমটা দেওয়া, আলতা পরা বউ আমার পোষাবে না। ইংরেজিতে কথা কয়, জুতো পায়ে দিয়ে খট্‌খট্‌ করে বেড়ায়, টেবিলে বসে খানা খায়, পিয়ানো বাজিয়ে গান গায়— এমন একটি বউ আমার চাই।”[১৮]

৪। বিলাত প্রবাসী বাঙালির স্বদেশ প্রীতি ও প্রভাতকুমারের রচিত গল্প:

প্রভাতকুমার বাংলা গল্পের পটভূমিকে ইউরোপে পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন, কিন্তু গল্পের পাত্র-পাত্রীরা প্রবাসী হয়েও বাঙালির নিজস্ব শিকড়ের টানকে ভুলতে পারেনি। তাইতো গল্পের নায়কেরা বিলেতি বিদ্যার সন্ধানে গিয়ে দেশীয় ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেছে বা বিলেত থেকে ফিরে এসে বাংলা ভাষায় গল্প ও উপন্যাস লিখেছে আবার কখনও বিলেতি নায়িকার মধ্যে সীতা সাবিত্রীর সন্ধান করেছে। 'ছদ্মনাম' গল্পে কথকের বন্ধু সীতেশ বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রচুর বাংলা বই পড়ে জ্ঞান আরোহণ করেছে। এবং দেশে ফেরার পর সাহেবিয়ানা করলেও ভালো ভালো গল্প ও উপন্যাস লিখেছে। কথককে সতীশ বলেছে, 'বিলাতে থাকিতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসিয়া সমস্ত ভালো বাঙলা বই মনোযোগের সহিত সে পাঠ করিয়াছিল। পড়ে লেখা অভ্যাস করিয়াছে। তাহার প্রথম উপন্যাস ''নন্দরানী'র সমালোচনা বঙ্গপ্রভায় বাহির হওয়া অবধি অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার কারণ, আগে জানিলে পাছে আমি তাহাকে অন্যায় প্রশংসায় বাড়াইয়া তুলি।'[১৯] একেইভাবে 'মাতৃহীন' গল্পের শরৎ সিভিল সার্ভিস ও ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসে বাংলা ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন।

বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে বিলেত ও বিলেতি রমণীর ব্যবহারে সাময়িকভাবে মুগ্ধ হলেও তাদের বাঙালি জাতির প্রতি দুর্বলতা ও বাঙালি স্বাজাত্যপ্রীতি সবসময়ই অটুট ছিল। তার প্রমাণ এই 'প্রবাসিনী' ও 'বিলাতী রোহিনী' গল্পে। প্রভাতকুমার 'প্রবাসিনী' গল্পে দুই বন্ধুর কথোপকথনে আমরা তারই পরিচয় পেয়ে থাকি— হেম হাসিয়া বলিল, "কি অবিচার। এমন সুন্দর সুন্দর ইংরেজের মেয়েরা হল কুমুদ কহ্লার, আর তোমার বাঙালীর মেয়ে হল পদ্ম?" [২০]

"নিশ্চয়। 'কোথায় এমন মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে।' রবি ঠাকুরের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে না কিসে পড়েছিলাম।"[২১] এরপরে অতুল স্বদেশের জাত্যাভিমানে সে দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকেও সারহীন থাকে, "আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন— এ দেশীয় ও ভারতবর্ষীয় ফুলের তফাৎ কি। এ দেশীয় ফুল অধিকাংশই চটকদার কিন্তু গন্ধশূন্য। ভারতবর্ষীয় ফুল দেখিতে তত বাহারে না হউক— কিন্তু সৌরভে ভরপুর! তেমন মিষ্টি গন্ধ এ দেশে কোন ফুলে নাই।"[২২] তাই শেষ পর্যন্ত

বিলাতে থেকেও জাহাজের পার্সেলে স্বদেশী মেয়ের নাম 'মিস লীলা রায়' দেখা মাত্রই পূর্বরাগ থেকে শুরু হয়। পরে তাকেই বিয়ে করে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে দেশে ফেরার সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আবার 'বিলাতী রোহিনী' গল্পে নায়ক, বিলেতি নোরাকে ভালোবাসে এবং এই নোরাকে সীতা-সাবিত্রীর পতিব্রতার তুলনা করে পিতার কাছে চিঠি লিখে বিয়ে করবে বলে পিতা-মাতার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।

এছাড়াও প্রভাতকুমারের গল্পের মধ্যে ইউরোপের মধ্যেই ভারতকে দেখা বা খুঁজে পাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এদিক থেকে 'ফুলের মূল্য' গল্পটি তুলনাহীন। প্রভাতকুমার এখানে একেবারে সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র এঁকেছেন। 'ফুলের মূল্য' গল্পে কথকের সঙ্গে লন্ডনের এক ভোজনশালায় আলাপ হয় অ্যালিস মার্গারেট ক্লিফর্ডের, সংক্ষেপে ডাকনাম ম্যাগি। তখনই তিনি অবাক হয়ে গেছেন যখন শুনেছেন এমন ইংরেজ মেয়েও আছে যে, সে দেশের বিখ্যাত 'Alice in Wonderland' শিশুপাঠ্য গ্রন্থের নামও শোনেনি। সঙ্গে সঙ্গে কথকের ভারতের অভাবগ্রস্ত পরিবারের কথা তার মনে হয়েছে। আসলে গরীব মানুষেরা স্থান-কাল নির্বিশেষে যে একইভাবে জীবন নির্বাহ করে তা যেন আরও একবার প্রত্যক্ষ করলেন। এরা ইউরোপ বা ভারতে একই। ম্যাগি সিভিল সার্ভিস ষ্টোর্সে টাইপরাইটারের কাজ করে সামান্য উপার্জন করে বলে কেবলমাত্র সপ্তাহে একদিন, শনিবারে সস্তায় লাঞ্চ খাবার জন্য আসে। তারা থিয়েটারে যাবার পয়সা পায় না। ম্যাগির মা ছেলের দীর্ঘদিন কোন খবর না পাওয়ায় ছেলেরই ভারত থেকে পাঠানো স্ফটিকের আংটি দেখে ছেলের সংবাদ জানতে চায় কথকের কাছে। ম্যাগি বলে, "মা এখন নিদ্রিত। তিনি অত্যন্ত পীড়িত। ডাক্তার বলিয়াছে ফ্রাঙ্কের সংবাদ না পাইয়া, দুশ্চিন্তায় পীড়া এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হয়ত তিনি বাঁচিবেন না।"[২৩] ম্যাগির মায়ের অনুরোধে কথক হিন্দুধর্মের ভারতীয় হওয়ায় অনেকটা মানবিকতার দায়ে পরেই ফ্রান্সিসের আংটিটি নিয়ে মিথ্যা ভবিষ্যদ্‌বাণী করে বলে আপনার পুত্র ভাল আছে, জীবিত আছে। যদিও বাস্তবে ফ্রান্সিস তার আগেই যুদ্ধে নিহত হন। ঠিক একইরকম চরিত্র হল 'কুমুদের বন্ধু' গল্পের দরিদ্র ইংরেজের মেয়ে এথেল। তিনিও সামান্য বেতনে হোটেলে কাজ করে এবং ইংরেজ মেয়ে হওয়ার সত্ত্বেও শেলির নাম পর্যন্ত শোনেনি। কুমুদের সঙ্গে আলাপচারিতায় আমরা দেখি—

কুমুদ বলিল— "তুমি শেলির নাম শুনিয়াছ ?"

" কে? তোমার কোনও বন্ধু বুঝি ?"

Goosie! — তিনি বিগত শতাব্দীর একজন মহাকবি ছিলেন।"

" বটে! — তা জানিতাম না।"[২৪]

অথচ এই এথেলেই কি উদার! কুমুদকে চরম বিপদ থেকে উদ্ধার করে অন্যের কাছে টাকা ধার করে দেশে পাঠিয়েছে। তখন কুমুদের মনে হয়েছে, "পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবার সময়, এ কে আসিয়া ছলছল নেত্রে আমার পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়? আমার স্বদেশীয়া নহে স্বজাতীয় নহে এমন কি আমার স্ববর্ণাও নহে— আমার কেহই নহে— ইহার এত ব্যথা কেন?"[২৫] স্বাভাবিকভাবেই এথেলের আচরণে বিস্মিত কুমুদনাথের মনে হয়। এখানে যেন আরও একবার কুমুদের মধ্যে দিয়ে লেখক বিদেশের মধ্যে স্বদেশকে খুঁজে পেয়েছেন। আবারও মনে হয়েছে ভারতের মতো এই ইউরোপেও তো কুসংস্কার বিশ্বাস করে, ইউরোপেও তো মানুষের অভাব অনাটন আছে, বিশ্বাস আছে, দয়া আছে, ভালোবাসা আছে— তাহলে ইউরোপ ভারত থেকে কোথায় আলাদা?

৬। ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে বাংলা তথা ভারত ও প্রভাতকুমারের রচিত গল্প:

ইউরোপীয়রা বাংলা তথা ভারতকে কখনও শ্রদ্ধা করতেন আবার কখনও অবজ্ঞাও করতেন। আবার কখনও জলা-জঙ্গলের দেশ, ম্যালেরিয়ার দেশ বলে ভাবতেন। আমরা প্রভাতকুমারের বিভিন্ন লেখায় মধ্যে দেখাতে চেষ্টা করব, ঠিক কীভাবে ইউরোপীয়রা ভারতকে দেখত। প্রথমে 'দেশী ও বিলাতী' গ্রন্থের 'পুনর্মূষিক' গল্পটির কথাই বলা যাক, এখানে মিস টেম্পেল ভারতবর্ষের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। তাই তিনি ভারতবর্ষ থেকে লণ্ডনে আগত বারীন্দ্রনাথকে শুধু পোষ্যপুত্র হিসেবেই গ্রহণ করেনি, তার সহযোগিতায় ভারতের হিন্দুধর্মকে ইউরোপে প্রচার করতে চেয়েছে। আমরা গল্পে মিস টেম্পলের স্পষ্ট কথা শুনতে পাই, "দেখুন, হিন্দুধর্মের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি। এই ধর্ম আমি য়ুরোপে প্রচার করিতে বাসনা করি।..."[২৬] আবার 'ফুলের মূল্য' গল্পে দেখি, ভারতবর্ষকে সাপ, বাঘ, জ্বর ও জঙ্গলের

ক্ষেত্র হিসেবে দেখেছে। ক্লিফর্ডের দাদা ফ্রান্সিস্ ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশে সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ছেলের সঙ্গে ক্লিফর্ডের মায়ের কথা না হওয়ায় কথকের কাছে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বারবার জানতে চান। ম্যাগি কথককে জানিয়েছে, "না, অনেক দিন কোনও পত্রাদি পাই নাই। সেই জন্য আমার মা অত্যন্ত চিন্তিত আছেন। তাঁহাকে লোকে বলে, ভারতবর্ষ সর্প, ব্যাঘ্র ও জ্বররোগে পরিপূর্ণ। তাই তিনি আশঙ্কা করিতেছেন, আমার ভ্রাতার কোনওরূপ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে। সত্যই কি ভারতবর্ষ সর্প, ব্যাঘ্র ও জ্বররোগে পরিপূর্ণ মহাশয়?"[২৭]

৭। ইউরোপীয়র বাঙালি প্রীতি ও প্রভাতকুমারের রচিত গল্প:

পরবর্তীকালে প্রভাতকুমারের ব্যারিস্টারিতে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে দত্ত মহাশয়ের সাহায্যে এবং মিস্ ম্যানিং-এর আনুকূল্যে আবেদন পত্রের অন্যতম শর্ত স্বরূপ দুইজন ব্যারিস্টারের সই যোগাড় করে নব্বই পাউণ্ড জমা দিয়ে Middle Temple-এ ভর্তি হন। মিস ম্যানিং-এর পরিচয় দিতে গিয়ে প্রভাতকুমার লিখেছেন— "সকলে অবগত না থাকিতে পারেন, মিস্ ম্যানিং লণ্ডনে ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের জননী স্বরূপা। ... তাহাদের মঙ্গলার্থ এই বর্ষীয়সী মাননীয়া মহিলার যত্ন ও উদ্যম অসাধারণ। বিপদে আপদে শরণাপন্ন হইলেই তিনি উদ্ধার করিয়া দেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মহিলা এখন পরলোকপ্রাপ্ত।"[২৮] পরবর্তীকালে এই মিস ম্যানিং-এর মতো ভারতীয় জননীদের একাধিকবার কথা প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে প্রভাতকুমারের লেখায়।

'দেশী ও বিলাতী' গ্রন্থের 'পুনর্মূষিক' গল্পটিতে মিস টেম্পেল এক উজ্জ্বল ইউরোপীয় মাতৃমূর্তি চরিত্র। তিনি শুধু ভারতবর্ষ থেকে লণ্ডনে আগত ছাত্র বারীন্দ্রনাথকে পোষ্যপুত্র হিসেবেই গ্রহণ করেননি— ভারতবর্ষের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও হিন্ধুধর্মকে শ্রদ্ধা করেন। মিস টেম্পলের স্পষ্ট ভাবে বারীন্দ্রনাথকে জানায় ভারতীয় হিন্দুধর্ম ইউরোপে প্রচার করার জন্য তাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করতে চায়। এবং সেই সঙ্গে এও বলেছেন, "আমার আর কেহ নাই। আমার সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী আপনি হইবেন। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, আপনার সমস্ত ব্যয় আমি নির্বাহ করিব, এবং সপ্তাহে দশ গিনি করিয়া আপনাকে পকেট খরচ দিব।

আপনাকে কঠোর অধ্যয়নে রত হইতে হইবে, এবং শুদ্ধাচারী হিন্দুর ন্যায় থাকিতে হইবে।”[২৯] এই সমস্ত শর্তে সময় নিয়ে সম্মতি জানিয়েই বারীন্দ্র মিস্ টেম্পলের পোষ্যপুত্র হয়ে তাঁর গৃহে বাস করতে থাকে। তার নাম হয় ‘বারীন্দ্র চ্যাটার্জি-টেম্পল’। মিস টেম্পল এই বারীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপে ভারতীয় দর্শন প্রচারও করতে চান। কিন্তু আমরা দেখি, বারীন্দ্র তাঁকে প্রতারণা করে। কারণ বারীন্দ্র মিস টেম্পেলের সামনে ভণ্ডধার্মিক সেজে থাকলেও গোপনে নিষিদ্ধ মাংস, মদ ও নারী লোভী হয়ে ওঠে। চোখের আড়ালে এইসব করলেও একসময় বারীন্দ্রের আসল মূর্তি ধরা পড়ে যায় মিস টেম্পেলের কাছে। কিন্তু ক্ষমাশীল টেম্পল বারীন্দ্রর তিন মাস সময়ের ক্ষতিপূরণ বাবদ একশত পাউণ্ডের একখানা চেক ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিদায় জানান। মিস্ টেম্পল নিজের হস্তাক্ষারে লেখেন—“কাল রাত্রে যাহা দেখিলাম মর্মাহত হইয়াছি। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অদ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। আমি আর তোমার মুখ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। অদ্য তুমি এ বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া যাইবে।”[৩০] এমন ক্ষমাশীল মাতৃমূর্তি বাংলাদেশেও বিরল বলা চলে।

‘কুকুরছানা’ গল্পে অন্য আর এক মাতৃসম আশ্রয়দাত্রী পাই, তিনি হলেন মিসেস কলিন্স। এই গল্পের মিসেস কলিন্স-এর মতো ল্যাণ্ডলেডি বা আশ্রয়দাত্রীরা সত্যেই আমাদের অভিভূত করেন। উনিশ ও বিশ শতকে যেসমস্ত বাঙালি তথা ভারতীয় ছাত্ররা বিদেশে পড়াশুনা করতে বিশেষত ইউরোপে যেতেন তাদের সেবাযত্নে এই সকল ল্যাণ্ডলেডিরা যে উদ্যোগ ও দায়িত্ববোধ দেখিয়েছিলেন তাতে করে তাঁদের প্রতি আমাদের আজও শ্রদ্ধা জেগে ওঠে। এই ল্যাণ্ডলেডিরা ছাত্রের মুখ দেখে মানসিক অবস্থা অনুভব করা, সুখ-দুঃখের ভাগীদার হওয়া, অর্থের পরিবর্তে ভালোবাসাকে বড় করে দেখা, এমনকি মানবিকতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া — এসবের মাধ্যমে আশ্রয়দাত্রীরা যেন মাতৃস্থান নিয়েছেন। ‘কুকুর ছানা’ গল্পের একটি অংশ উদ্ধৃত করলেই তা পরিষ্কার হবে —

> ‘শরৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, “কেন মিসেস জোন্স তুমি মিথ্যা কথা বলিলে কেন?”
>
> “আপনার অবস্থাটা কি বুঝিতে পারি নাই মহাশয়? আজ প্রাতে আপনার মুখ দেখিয়াই সে আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কেন? উহাদের কুকুর কীসের? এক পাউন্ড বা দুই

পাউন্ড দিয়া কিনিয়াছিল বলিয়াই উহাদের কুকুর? — ইঃ! টাকাই সব? ভালোবাসা কি কিছুই নয়?"

শরৎ বলিল, "তাহা হইলে তোমার মত এই যে, টাকা দিয়া প্রাণ কেনা যায় না, ভালোবাসা দিয়াই কেন যায়।"

"নহে তো কি! তাহা আমার মত—এবং যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, ঈশ্বর করুন, ততদিন ঐ মতই যেন আমার বজায় থাকে।" [৩১]

আশ্রয়দাত্রী হিসেবে 'মাতৃহীন' গল্পের মিস ক্যাম্বেল চরিত্রটির কথাও উঠে আসে। কলকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার চারুমিত্র ছিলেন তাঁর প্রেমিক। যিনি আবার কথক শরৎকুমারের পিতা। এই পরিচয়ে আরও এক বছর বিলাতে থাকা কালীন কথক শরৎকুমার অনেকবার এই মাতৃসমার কাছে যেতেন। এবং তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর খবর জানতে পেরে মিস ক্যাম্বেল নিজের হাতের বালা খুলে রেখেছিল হিন্দু সংস্কার বশত। পরে ছেলের বউকে পরার জন্য তা পাঠিয়ে দেন। শরৎকুমার দেশে ফিরে যখন জানতে পারেন মিস ক্যাম্বেল মারা গেছেন, তখন বলেন, "আমি দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হইলাম।"[৩২]

প্রভাতকুমারের অন্য একটি গল্প 'সতী' যেখানে ধীরেনের প্রেমিকা বিদেশিনী, নাম বার্থা ম্যাকজন। তিনিও নিজেকে হিন্দু প্রেমিকের ধর্মালম্বী নিজেকে ভাবেন। গল্পে দেখি, ধীরেন তার প্রেমিকাকে বিবাহ করতে চাইলে অন্য বিলেত প্রবাসী ভারতীয় বাঙালি দত্তসাহেব ধীরেনকে প্রথমে সাবধান করে বলেছিলেন, "ভায়া, এমন কার্যটি কোরো না। ওরা হল রাজার জাত, আমরা হলাম কালো আদমি— ওদের প্রজা।"[৩৩] যদিও দত্ত সাহেব মনে করেছিলেন, বার্থা ধীরেনের ধন-সম্পত্তি হাতানোর জন্যই ধীরেনকে মিথ্যা ভালোবাসার জালে জড়িয়েছে। কারণ 'বিলাতী রোহিনী' গল্পে দেখেছি, সেখানে নোরা সুধাংশুকে ভালোবেসেছি ঠিক অর্থ আত্মসাৎ করতেই। তার কাছে প্রেম বা ভালোবাসা অর্থ ছাড়া কোনো মূল্য ছিল না। কিন্তু বাস্তবে দত্তবাবুর এই ধারণা ঠিক নয় তা বুঝতে পারে, যখন তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত ধীরেনকে হাসপাতালে দেখতে যায়। বসন্ত রোগাক্রান্ত ধীরেনকে দিবারাত্রি নিজের জীবনের সর্বস্ব উজার করে দিয়ে, বসন্ত সংক্রমণকে উপেক্ষা করে, মায়ের বাধা এমনকি ডাক্তারের বারংবার

সাবধানতার সত্ত্বেও ধীরেনের আমৃত্যু বার্থা সেবা-শুশ্রূষা করে যায়। তাদের দেশি-বিদেশিতে ভালোবাসতে কোনো সমস্যা হয়নি। একসময় দু-জনে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল এবং বসন্তের মধ্যভাগে মে মাসে উভয়ে পরিণয়ে আবদ্ধ হবে বলে ঠিকও করেছিল। কিন্তু বিধি বাম! তাই তাদের বিয়ের মাসেই ধীরেন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। বার্থার নিজের মুমূর্ষু অবস্থায় ডাক্তারকে বলে যায়, "উনি আমার স্বামী এবং উনি হিন্দু। উনি যদি মরেন, আমি নিজেকে হিন্দু বিধবা বলিয়া মনে করিব— এবং সতী হইব।"[৩৪] শুধু তাই নয়, রোগশয্যায় শুয়েও প্রেমিক-স্বামী ধীরেনের কফিন ভালো জায়গায় আছে কি না তার খোঁজ নিয়েছে। এবং নিজের মৃত্যুর পর প্রেমিকের ইচ্ছাই শেষ ইচ্ছা হিসেবে জানিয়েছেন, "... দেখুন, আমি মরিলে আমাকেও যেন কবর না দেয়। আমিও দাহ হইব। এবং— বুঝিলেন?" এবং বার্থা মৃত্যুর প্রাক্ মুহূর্তে জানায়, "ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি, দেখা যাউক। দেখুন ধীরেনের সেই চেকের কথা। যদি আমি বাঁচি, ও চেক আমি লইব; যদি না বাঁচি, তবে ঐ টাকা এই হাসপাতালে, ধীরেনের স্মৃতিরক্ষার্থে দিয়া যাইব। ডাক্তারসাহেবকে আমি সে কথা বলিয়াছি।"[৩৫] বার্থা ম্যাকজন মনে প্রাণেই স্বামীর সমাজ-ধর্মে, নিজেকে ধীরেনের পরিবারের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে একাত্ব হয়ে থাকতে চেয়েছিল। ধীরেনর মা-বাপ আত্মীয়স্বজন বিলেতি মেয়েকে বিয়ে করলে বিরক্ত হবে শুনে বার্থা কখনও মেমদের মতো থাকতে চায়নি। সে চেয়েছিল ভারতীয় হয়ে, বাঙালি হয়ে বেঁচে থাকতে। তাই ভবিষ্যতে স্বামীর পরিবারের স্নেহ-ভালোবাসা পাওয়ার জন্যই ধীরেনের বোনদের ছবি দেখে শাড়ি ও সিঁন্দুর পরার কথা, হাতে খাওয়ার কথা, খালি পায়ে বেড়ানোর কথা বলেছিল। এমন বিদেশিনী ইংরেজ নারীচরিত্র বাংলা সাহিত্যে সত্যই দুর্লভ! শেষপর্যন্ত প্রেমিকের সাতদিন পরে বিদেশিনী বার্থা তার বাঙালি স্বামীর সঙ্গে অগস্ত্যযাত্রা করে শেষ মনের ইচ্ছা পূরণ করেন।

প্রভাতকুমারের 'কুমুদের বন্ধু' নামে আর একটি গল্পকে আমরা পাই, যেখানে এক ইউরোপীয় বিদেশিনী নিঃস্বার্থভাবে কুমুদকে অর্থ সাহায্য করে চরম বিপদ থেকে উদ্ধার করে। গল্পে দেখি, একসময়ের কলকাতার বিখ্যাত ঔষুধ ব্যাবসায়ী রজনীকান্ত সোমের মৃত্যুর পরে ব্যবসায় ভাঙ্গন ধরলে তাঁর লন্ডন প্রবাসী পুত্র কুমুদনাথকে টাকা পাঠানো বন্ধ হয়। এমতাবস্থায় চিঠির মারফৎ কুমুদনাথ জানতে পারে তার পিসেমশাই ও দোকানের ম্যানেজার যোগসাজ করে

দোকানের দেনার দায়ে বসতবাটিকে পর্যন্ত নীলামে দিয়েছে। ফলে অতি সত্বর দোকানটিকে বাঁচানোর জন্য তার বাড়ি ফেরা আবশ্যক। বাড়ি ফেরার জন্য পঁচিশ পাউন্ড টাকার দরকার হলে তার দেশীয় পরিচিত বন্ধুদের কাছে সাহায্য চেয়ে যখন উপযুক্ত সাহায্য মেলেনি, তখন হতাশ হয়ে লন্ডন শহরের বুকে নিঃসঙ্গ এই কুমুদনাথ একসময় পার্কে বসে আত্মহত্যা করবে বলে ঠিক করে। এথেল নামক ইংরেজ নারী ঠিক সেই সময়েই তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। অবশ্য এই এথেলের সঙ্গে পরিচয় কুমুদের মাত্র একমাস আগে হোটেলে খাওয়ার সময়, সেটাও খুব ঘনিষ্ঠভাবে নয়, সামান্যই। কুমুদের বাড়ি ফেরার জন্য পর্যাপ্ত পঁচিশ পাউন্ড টাকা সংগ্রহের চেষ্টার কথা জানায়। এথেল বলে, "দশ পাউন্ড আমার নিজেরই আছে; পোস্ট অফিসে আছে— যখন খুশি বাহির করিতে পারিব। বাকি ১৫ পাউন্ড আমি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিব। যদি আমি সফল হই, তাহা হইলে তুমিও সকল কুমতলব পরিত্যাগ করিবে তো?"[৩৬] শেষ পর্যন্ত এথেল কুমুর জন্য টাকা সংগ্রহ করে দেয় ও একসঙ্গে ডিনার খেয়ে সন্ধ্যা আটটায় কুমুকে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে ট্রেনে তুলে দেয়।

ইউরোপীয় সমাজের কিছু বিদেশিনী বাঙালিদের অর্থ আত্মসাৎ করতে বা নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে যেমন নানা রকমের ছলাকলার ও প্রেমের অভিনয় করত, তেমনি কিছু বিদেশিনীর নিঃকলুষ প্রেমের চিত্রও আমরা দেখতে পাই। এরই পাশাপাশি কোনোরকম স্বার্থ ছাড়াই শুধুমাত্র বিপদের বন্ধু হিসেবে পাশে দাঁড়াতেও এই ইউরোপীয় বিদেশিনীর চিত্র পেয়ে থাকি। আসলে প্রভাতকুমার যেন, ইউরোপীয় সমাজ পরিবেশের মধ্যে ভারতীয় সমাজ মানুষের ভালো-মন্দ সবদিক দেখেছেন এবং দেখাতেও চেয়েছেন। তিনি যেন কোথাও একটা মৃদুস্বরে বলতে চেয়েছেন, ইউরোপের সঙ্গে ভারতের খুব বেশি তফাৎ নেই — শুভ অশুভের সহাবস্থান পৃথিবীর সর্বত্রই।

৮। প্রভাতকুমারের রচিত গল্পের মধ্যে ইউরোপীয় সংস্কৃতির পরিচয়:

প্রভাতকুমারের রচিত গল্পগুলির মধ্যে আমরা কিছু কিছু নিপাট ইউরোপীয় গার্হস্থ্য সংস্কৃতি অর্থাৎ খাদ্যাভ্যাস, রেস্তরায় খাওয়া, শ্যাম্পেন পান করা, গৃহসজ্জা, আসবাবপত্র গোছানো, গ্রীষ্মকালে সমুদ্রে হাওয়া বদলাতে যাওয়া, কার্ড দিয়ে নিজের ঠিকানা জানানো, বিশেষ একটি সময়ের খাবারের নিমন্ত্রণ করা ও সময় সচেতনতার কথা, সমাধির উপর ফুলের মালা শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা ইত্যাদির পরিচয় পেয়ে থাকি। রাত্রে মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে কতটা পুড়েছে তাই দেখে পরের দিন রাতে ফেরার সময় নির্ণয় করা, বিলাতি গৃহের দরজার নানা রকম কৌশল ও চাবি খোলার কায়দা প্রভৃতি খুব সুন্দর করে চিত্রিত হয়েছে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, প্রভাতকুমারের গল্পগুলিতে স্বাদের ভিন্নতার কারণ হল পরিবেশের বৈচিত্র্য, চরিত্রের বৈচিত্র্য। এই চরিত্রের বৈচিত্র্য অবশ্য নিতান্ত বাইরের। প্রভাতকুমারের বিদেশি পরিবেশের গল্পে কোনও exotic বা বহিরাগত স্বাদ নেই, আবহাওয়াও আমাদের পরিচিত। পরিচিত গার্হস্থ্য জীবন, বাঙালি মায়ের হৃদয় তাঁর বিদেশি পটভূমির গল্পে। মানবিকতার এই গভীর স্পর্শ তাঁর কতগুলি গল্পকে তাই বিশিষ্টতা দিয়েছে। ইংরেজ মধ্যবিত্ত পরিবারের ‘কুকুরছানা’ গল্পের সেই অবুঝ ছোট মেয়েটির আবদার, লন্ডনের তুষার বৃষ্টির বর্ণনা ও হাইড পার্কে বেঞ্চির ভাড়া, ‘ফুলের মূল্য’ গল্পে জননী ও ভগিনীর Basement হল রান্নাঘর, আর সেই ঘরে কেকের গন্ধ, ‘Alice in Wonderland’ বই উপহার দেওয়া, এবং ‘মুক্তি’ গল্পে সদ্য আগত ভারতীয় ছাত্রের অস্বস্তি ও পরে উদ্‌গতপক্ষ পতঙ্গের মতো আচরণ — সমস্ত বর্ণনাই সার্থক। বিলেতের এত নিখুঁত ও জীবন্ত বর্ণনা অন্য কোনো বাংলা গ্রন্থে এত সার্থকভাবে নেই। বেজোয়াটারেরর রুমস্‌, লাডগেট সার্কাসে টমাস কুকের অফিস, মার্বল আর্চ, সার্পেনটাইন দীঘি, ভিক্টোরিয়া স্টেশন— সমস্তই যেন স্বাভাবিকভাবে কাহিনির মধ্যে এসেছে— কোথাও আরোপিত মনে হয় না।

ইংরেজ জাতিকে জানার ও বোঝার এক নিদর্শন তাঁর সাহিত্যে। ইংরেজ ও ভারতবাসীর সংযোগের ফলে বহু কাহিনি ও বহু উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। বিদেশী জীবনের ঘরোয়া ও অন্তরঙ্গ রূপটিকে স্বদেশী ভাষায় ধরে রেখে দুই জাতির প্রাণের সেতুবন্ধ রচনা করে গেলেন

প্রভাতকুমার তাঁর কিছু গল্পে। অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায়, "ইওরোপের পটভূমিতে প্রভাতকুমার যে-সব গল্প লিখেছেন— তাদের মধ্যেও তাঁর বৈশিষ্ট্যটি অব্যাহত আছে। একমাত্র ঘটনাস্থলের পার্থক্য ছাড়া তাঁর অধিকাংশ গল্পই যেন বাংলা দেশের পারিবারিক ও হৃদয়ক্ষেত্রের কাহিনী। মনে হয়, প্রভাতকুমার যেন বাঙালি চরিত্রগুলিকেই ইংরেজের ছদ্মবেশ পরিয়ে দিয়েছেন।"[৩৭] আসলে প্রভাতকুমারের ইউরোপের মধ্যে আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের সহজ স্নিগ্ধ ও রমণীর রূপটিকে খুঁজে পাই। সেখানে বিদেশি ল্যান্ডলেডির সেবা-যত্ন, বিদেশি বন্ধু, ভারতীয় ছাত্রের প্রেম, বিদেশির ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি হয়ে উঠেছে গল্পের বিষয়। আসলে তিনি ইউরোপীয় মানুষের মধ্যেই ভারতীয় মানুষের হৃদয়কে পেয়েছেন। আর ইংরেজের রমণীর মধ্যে ভারতীয় জননীর স্নেহ-ভালোবাসাকে খুঁজে পেয়েছেন। একজন মধ্যবিত্ত দরিদ্র ইউরোপীয়র হৃদয় বাঙালি হৃদয়ের মতোই একেই ব্যথায় ব্যথিত, একেই আনন্দে আনন্দিত— একথাই যেন প্রভাতকুমারের এই গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। বিলেতের পটভূমিকায় লিখিত প্রভাতকুমারের গল্পগুলি সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও প্রায় একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন— 'প্রভাতকুমার ইংরেজ-জীবনের যে দিক আঁকিয়াছেন তাহা আমাদেরই মতো স্নেহ-প্রেমে কমনীয়, আশঙ্কা-দুর্বল, বিরহ-মিলন-ব্যাকুল। এখানে রাজনৈতিক হিংসা-দ্বেষের চিহ্ন নাই, বিজেতা-বিজিতের অহংকার-আত্মগ্লানি নাই— এখানে সমস্ত বৈষম্য, ভেদবুদ্ধি অতিক্রম করিয়াসর্বদেশসাধারণ মানব-হৃদয়ের মিলনক্ষেত্র রচিত হইয়াছে।'[৩৮]

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তি জীবন:

প্রমথ চৌধুরী হরিপুরের সম্ভ্রান্ত চৌধুরী পরিবারে ১৮৬৮ সালে যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দূর্গাদাস চৌধুরী ছিলেন হরিপুরের চৌধুরী পরিবারের ছোট কর্তা। যিনি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হওয়ার সত্ত্বেও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রের পদ অর্জন করেছিলেন এবং কর্মক্ষেত্রে তিনি স্বধীন বিচারবুদ্ধি ও দৃঢ়চেতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দূর্গাদাসবাবুর পারিবারিক ক্ষেত্রে সংস্কারহীনতা, উদারতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি থাকার দরুন তিনি তাঁর পুত্রকন্যাদের যুগোপযোগী মানস গঠনের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রসন্নময়ীর শিক্ষার জন্য ফিরিঙ্গি শিক্ষিকা রেখেছিলেন এবং জ্যেষ্ঠপুত্র আশুতোষ চৌধুরীকে সেকালের সমস্ত রকমের রক্ষণশীলতা ও জাতি সংস্কারের বিরুদ্ধে গিয়ে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে। দুর্গাদাসবাবু এব্যাপারে কতটা সফল হয়েছিলেন সেটা প্রমথ চৌধুরীর নিকট আত্মীয় স্বজনদের একটু পরিচয় দিলেই স্পষ্ট হবে। প্রমথ চৌধুরীর দাদা আশুতোষ চৌধুরী এম.এ, বি.এ,এল.এল.এম, অ্যাডভোকেট ও কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। দ্বিতীয় দাদা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বি.এ, এম.এ, বার-অ্যাটল, ব্যারিস্টার। তৃতীয় দাদা কুমুদনাথ চৌধুরী এম.এ, বার-অ্যাটল, ব্যারিস্টার। চতুর্থ দাদা মন্মথনাথ চৌধুরী— সিভিল সার্জন, আই. এম.এস। প্রমথ চৌধুরী এমনই এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই প্রমথ চৌধুরী পরবর্তীকালে তাঁর 'আত্মকথা'য় বলেছিলেন, 'আমরা সব ভাই-ই হয়ে উঠেছিলুম প্রায় আধা-বিলেতফেরত, যদিচ আমরা বিলেতি পোশাক পরতুম না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমরা যেমন reformed Hindus ছিলুম, তেমনি reformed স্বদেশি হয়ে উঠেছিলুম।'[৩৯]

প্রমথ চৌধুরীর মানস গঠনে ইউরোপীয় প্রভাব:

প্রমথ চৌধুরী খুব অল্প বয়স থেকেই বিদেশি সাহিত্যের আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছিলেন। তাঁর পিতা হিন্দু কলেজের ছাত্র হওয়ার সুবাদে বাড়িতেই ইংরেজি বইয়ের বিরাট সংগ্রহ ছিল। সেই বইগুলির মধ্যে দেশ-বিদেশের ইতিহাস, স্কটের উপন্যাস, শেক্সপীয়ার-মিলটন-বায়রন্ এবং

আরও বহু লেখকের বই ছিল। এছাড়া তাঁর ভাইয়েরা সকলেই ছিলেন কৃতবিদ্য। জ্যেষ্ঠভ্রাতা আশুতোষ চৌধুরী ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে বিলেতে গিয়ে পাঁচ বছর পর ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফিরে আসেন। আর এরপর থেকেই চৌধুরী মহাশয়ের মনোজীবনের ওপর সাহিত্যের সাত-সমুদ্রের আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রমথ চৌধুরীর ফরাসি সাহিত্যেরও হাতে খড়ি হয়েছিল এই সময় থেকেই। প্রমথ চৌধুরী নিজেই বলেছেন, 'দাদার সঙ্গে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর আমার জীবন ও মনের মোড় ফিরে গেল। দাদা যে সব নূতন লেখকের বই নিয়ে এসেছিলেন, আমি পূর্বে তাদের নাম শুনিনি, - যথা রসেটি ও সুইনবার্ণ প্রভৃতির কবিতা। আর ছবি সম্বন্ধে Pre-Raphaelite art-এর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই। দাদার বাড়ির আবহাওয়া Aesthetic ছিল।'[৪০] পাঁচ বছর বয়সে যশোরেই প্রমথ চৌধুরীর প্রথম লেখাপড়ার সূচনা হয়। যদিও এই বয়স থেকেই তার একাধিক স্কুল পরিবর্তন হতে থাকে। প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, পরে হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করার পর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কৃষ্ণনগর ও প্রেসিডেন্সী থেকে এফ এ, বি.এ. ও এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

প্রমথ চৌধুরীর বিলেত যাত্রা:

প্রমথ চৌধুরী তাঁর বিলেত প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতার কথা 'আত্মকথা' গ্রন্থে অনেকখানি বলেছেন। সেই 'আত্মকথা'য় আমরা জানতে পারি, তাকে বিলেত পাঠাতে তাঁর দাদা খুব উৎসাহের সঙ্গে সেখানকার পরিবেশ ও শিক্ষা ব্যবস্থাসহ আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিয়েছিলেন, যাতে করে প্রমথ চৌধুরীর বিলেতযাত্রার আগ্রহ জন্মায়। তাঁর নিজের কথায়, 'তিনি বলেন, ও একবার বিলেতে গেলে he will get a fresh lease of life. আমাকে তিনি বলেন, 'বিলেত গিয়ে যেন কোন য়ুনিভারসিটিতে ভরতি হয়ো না; তা হলে তুমি এ দেশে যেমন কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেছ, সেই রকম পাস করবার চেষ্টা করবে, আর তাতে তোমার শরীর আরও ভেঙে পড়বে। ব্যারিস্টারি পাশ করা কিছু নয়, সে পরীক্ষায় তুমি অনায়াসে উতরে যাবে। ... অবশ্য আমি কোন ডিগ্রি নিয়ে ফিরিনি, ফিরেছিলুম কতকটা হৃষ্টপুষ্ট এবং ব্যারিস্টারি পাস করে।''[৪১] এর ফলে নিজের খুব আগ্রহ না থাকলেও ১৭ই অক্টোবর তিনি

P & Q কোম্পানির জাহাজে চড়ে বিলেতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তারপর জাহাজে 'সি-সিকনেস'-এর প্রচণ্ড কষ্ট কাটিয়ে Red Sea থেকে সুয়েজ খাল, ভূমধ্যসাগর হয়ে লন্ডনে পৌঁছান। সেখানে তিনি প্রথমে ইউরোপীয় শহর দেখেছিলেন মার্সেই এরপর প্যারিস, ফ্রান্সের একাধিক স্থান দেখেন। বিলেতে যেতে যেতে তিনি রাত্রের অন্ধকারে দেখেছিলেন, প্যারিসের রাজপথে আলোর ছবি যা তিনি বৃদ্ধ বয়সেও ভুলতে পারেন নি। আর ইতালির স্থাপত্য শিল্পের আশ্চর্য নিদর্শন ও আরও একাধিক শিল্পকর্ম প্রমথ চৌধুরীকে মুগ্ধ করেছিল। তবে এটাও মনে রাখা দরকার যে প্রমথ চৌধুরী বিলেতের সবকিছুই নির্বিচারে গ্রহণ করেন নি। যদিও সেই বিলেতবাস তাঁর পরবর্তী জীবনের কতটা উপকারে এসেছিল সেই সম্পর্কে তিনি নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'বিলেত যাওয়াটা আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বিলেতে না-গেলেও আমি এখন যা আছি তা-ই থাকতুম।'[৪২] অবশ্য তিনি একথা বললেও ইউরোপের বিভিন্ন চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতা অর্জন তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বেশ প্রভাব ফেলেছিল বলা যায়। যার জন্য পরবর্তীকালে কোন কোন সাহিত্য সমালোচক তাকে 'বিলেতফেরত বলে খোঁটা' দিয়ে থাকেন। কারণ তিনি মনে করতেন, আমাদের মানসিক চেতনার মূলে আছে ইউরোপীয় প্রভাব। তাই তিনি বলেছেন, 'ইউরোপ আমাদের মনকে নিত্য ঝাঁকুনি দিচ্ছে, তাতে ঘুমের ব্যঘাত ঘটে ইউরোপের সাহিত্য, ইউরোপের দর্শন, মনের গায়ে হাত বুলোয় না, কিন্তু ধাক্কা মারে। ইউরোপের সভ্যতা অমৃতই হোক, মদিরাই হোক, আর হলাহলই হোক তার ধর্মই হচ্ছে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির থাকতে দেওয়া নয়। এই ইংরেজি-শিক্ষার প্রসাদে, এই ইংরেজি-সভ্যতার সংস্পর্শে আমরা দেশশুদ্ধ লোক যেদিকে হোক কোনও একটা দিকে চলাবার জন্য এবং অনেককে চালাবার আকুবাঁকু করছি। ... ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর কিছু না-হোক, গতিলাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করেছি।'[৪৩] বলাবাহুল্য, প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যেও সেই ইউরোপীয় ভাব-ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর সমালোচকদের এ অপবাদ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় তা তিনি নিজেই 'আত্মকথা'য় স্বীকার করেছিলেন। কারণ তাঁর গদ্য লেখাগুলি পদ্যলেখাগুলির থেকে অনেক বেশি ইউরোপীয় ভাব-ভাবনা কেন্দ্রিক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য,

প্রভাতকুমারের বিলেতযাত্রার পাঁচ বছরের ব্যবধানে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে সে দেশে থাকার অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে প্রমথ চৌধুরী লেখেন —

> "তোমার ল্যান্ডলেডি Mrs. Smith।"
>
> "বল কি! সে তো আমাকে মায়ের মতো ভালোবাসত! আমি চলে আসবার দিন তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।"[৪৪]

প্রমথ চৌধুরী ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরলেও তিনি মন দিয়ে কোথাও প্র্যাক্টিস করেননি। এর অন্যতম কারণ হতে পারে তাঁর ব্যক্তিজীবনের শৌখিনতা ও সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ বড়োমানুষী চালচলন এবং পরের অধীনে কাজ না করার প্রবণতা। যার জন্য তিনি প্রথম জীবনে মাসিক পাঁচশ টাকা বেতনের বহরমপুর কলেজ ও পরে কোচবিহার কলেজের প্রিন্সিপালের চাকরি নিতে অস্বীকার করেছিলেন। পরে অভাবের দিনে ব্যারিস্টারি প্র্যাকটিস শুরু করলেও নিজের পেশার প্রতি ততটা আগ্রহী হতে পারেননি। পরিবর্তে তিনি কখনও টাকা ধার করে, কখনও অন্য কোন কাজ করে চলার চেষ্টা করতেন। তারপর প্রথমে ল-কলেজে প্রফেসর, দক্ষিণেশ্বরের রিসিভরি করে এবং সবশেষে গোপাললাল শীল এস্টটের রিসিভরি করে সংসার নির্বাহ করেছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সাধনায় ইউরোপ প্রসঙ্গ:

ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে পারদর্শী বিলাতফেরত ব্যারিস্টার প্রমথ চৌধুরী সমাজের কাছে 'চৌধুরী সাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন। এই 'চৌধুরী সাহেবে'র পক্ষে বাংলা সাহিত্যচর্চা এক আশ্চর্য ঘটনা বলা চলে। প্রমথ চৌধুরীর প্রথম অনূদিত গল্প 'ফুলদানি' সাহিত্য পত্রিকায় ১২৯৮ সালে এবং প্রথম মৌলিক গল্প 'প্রবাস স্মৃতি' প্রকাশিত হয় ভারতী পত্রিকায় ১৩০৫ সালে। তবে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সাধনায় বিশেষ করে, গল্প রচনায় সার্থকতার মূলে আছে 'সবুজ পত্র' (১৯১৪-১৯২৭) পত্রিকা। এই পত্রিকার লেখক গোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যে আবেগের পরিবর্তে যুক্তি এবং উচ্ছ্বাসের চেয়ে সংযমকে আনতে চেয়েছিলেন। পত্রিকাটির অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল ইউরোপীয় ভাব-প্রবণতার সঙ্গে দেশীয় সাহিত্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপনা করা। তাই সম্পাদক

প্রমথ চৌধুরী এ সম্পর্কে বলেছেন, ইউরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে আমাদের সাহিত্যের যে মুক্তি, স্ফূর্তি ও সচলতার গতি এসেছে তাকে অবরুদ্ধ না করা। সেইসঙ্গে তিনি একথাও বলেন, ইউরোপীয় শিক্ষাই আমাদের অতীত গৌরবের পাশাপাশি ভবিষ্যতের স্বপ্নকেও চিনিয়েছে। তাই আমাদের উচিত দেশকালের সীমারেখাকে অতিক্রম করে সর্বকালিক ভাবকে অবলম্বন করে নিজের দেশের এক নতুন সাহিত্য গড়ে তোলা। বলা বাহুল্য, প্রমথ চৌধুরী সেই কাজটিই করে গেলেন তাঁর 'সবুজপত্র' পত্রিকায়। প্রকাশিত হতে থাকে একের পর এক নতুন আঙ্গিকে নতুন স্বাদের গল্প। যদিও আর্থিক সংকটের কারণে প্রমথ চৌধুরী পত্রিকাটিকে কিছুদিন পরেই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

'সবুজপত্র' পত্রিকাটি প্রকাশের পূর্বে তিনি তেমন কোনও মৌলিক গল্প রচনা না করলেও এর দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই বেশকিছু গল্প প্রকাশ করতে শুরু করলেন। ফলে পাঠকের হাতে এসে পৌঁছাতে শুরু করল একে একে 'চার-ইয়ারী কথা' (১৯১৬), 'আহুতি' (১৯১৯), 'নীললোহিত' (১৯৩২), 'নীল-লোহিতের আদি প্রেম', 'ঘোষালের ত্রিকথা' (১৯৩৭) ও 'আশুকথা' (১৯৩৯) -র মতো একাধিক শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি। এছাড়াও আমরা পরবর্তীকালে প্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর 'গল্প-সংগ্রহ' গ্রন্থ পেয়ে থাকি। এখানেও প্রায় ৩৮টি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের গল্প সংকলিত হয়েছে। এইসব গল্পগুলির মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর ইউরোপ সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তাঁর এরকম গল্পগুলি হল— 'ফুলদানী', 'প্রবাসস্মৃতি', 'চার-ইয়ারী কথা', 'প্রিন্স', 'মেরি ক্রিসমাস্', 'ধ্বংসপুরী', 'অদৃষ্ট', 'ঝাঁপান খেলা', 'বীরপুরুষের লাঞ্ছনা', 'গল্পলেখা', ভূতের গল্প', 'ভাববার কথা', 'পূজার বলি' ইত্যাদি। এখন আমরা প্রমথ চৌধুরীর এই গল্পগুলি বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করব যে, গল্পগুলিতে ইউরোপীয় প্রসঙ্গ ও অনুসঙ্গ কতটা এসেছে, আর এলে তা কীভাবে এসেছে?

'ফুলদানী' (১২৯৮):

প্রমথ চৌধুরীর জীবন ও সাহিত্যে প্রথম থেকেই বিদেশি সাহিত্যের বিশেষত ফরাসি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের গভীর পরিচয়ের পাশাপাশি শৈশব থেকেই বাড়ির পরিবেশের মধ্যে নানা ভাবে তাঁর ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল। শুধু তাই নয়,

তিনি ছোটবেলা থেকেই দাদার সহযোগিতায় ফরাসি সাহিত্য পড়তেন এমনকি অনুবাদ পর্যন্ত করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর গল্পলেখার হাতে খড়ি হয়েছে Prosper Merimee-র 'Etruscan Vase' নামে একটি ফরাসি গল্পের অনুবাদের মধ্য দিয়ে। এই গল্পটির নাম 'ফুলদানী'। গল্পটি প্রকাশিত হয় 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১২৯৮ সালে। গল্পটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ গল্প রচনার ধারা সেদিন আধা মুক্তি পেয়েছিল। যদিও গল্পটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ সেসময় 'সাধনা' পত্রিকায় নৈতিকতা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। সেই সমালোচনার করার দুটি কারণের কথা প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'আত্মকথা'য় উল্লেখ করেছেন। এই দুটি কারণ হল, প্রথমত 'ফুলদানি'র মত গল্প বঙ্গসাহিত্যের অন্তর্ভূত করা অনুচিত বলে; দ্বিতীয়ত, 'পাকা ফরাসী লেখকের অনুবাদে শ্রীভ্রষ্ট করা হয়েছে বলে।' অবশ্য প্রমথ চৌধুরী এই অভিযোগের উত্তরে বলেছেন, "আমি প্রথমে কলম ধরেই ফুলদানী নামে একটি গল্প ফরাসী থেকে অনুবাদ করি। সে গল্প যে পুনর্মুদ্রিত করিনি, তার কারণ, গল্পটি একটি প্রসিদ্ধ গল্প হলেও, আমার কাঁচা হাতের স্পর্শে তার যথার্থ রূপ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গল্পটি লেখক Maupassant নন— Merimee নামক তাঁর পূর্ববর্তী জনৈক খ্যাতনামা সাহিত্যিক। ... এরপর বাঙালি লেখকেরা Maupassant-এর বহু গল্প বাংলায় অনুবাদ করেন। আমি যদি এক্ষেত্রে কোনো পথ দেখিয়ে থাকি, তবে তা অনুবাদের পথ। কিন্তু এই অনূদিত বিলেতি গল্পগুলি বঙ্গ সাহিত্যের অঙ্গ বলে গ্রাহ্য হয়নি।" [৪৫] আসলে প্রথম থেকেই তিনি নিজের লেখার ও অভীষ্ট লক্ষ্যের প্রতি ছিলেন অবিচল। কারণ তিনি মনে করতেন সাহিত্যে জীবনের বিচিত্র লীলাই প্রকাশিত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তির এহেন সমালোচনার সত্ত্বেও নিজের কলম চালিয়ে গেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর লেখার মধ্যে এসেছে পরিহাসবোধ ও বিদ্রূপাত্মক রুচি, ভাবালুতাবর্জিত ও সংস্কারহীন মনোভাব, উজ্জ্বল ও চটুল বুদ্ধির পাশাপাশি সচ্ছল, স্বচ্ছন্দ ও সতেজ রূপ। আর সবমিলিয়ে তাঁকে খুব অল্পসময়ে খ্যাতির আসরে পৌঁছে দিয়েছিল।

প্রবাসস্মৃতি (১৩০৫):

প্রমথ চৌধুরীর প্রবাস জীবনের অর্থাৎ ইউরোপের অক্সফোর্ডে পড়াকালীন সময়ের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা একাধিক গল্পে নানাভাবে উঠে এসেছে। 'প্রবাসস্মৃতি' প্রমথ চৌধুরীর এমনই একটি গল্প। এছাড়া এটি তাঁর প্রথম মৌলিক গল্পও বটে। এই গল্পটির পটভূমি ইংল্যান্ড এবং এর নায়ক-নায়িকা ইংরেজ, শ্বেতদ্বীপ বাসিনী। গল্পটিতে গল্পকথক ও তার বন্ধু বসন্তকালে অক্সফোর্ড পার্কে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার বিলেতি পার্কের সৌন্দর্য, নরনারীদের প্রেম-ভালোবাসা নিবেদন, নারীর প্রতি আসক্তি ও নিজেদের যৌবনের উদ্দাম শক্তির বিকাশ ইত্যাদির কথা উঠে এসেছে। সৌন্দর্য পিপাসু প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'প্রবাসস্মৃতি' গল্পে পার্কে বেড়াতে গিয়ে সেই সৌন্দর্যসত্র দেখে ছিলেন। এছাড়াও সেখানে একাধিক ইউরোপীয় পুরনরনারীদের মধ্যে প্রেম নিবেদনের অঙ্গভঙ্গির ও তাদের শব্দচিত্র তাকে মোহমুগ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেইসব ইউরোপীয় নারীদের 'শব্দচিত্র'— তাদের শরীর ও মনের চেহারার সমান দক্ষতার সঙ্গে শিল্পীর নিপুন তুলিতে এঁকেছেন, ঠিক যেমনটি পরবর্তীকালে দেশীয় নায়িকাদের জীবন রূপায়নে করেছেন।

আসলে প্রমথ চৌধুরীর যে, পরবর্তীকালের একজন সৌন্দর্যে মণ্ডিত মন ও মনের অধিষ্ঠাত্রী চিরন্তনী নারীর পূজারী লেখক হয়ে উঠবেন তার সূচনা যেন ঠিক এখান থেকেই। এবিষয়ে তিনি তাঁর নিজের স্ত্রী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রে বলেছেন — "আমি কৈশোর উত্তীর্ণ না হতেই টের পেয়েছিলুম যে জীবনে কোন্ কোন্ জিনিস আমাকে অধিকার করে নেবে — beauty, mind— এবং এটাও বুঝতে বাকি ছিল না যে আমার মনোজগতের কেন্দ্র হবে The Eternal Feminine।" [৪৬]

চার-ইয়ারী কথা (১৯১৬):

'সবুজপত্র' চৈত্র ১৩২২ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরীর 'চার-ইয়ারীর কথা'। 'চার-ইয়ারী কথা' আদপে চারটি গল্প; একটি নামে প্রকাশিত। 'চার-ইয়ারীর কথা' গ্রন্থটি প্রমথ চৌধুরীর সমবেত চার বন্ধুর এক আড্ডা পরিবেশকে নিয়ে

রচিত গল্পটি। গল্পের শুরু ঝড়-বৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে। চার বন্ধুর-ই বাড়ি ফেরার তাড়া থাকলেও বাধা হয়ে দাড়িয়েছে সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সময় কাটানোর জন্য এরা সকলেই সুরা পানে মজেছে। আর এই পরিবেশ চার বন্ধুর মনের আগল ভেঙে দিয়েছে, ভেঙে দিয়েছে সমাজ সংস্কার ও অভ্যাসের সৌধ। ফলে তাদের প্রত্যেকের মুখ দিয়ে অবলীলায় বেড়িয়ে এসেছে এতদিনের যৌবনকালের হারানো চারটি মন, যেখানে পূর্ণ ছিল যৌবনের সৌন্দর্যাভিসারের বেদনা সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। প্রত্যেকের অতীত অভিজ্ঞতার বর্ণনা এক একটি গল্পে পরিণত হয়েছে। গল্পের পটভূমি বিচারে দেখা যাবে, ভারত ও ইউরোপের সংযোগ সমন্বয় ঘটেছে। গল্প গ্রন্থটির চারটি গল্পের মধ্যে প্রথম গল্পটি ছাড়া বাকি তিনটি গল্পের ঘটনাস্থল হল ইউরোপ এবং চারটি গল্পেই নায়কেরা ভারতবর্ষীয় হলেও তাদের নায়িকারা সকলেই বিদেশিনী তথা ইউরোপীয়। গল্প গ্রন্থটিকে আদ্যপ্রান্ত পাঠ করলে আপাতভাবে এটিকে একটি প্রেমের গল্প বলে মনে হবে। কিন্তু গভীরভাবে পাঠ করলে বোঝা যাবে, গল্পটি আসলে তা নয়। গল্পের মধ্যে জড় আত্মার বিকাশ ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন নারীর আদর্শকে মেলাতে চেয়েছেন লেখক। আর তা যে ক্ষুদ্র দেশ-কাল-সংস্কারের মধ্য আবদ্ধ মানুষে সম্ভব নয় – সেজন্যই গল্পের শুরুতেই লেখক ঝড় এনে সেই দেশকালের গণ্ডিকে ভেঙে দিয়েছেন। এরপর নায়কেরা একে একে দ্বিধাহীনভাবে তাদের ‘প্রেমের’ অভিজ্ঞতা সকেলর সামনে বলেছে।

‘চার-ইয়ারী কথা’ গল্পের প্রথম বক্তা সেন। সেন প্রথমেই নিজের দেশকালের সীমা অতিক্রম করে বন্ধুদের কাছে ইউরোপীয় প্রীতির কথা নির্দ্বিধায় বলেছে, তার দেহ এদেশে থাকলেও মন ছিল ইউরোপে। আর সেই মনের ওপর ইউরোপের আলো পড়েছিল এবং সেই আলোয় সে স্পষ্ট দেখতে পেত, যে এদেশে তার দেহ থাকলেও প্রাণ নেই। সেনের নিজের কথায়, ‘আমার দেহ ছিল এ দেশে, আর মন ছিল ইউরোপে। সে মনের উপর ইউরোপের আলো পড়েছিল, এবং সে আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেতুম যে, এ দেশে প্রাণ নেই; আমাদের কাজ, আমাদের কথা, আমাদের চিন্তা, আমাদের ইচ্ছা— সবই তেজোহীন, শক্তিহীন, ক্ষীণ, রুগ্ন, ম্রিয়মান এবং মৃতকল্প। ... কিন্তু আমি মরতে চাই নি, আমি চেয়েছিলুম বাঁচতে— শুধু দেহে নয়, মনেও বেঁচে উঠতে ফুটে উঠতে জ্বলে উঠতে।’[৪৭] আর সেই ব্যকুলতা থেকেই সে একটি

কাল্পনিক আদর্শ নায়িকার সৃষ্টি করেছিল, এই নায়িকা হল ইউরোপীয় আলোর আদর্শে গড়া— যার সাক্ষাৎ পেলেই সে সজীব হয়ে উঠবে বলে মনে করে। আর এরকম অবস্থায় সে স্মৃতিলোক থেকে কল্পলোকে চলে যায়। তাই তার কোনও কিছু ভাল না লাগলে সে 'লোকজন ছেড়ে ইউরোপীয় নাটক-নভেলের রাজ্যে' বাস করে। যে দেশ বা রাজ্য আসলে কতকটা সত্য আবার কতকটা মিথ্যার বা সত্যও নয় আবার মিথ্যাও নয়। এমন দেশ হল ইউরোপ— তবে যে ইউরোপ আমরা চোখে দেখে এসেছি সে ইউরোপ নয়— এ হল কবিকল্পিত রাজ্য, যার পরিচয় একমাত্র ইউরোপীয় সাহিত্যে লাভ করা যায়। সেই রাজ্যের নায়ক-নায়িকারাই তার রাতদিনের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। আর রক্ত-মাংসের দেহধারী স্ত্রী-পুরুষেরা তার চার পাশে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াত। শেষ পর্যন্ত সেন তার সেই মনোজগতের নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ পেয়েছে এক পূর্ণিমার রাত্রিতে গঙ্গার ধারে, '... বেঞ্চিতে যে বসে আছে সে একটি ইংরাজ-রমণী— পূর্ণযৌবনা— অপূর্বসুন্দরী! এমন রূপ মানুষের হয় না— সে যেন মূর্তিমতী পূর্ণিমা! আমি তার সমুখে থমকে দাঁড়িয়ে, নির্নিমেষে তার দিকে চেয়ে রইলুম।'[৪৮] তখন তার মনে হয়েছিল সেই একমাত্র ভালোবাসবার ও ভালোবাসা পাবার বাসনা। কিন্তু তার নব-উচ্ছ্বসিত প্রাণের বেদনা অনুভব করার মুহূর্তে সহসা অস্বাভাবিক ও বিকট চিৎকারে তার 'গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল।' এর পরমুহূর্তে 'তার কান্নার চাইতে দশগুণ বেশি বিকট, দশগুণ বেশি মর্মভেদী' 'অট্টহাস্য চারিদিক প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।' কথক সেন বুঝল 'মূর্তিমতী পূর্ণিমা' একজন বদ্ধ উন্মাদ নারী। এটিই সেনের জীবনে প্রথম ভালবাসা এবং সেই তার শেষ ভালোবাসাও বটে। এরপর তার ইউরোপে আরও একাধিক ফুলের ন্যায় কোমল, তারার ন্যায় উজ্জ্বল স্ত্রীলোক দেখে মুহূর্তে জন্য আকৃষ্ট হলেও তখনই তার কানের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে সেই 'অট্টহাসি'। আর তখনই তার মন পাথর হয়ে গেছে। আর সেইদিন থেকেই তিনি চিরদিনের জন্য eternal feminine-কে হারিয়ে নিজেকে ফিরে পেয়েছে।

'চার-ইয়ারি কথা' গল্পের দ্বিতীয় বক্তা সীতেশের প্রকৃতি সেনের ঠিক বিপরীত। কিন্তু তার নিজের প্রেমজীবনের অভিজ্ঞতার কথা শুরু করেছে সেন যেখানে ছেড়েছেন, ঠিক তার থেকে। সেন একজন নারীর মধ্যেই eternal feminine-কে পেতে চেয়েছিল আর সীতেশ

একাধিক নারীর মধ্যে তার সন্ধান করেছে — দুজনেই ব্যর্থ হয়েছে। সীতেশের অনেকের ভিতর সেই নারীর সন্ধান করেছে। ফলে তিনিও সেনের মতোই তা পান নি। এখন তার স্ত্রীলোক দেখলেই মন আপনা থেকেই নরম হয়ে পড়ে। স্ত্রীলোকের দেহ ও মনের ভিতর যে শক্তি আছে তা তার মনকে নিত্য টেনেছিল। আর এই কারণেই বিলেতে থাকাকালীন সে মাসে একবার করে প্রেমে পড়ত। উদাহরণ স্বরূপ তার নিজের জীবনে Holborn Circus-এ বই কিনতে গিয়ে কীভাবে একটি ইউরোপের স্ত্রীলোকের কাছে প্রতরণার স্বীকার হয়েছিল সেই ঘটনার কথা অন্যবন্ধুদের শুনিয়েছে। সেই স্ত্রীলোকটির ছিল ইস্পাতের মতো চোখ আর ছুরির ধারের মতো চিক্‌মিক্‌ করা মুখটেপা সর্বক্ষণের হাসি, যে হাসি তাকে বার বার আকর্ষণ করত। তার উপড় সেই স্ত্রীলোকটি তার কেনা বইয়ের মূল্য এক শিলিং অযাচিতভাবে দোকানের মালিককে দিয়ে দেয়। সীতেশের মন এতেই প্রেমে ব্যকুল হয়ে পড়ে। আবারও তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। এতে স্ত্রীলোকটি তাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে যাতে সে প্রেমের আবেগে ভাসতে না থেকে। কিন্তু তাতেও কোন কাজ না হওয়ায় অগ্রসর হওয়ায় পথে নিজের ঠিকানা দেবার নাম করে কার্ডে লিখে দেয়, “পুরুষমানুষের ভালোবাসার চাইতে তাদের টাকা আমার ঢের বেশি আবশ্যক। যদি তুমি আমার কখনো খোঁজ না কর, তা-হলে যথার্থ বন্ধুত্বের পরিচয় দেবে।”[৪৯] সেই সঙ্গে সীতেশের পকেটের গিনি কয়টিকেও নিয়ে যায়। সেদিন তার দুঃখ হয়েছিল নিজের জন্য নয়, প্রেমিকার জন্য। এরপরও সীতেশ একাধিক নারীর সংস্পর্শে এলেও তার কাঙ্ক্ষিত eternal feminine–এর সাক্ষাৎ পায়নি।

‘চার-ইয়ারী কথা’ গল্পের তৃতীয় বক্তা সোমনাথ সেই রাত্রে দুর্যোগময় পরিবেশে জানায় যে তার প্রকৃতি ছিল সেন ও সীতেশের ঠিক বিপরীত, কারণ স্ত্রীজাতির প্রতি তার কোনোদিনই তেমন আগ্রহ ছিল না। তার মতে স্ত্রী পুরুষের ভালোবাসার পুরো অর্থ মানুষের দেহের ভিতরে পাওয়া যায় না, মনের ভিতরেও থাকে না। তার মতে ‘ভালোবাসা হচ্ছে both a mystery and jokes.’ আর একথার প্রমাণ স্বরূপ তিনি তার লন্ডন প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলেছে। লন্ডনে থাকার সময়ে তার এক ভয়ানক অনিদ্রার কারণে ডাক্তারের পরামর্শে Ilfracombe বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে হোটেলে থাকার সময় বছর পঞ্চাশের কাছাকাছি

এক ভদ্রমহিলার সাক্ষাৎ, পরিচয় ও আহারন্তে তার সমস্ত জীবনের আর্দশ ও চিন্তাভাবনার জগতকে ঘুলিয়ে তোলে। কারণ সেই কথা প্রসঙ্গে ভদ্রমহিলা তার কাছে সংস্কৃত, বেদান্ত ও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করার কথা বলে। এবিষয়ে তিনি খুব সামান্য জানলেও তাকেই ইনিয়ে-বিনিয়ে, ফেনিয়ে-ফাপিয়ে অনেক কথা বলতে থাকে। আর সেই প্রত্যেক ভুল তথ্য শোনার পর পাশেই বসে থাকা জর্জের সঙ্গে ডিনাররত রিণী নামে এক মহিলা মিঠিমিঠি হাসচ্ছিলেন। পরে খুব বেকায়দায় পড়লে তাকে উদ্ধার করতে সেই রিণী তাকে অতি পরিচিতের মতো আচারণ করে তাকে নিজের ড্রয়িং-রুমে নিয়ে যান একরাশ কথা বলার জন্য। আর সেও সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু পিছু চলে যায়।

সোমনাথকে সেই ভদ্রমহিলার বিপদ থেকে উদ্ধার করে রিণী নিজেই আবার আর এক বিপদের মধ্যে ফেললেন। এবার সেই বিপদ হল রিণীর সঙ্গে দাবা খেলতে বাধ্য করা। তার দাবা খেলার আসল উদ্দেশ্য হল রিণীর স্বামী জর্জের হাত থেকে রেহাই পাওয়া। রিণী বলেছে, 'ওদের সব বিষয়ে মত আছে, অথচ কোনো বিষয়ে মন নেই। ও জাতের লোকের ভিতর সার আছে, কিন্তু রস নেই। ওরা স্ত্রী লোকের স্বামী হবার যেমন উপযুক্ত, সঙ্গী হবার তেমনি অনুপযুক্ত।'[৫০] এভাবেই জর্জের সম্পর্কে আরও একাধিক কথাবার্তা দুজনের মধ্যে হওয়ার পর রাত বারোটায় দু'জনে ঘুমোতে যায়। আস্তে আস্তে সোমনাথের মন রিণীর প্রতি দুর্বল হতে থাকে। সেই পরিবেশে তার মনে হয় মনের অদৃশ্য তারগুলি রিণী দশ আঙুলে ধরে পুতুল নাচিয়েছিল। পরে সে শত চেষ্টা করেও রিণীর মনকে নিজের আয়ত্তাধীন করতে পারেনি, তাতে অবশ্য সে লজ্জিত নয়। কিন্তু এই প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে মুখ না দেখার প্রতিজ্ঞা করলেও তা দু-দিনে ভুলে গিয়ে পুনরায় দুজনের মিলন হত। আর শেষে সোমনাথ অসুস্থ হলে আবারও রিণীর কথামত রিণীর কাছে যাওয়া, তাকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত জানালে রিণী জানায় সেই দিনই জর্জের কাছে বিবাহের সম্মতির চিঠি পেয়েছে। এরপরে প্যারিসে রিণীর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েও আবার অনেক দেখা দেখতে থাকে। এর মাস খানেক পরেই রিণীর সঙ্গে জর্জের ছাড়াছাড়ি হয়। এরপর রিণী Spain একটি Convent-এ চিরজীবনের মতো আশ্রয় নেয়।

'চার-ইয়ারী কথা' গল্পের সর্বশেষ বক্তা কথক নিজে। লেখক এই অংশের নাম দিয়েছেন 'আমার কথা'। বিলাতে পড়তে গিয়ে অনেক প্রবাসী বাঙালির বিলেতি মেয়ের প্রেমে পড়া, বিয়ে করা, ফিরে আসার সময় ইউরোপের মাটিতে প্রেমিকাকে রেখে এসে স্বদেশের মাটিতে সেই আদি প্রমের স্মৃতি হাতড়ানো ইত্যাদির পরিচয় ও আমরা পেয়ে থাকি।

'চার-ইয়ারি কথা' গ্রন্থের 'আমার কথা' অংশে কথক একদিন নিজের বাড়িতে নিজে ও তার ভৃত্য রাত্রিতে থাকাকালীন এক অদ্ভূত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। কথকের বিলেতের প্রেমিকার কথা গভীর রাতে মনে পড়লে একাকী ফোন কানে তুললে 'হ্যালো' 'হ্যালো' করায় একটি অতি মিষ্টি কণ্ঠস্বর তার কানে আসে এবং কিছুক্ষণপর আস্তে আস্তে সব মিলিয়ে যায়। তারপর ক্রমেই সেই কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হতে থাকে; কথক বুঝতে পারে বিলেতের তার একসময়ের কাজের মেয়ে 'আনি'। সেই আনি ফোনের ওপার থেকে বলতে থাকে কথকের বিলেতের 'Gordon Square' এর ভাড়াবাড়ির কথা, সে বাড়ির দাসী আনি, আনি গোপনে তাকে ভালোলাগা, তাই প্রেমিকের অনুসারী হয়ে কাজকর্ম করা— তা কখনও লুকিয়ে আবার কখনও সগোচরে; এমনকি তাকে বোঝার জন্যই তার পড়া বইও পড়তেন। শুধু তাই নয় " আমার সঙ্গে নয়। খাবার টেবিলে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তুমি যখন কথা কইতে তখন আমার তা শুনতে বড়ো ভালো লাগত। সে তো কথা নয়, সে যেন ভাষার আতসবাজি! ... ইংরেজি ভালো করে শেখবার জন্য আমি চুরি করে বই পড়তুম।"[৫১] কথক অবশ্য একবছরের কথা বলে কলকাতায় চলে এলে সেই 'আনি' সেদিনেই বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এবং তার কিছুদিন পরই একবেলা, একমুঠো, অনাহারে অসুস্থ ও পরে যক্ষা হলে হাসপাতালে যায়। অবশ্য হাসপাতালে সে তার স্মৃতিস্বপ্ন এবং তাকে দেখার অপেক্ষায় ভালোই থাকে। ডাক্তার বুঝতে পারে তার না খাওয়ার জন্যই শরীর খারাপ হয়েছে, ঠিক যক্ষা হয়নি। পরে ডাক্তারের পরামর্শেই সে নার্স হয় ও একে অপরকে খুব ভালোবাসে। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে যুদ্ধ শুরু হলে সেখানে ডাক্তার ও নার্স সেবা করার জন্য সেখানে যায়। আর সেই যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যাওয়ার পরে আজ কথকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছে। এইসব কথাবার্তা বাস্তবে না স্বপ্নের মাধ্যে হয়েছিল তা কথক স্পষ্ট করে বলতে পারে না।

প্রমথ চৌধুরীর 'চার-ইয়ারি কথা' গ্রন্থের চারবন্ধুর চারটি পৃথক প্রেমের অভিজ্ঞতা বর্ণনা আমাদের সমস্ত রকমের রোমান্টিক প্রেমের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে বিপর্যস্ত করে সম্পূর্ণ এক নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছে। অথচ গল্পগুলির আকর্ষণ কিংবা গল্পরস আস্বাদন অক্ষুন্ন রয়েছে। তাই এই গল্পগুলি সাধারণ প্রেমের গল্প নয়। গল্পগুলিতে বিশেষ কোনও নারীর প্রতি জৈবিক আকর্ষণ নেই, পরিবর্তে নারীর মধ্যে মূর্ত সৌন্দর্যের ভাবসত্ত্বের প্রতি অর্থাৎ চিরন্তন নারীর প্রতি আকর্ষণই গল্পচতুষ্টের মূল প্রসঙ্গ। এখানে নায়কেরা সম্পূর্ণ নীতিশাসন মুক্ত হয়ে তাদের বেপরোয়া যৌবনের প্রাণচাঞ্চল্যেকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছে।

মেরি ক্রিস্‌মাস (আশ্বিন, ১৩৪৪) :

এদেশের ছাত্রদের বিলেতে গিয়ে প্রেমে পড়া ছিল খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু তাদের বিয়ে হত কদাচিৎ। তবে এই প্রেমের স্মৃতি যে কতটা তরতাজা থাকত এবং সেই স্মৃতি নিয়ে কীভাবে ভবিষ্যত কাটাতেন, কতটা হাবুডুবু খেতেন, তারই গল্প হল 'মেরি ক্রিসমাস'। এই গল্পের কথক একজন বিলেত ফেরত, যিনি দীর্ঘদিন বিলেতে থেকে পড়াশুনা করেছে, বিলেতি মেয়ের প্রেমে পড়েছে এবং বর্তমানে দেশে ফিরে সংসার যাপন করছে। কথকের নিজের কথায়, 'আমি বিলেতে প্রেমে পড়েছিলুম, কিন্তু বিলেতি মেয়েকে বিয়ে করি নি; করেছি দেশে ফিরে দেশের মেয়েকে, আর নির্বিবাদে সস্ত্রীক সমাজের পিতলের খাঁচায় বাস করছি।' [৫২] কিন্তু কথক দেশি মেয়েকে বিয়ে করলেও তার মন পড়েছিল সেই বিদেশিনীর প্রতি, তার স্মৃতিকে পুরোপুরি ভুলতে পারেনি। তাই কথক কখনও একাকী বসে থাকলে সেই বিলেতি মেয়ের অশরীরী ছায়ামূর্তি সম্মুখে এসে উপস্থিত হত। এরকমই ঘটনা বছর চার-পাঁচ আগে শীতকালে বড়োদিনের আগের ঘটেছিল। সেই রাতে তার মনে হয় বিলেতি কিশোরীটি শোবার ঘরে তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে থাকে— এই আছে, এই নেই। ফলে সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় না, জেগে স্বপ্ন দেখতে থাকে। পরের দিন স্ত্রী-র সখের জন্য চৌরাঙ্গীর একটি থিয়েটারে শৌখিন বিলেতি সাহেব-মেমদের গান শোনার জন্য গেলে সেখানেও কথক অনমনা হয়ে পড়েন। আবারও তিনি আবিষ্কার করে তার পাশের চেয়ারে বসেছে সেই বিলেতি আদি প্রণয়িনী। তার সেই গ্রীসিয়ান

নাক, সেই ভায়োলেট চোখ। আর সেই ঠোঁট-চাপা হাসি, যার ভিতর ছিল শুধু জাদু। এরপর সেই প্রণয়িনীর চোখের ইশরায় থিয়েটারের বাইরে বেরিয়ে এসে একে অপরের খোঁজ-খবর নেওয়া থেকে শুরু করে অতীত প্রেমজীবনের আর বর্তমানের সাংসারিক জীবনযাপন মিলিয়ে মিশিয়ে ট্রাজেডি ও কমেডিময় জীবনের কথাবার্তা চলতে থাকে। এমন সময় তার স্ত্রী তাকে খুঁজতে এলে কথকের সমস্ত স্বপ্নময়তার অবসান ঘটে। তার স্ত্রী এই একা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলে কথক জানায়, "আজ আমার Merry Christmas."

অদৃষ্ট (অগ্রহায়ণ, ১৩২৬):

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিলাতি রুচি, আদব-কায়দা, বাঙালি সমাজের অনেককেই আকৃষ্ট করেছিল। বিশেষত শহর কলকাতায় অনেকেই বিলাতি ঘরানায় বাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছেদ, খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন নিজেদের যোগ্যতা আর সামর্থ পরখ না করেই। ফলে তাদের জীবনে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়নি। আমাদের এখন আলোচিত গল্প তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রমথ চৌধুরী 'অদৃষ্ট' গল্পে খেলারাম পালবাবুদের বাড়ির সংস্কৃতি ছিল তেমনই বিলেতিয়ানায় সাজানো। এই বাড়ির ফটকে বনেদী বাড়ির মতোই সিংহদ্বার ছিল, কিন্তু সেই সিংহদ্বার বিলেতি দস্তরে সাজানো ছিল নাচ ঘর। 'ইতালী থেকে আমদানি-করা তুষার-ধবল নবনীতসুকুমার মর্মর-প্রস্তরে গঠিত প্রমাণ- সাইজের স্ত্রীমূর্তিসকল সেই বারান্দার দুধারে সার বেঁধে দিবারাত্র ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত— প্রতিটি এক-একটি বিচিত্র ভঙ্গিতে।'[৫৩] কিন্তু বর্তমানে এই নাচ ঘরের অবস্থা খুবই শোচনীয়। যদিও পালবাবুদের এই বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ অংশীদারি বিবাদ। ফলে সেই নাচঘরের এখন আসবাবের ভিতর আছে একটি জরাজীর্ণ কাঠের লেখার টেবিল আর কতগুলি ভাঙা চৌকি। এ ঘরে এখন ম্যানেজার-সাহেব দিনে আপিস করলেও রাত্রিতে সেখানে নর্তন হয় ইঁদুরের আর কীর্তন হয় ছুঁচোর। অথচ এই নাচঘর মেরামতের দায়িত্ব যার কাছে পড়েছিল তিনি হলেন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি সাত বছর চেষ্টা করেও উকিল-ব্যারিস্টার হতে না পারলেও সাহেবদের দোকানে তৈরি ইংরেজি পোষাক পরতেন। গল্পে দেখি '... বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা একটানা ফার্স্ট ডিভিসনেই পাস করে

এসেছেন, কিন্তু আদালতের পরীক্ষা তিনি থার্ড ডিভিসনেও পাস করতে পারলেন না। ... যখন সাত বৎসর বিনে রোজগারে কেটে গেল, আর সেই সঙ্গে বয়সেও ত্রিশ পেরুলো, তখন তিনি হাইকোর্টের জজ হবার আশা ত্যাগ করে মাসিক তিনশ টাকা বেতনে পালবাবুদের জমিদারি সম্পত্তির ম্যানেজারের পদ আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হল।'[৫৪] যদিও এই ওকালতি করার কায়দা থেকে সম্পূর্ণ উল্টো ছিল জমিদারি করা। আসলে সেকালে অনেকেই বিলেতি বিদ্যার বিশেষত ব্যারিস্টারি পড়তে চাইলেও সকলে সফল হত না, পরিবর্তে নিজেরা সেই মোহে সর্বস্বান্ত হয়ে পরত। এবং শেষ পর্যন্ত দেশীয় জমিদারের অধীনস্ত নানা রকম কাজ করে জীবন নির্বাহ করত – তারই উদাহরণ হল এই গল্পটি।

স্বল্প গল্প (আষাঢ়, ১৩৪৫):

বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় একদিকে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারি প্রথার বিদায় ঘন্টা বাজতে শুরু করে আর অন্যদিকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির আগমন— এই দুটি চিত্রই 'স্বল্প গল্প' গল্পটিতে চিত্রিত হয়েছে। গল্পে আমরা কথকের থেকে জানতে পারি, তার আকৈশোর বন্ধু কুমারেশ্বর, কুমারেশ্বর বাহাদুর পাড়া-গায়ের মধ্যবিত্ত জমিদারের একমাত্র সন্তান ছিলেন। আমরা দেখতে পাই সেই কথকের বন্ধুর মনেও লেগেছিল বিলেতিয়ানার ছোঁয়া। ফলে তিনি বি. এ. পাশ করে পাড়া গায়ে জমিদারি তদারকির পাশাপাশি সময় কাটাতেন ইংরেজদের মতো শিকার করে আর বিলেতি নভেল পড়ে। কেননা তাঁর বিশ্বাস ছিল, প্রথমে নম্বরের বন্দুক ও নভেল শুধু বিলেতেই জন্ম নিয়েছিল। এরকম বিলাতিয়ানার প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধার কারণেই তিনি দেবদেবীর ভক্ত না হলেও ঠাকুরবাড়ি দেখার জন্য আগ্রহের কমতি ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন architecture-এর অনুরক্ত, যা একরকমের বিলাতি শখ বটে। সময়ের সঙ্গে এই জমিদারি ব্যবস্থার সংকট দেখা দিলে সেই সংকট উত্তরণের জন্য বন্ধু কাছে পরামর্শ কথা উঠে এসেছে।

পূজার বলি (আশ্বিন, ১৩৩৪):

উনিশ শতকে বাংলাদেশে প্রথমদিকে জীবিকার তাগিদেই পাশ্চাত্য তথা আইন শিক্ষার প্রসার ঘটে এবং ব্যবহারজীবীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, যারা সেইসময় দেশীয় সমাজের মধ্যে সম্মান-শ্রদ্ধা লাভ করে থাকেন। তবে উনিশ শতকীয় সমাজে ব্যবহারজীবীদের সম্মান-শ্রদ্ধার পাশাপাশি ইংরেজ কর্মচারী দ্বারা আদালতে তাদের অপমানিত হওয়া বা যোগ্য মর্যাদা না পাওয়ার ঘটনাও দেখা যেত, ফলে তখন ব্যবহারজীবীদের মধ্যে একটা আত্মসংকটও দেখা দিতে থাকে। ১৮৩৩ সালে চ্যার্টার আইনের ৮৭ নং ধারা এবং মহারাণী ঘোষণাপত্রে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, শিক্ষিত ও যোগ্য ভারতীয় ব্যাক্তিদের বা ব্রিটিশ নাগরিককে শুধুমাত্র জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা জন্মস্থানের অজুহাতে সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হবে না। ফলে হাইকোর্ট বা আদালতকে কেন্দ্র করে বাংলার শিক্ষিত সমাজের একটি নির্দিষ্ট পেশার উদ্ভব হয়। এতদিনের জমিদার দরবারের সর্বক্ষণ কর্মচারী 'ভকিলে'রা পরিত্যক্ত হয়ে আধুনিক আদালতে আসে নব্য উকিল, যাদের এই নব্য পেশাদারিত্বের মোড়কে শুরু হয় নব্যজীবন। এই ব্যবহারজীবীদের নিয়েই প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'পূজার বলি' গল্পটি লিখেছেন।

প্রমথ চৌধুরীর 'পূজার বলি' গল্পে ব্যবহারজীবী বা উকিলেরা তাদের আয় উপার্জন বা ব্যাবসার প্রতি কতটা সচেতন ছিলেন তার অনেকটা বাস্তব পরিচয় পেয়ে থাকি। গল্পের শুরুই হচ্ছে তারই ইঙ্গিত দিয়ে, 'উকিল অবশ্য আমরা সবাই হই পয়সা রোজগার করবার জন্য। কিন্তু পয়সা সকলের ভাগ্যে জোটে না। তবুও যে আমরা অনেকেই ও ব্যাবসার মায়া কাটাতে পারি নে তার কারণ, ও ব্যাবসার টান শুধু টাকার টান নয়। ...'[৫৫] পেশাদার উকিলেরা আদালতে তাদের পেশায় এক চরিত্র কৌশলে আর বাইরে মক্কেলদের কাছে আর এক চরিত্র কৌশলে হাজির হতেন। উকিলদের ছল শক্তির কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, '... উকিলের কাছ থেকে যাঁরা ফৌজদারি আদালতে প্র্যাকটিস্ করেন; আর non-violent লোকেরা যে কত অবস্থায়, কত ভাবে, কত প্রকার ছল প্রয়োগ করেন তার সন্ধান পাওয়া যায় সেই-সব উকিলের কাছ থেকে — যাঁরা দেওয়ানি আদালতে প্র্যাকটিস্ করেন।'[৫৬] এই উকিলেরা মামলায় হারলেই হারের জন্য জজের বিচারের দোষ ধরেন ঠিক যেমনটি পরীক্ষায় ফেল হলে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষকের দোষ ধরে থাকেন।

ভাববার কথা (শ্রাবণ, ১৩৩৪):

সে সময়ে ব্যারিস্টারি পড়ার প্রতি লোকের এতটাই মোহ ছিল যে, তা পড়তে গিয়ে অনেকে অসৎ উপায়ও অবলম্বন করতে কোনো দ্বিধাবোধ করত না। কারণ একবার আইন পাশ করে ফেলতে পারলেই সমাজের কাছে তাদের 'রত্ন ছেলে' বা 'সৎ পাত্রে'র অ্যাখ্যা পেতে খুব বেশি দেরি হত না। প্রমথ চৌধুরীর 'ভাববার কথা' গল্পে এই ঘটনারই নিদর্শন পেয়ে থাকি। গল্পের একেবারে প্রথমদিকে শ্রীকণ্ঠবাবু ও আনন্দগোপালবাবু দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর আলাপচারিতায় উঠে এসেছে বি. এল. পাস করা ছেলের প্রসঙ্গ। আনন্দগোপালবাবু বি. এল. পাস করার বিষয়ে কিছু না জেনেই তার বন্ধুকে অনেকটা উচ্ছ্বাসিত স্বরেই অভিনন্দন জানায়। সেখানেই থেমে না থেকে তাকে আরও বলতে শুনি "সে তো তোমার রত্ন ছেলে। দেহ-মনে ঠিক ফুলের মতো ফুটে উঠেছে।"[৫৭] এই ব্যারিস্টারি মোহে শুধুমাত্র আইন পড়া ও ওকালতি করার জন্যেই অনেকেই আইন পড়াতে অসৎ উপায়ও অবলম্বন করতেন, আমরা এখানে সেকথারই স্বীকারোক্তি লক্ষ করি প্রমথ চৌধুরীর 'ভাববার কথা' গল্পে-

> 'আমি জানতে চাই, আইন কিছু জান— কি জান না?'
>
> 'আইনের কতকগুলো কথা জানি, তার বেশি কিছু জানি নে।'
>
> 'তবে বি. এল. পাস করলে কি করে?'
>
> 'নোট মুখস্থ করে। বই পড়লে ফেল হতুম।'[৫৮]

প্রিন্স (বৈশাখ, ১৩৩১) :

গল্পটি বিলেতের পটভূমিতে লিখিত। সে সময়ে বিলাতিয়ানায় বাঙালি যুবসমাজ নিজেকে কিভাবে ডুবিয়ে রাখতেন ও আত্ম-অহংকারে গদগদ করতেন তার একটি শ্রেষ্ঠ গল্পের উদাহরণ হল প্রমথ চৌধুরীর 'প্রিন্স' গল্পটি। গল্পকথকের বিলেতে থাকাকালীন এক হিন্দুস্থানী যুবক প্রিন্সের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে যুবকের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্কর হলে কথক জানতে পারে তার পূর্বপুরুষেরা পশ্চিমের রাজবংশের সন্তান ছিলেন। বর্তমানে ভাগ্য ও আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে পিতৃপুরুষের 'প্রিন্স' উপাধি ব্যবহার করে না। কিন্তু উপাধি ব্যবহার না করলেও 'তিনি

পোশাকে দেদার টাকা খরচ করতেন, এবং এ বিষয়ে অতিব্যয় করবার জন্য তাঁকে অপরাপর বিষয়ে অতিশয় মিতব্যয়ী হতে হত; এমন-কি, তাঁর আহার একরকম উপবাসের শামিলই ছিল। ইংলন্ডের রাজপুত্র যে দোকানে পোশাক তৈরি করান তিনিও সেই দোকানে পোশাক তৈরি করাতেন সমান ব্যয় করে, কিন্তু তিনি জীবন ধারণ করতেন রুটি মাখম ও কলা খেয়ে।'[৫৯] এরপর প্রিন্সের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। এরপর বিলাতী মেয়েকে বিয়ে করে কোটিপতি হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাকে প্রেম নিবেদন করার কথা ভাবতে থাকে। একদিন এই প্রেম নিবেদনের উদ্দেশ্যেই তিনি লন্ডনের একটি বড়ো হোটেলে বাস করে পাঁচশো টাকায় একটি তেজি ঘোড়া ভাড়া ও পোশাক তৈরি করে Hyde Park-এ বিলাতি কন্যার সম্মুখে উপস্থিত হন। ঘোড়াটি রাস্তায় স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করলেও Hyde Park-এ প্রবেশ করেই হঠাৎ ধনুকের মতো বেঁকে চার পা তুলে লাফাতে থাকে। প্রিন্স অনেক কষ্টে কোনো রকমে তার প্রণয়পাত্রীর ঘোড়ার পাশে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে I love you এই কথাটি বলবার অভিপ্রায়ে শুধু I lo — পর্যন্ত বলেছেন আর অমনি ঘোড়া হঠাৎ এমন জোরে মাথা তুললো যে সেই অশ্বমস্তকের আঘাতে তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা বের না হয়ে তাঁর নাক দিয়ে রক্তস্রাব হতে শুরু করল। এই দৃশ্য দেখে প্রেয়সী মহিলা খিল খিল করে হেসে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। আর তিনি হোটেলে ফিরে শয্যাশা য়ী হলেন। আসলে তিনি মনে প্রাণে চাইতেন সাহেবিয়ানা, কিন্তু তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার অভাব ও দৈন্য। সে প্রায় প্রতিমাসেই এইরকম প্রেমের বিপদে পরতেন এবং অন্যসব বন্ধুরা সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতেন।

বীরপুরুষের লাঞ্ছনা (কার্তিক, ১৩৩১)।

এই গল্পে কথক বিলেতের তার ব্যারিস্টারি পড়ার সময়কালের ঘটনা জানাচ্ছেন এভাবে 'আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে। আমি সে দেশে থাকাকালীন এ দেশ থেকে একটি যুবক ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য ইংলণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হলেন।'[৬০] পরে অবশ্য কথকের সঙ্গে এই যুবকের বন্ধুত্ব হয়। এই যুবক টেনিস খেলতে, ঘোড়ায় চড়তে, দাঁড় টানতে, খুবই সক্ষম হলেও পৃথিবীর অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে বিলেতের পাড়াগাঁয়ের একটি মেলায় গিয়ে

এক সার্কাস গার্লের সঙ্গে পরিচয় হয়। প্রথমে তার সঙ্গে গলাগলি ভাব, স্বামী-স্ত্রীর মতো হাত ধরাধরি করে নাগর দোলায় চড়ে, হোটেলে যায়। এর পর যুবকটি সেই বিলেতি সার্কাস গার্লের মন জয় করার জন্য নিজেকে শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর বলে প্রমাণ করতে গিয়ে নাস্তানুবাদ হয়ে পরে। একসময় চরম আঘাতপ্রাপ্ত হলে কথকেরা উদ্ধার করে। এরপর সার্কাস গার্ল নিজেই তার পারদর্শিতার পরিচয় দিতে থাকে।

বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে বিলেতি মেয়ের প্রেমে পড়ে কীভাবে নিজেদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিত, কীভাবে উন্নত ইউরোপীয় শিক্ষা, বুদ্ধির কাছে বাঙালি ছাত্রেরা পিছিয়ে থাকত তার একটি অন্যতম উদাহরণ এই গল্প। এছাড়াও বিলেতের শিক্ষা-সাংস্কৃতি ও মেলা, নারী পুরুষের প্রেম নিবেদন, সখ্য, সূক্ষ্মবিদ্যার পারদর্শিতার ইত্যাদির পরিচয় পেয়ে থাকি।

ঝাঁপান খেলা (চৈত্র ১৩৩৭):

এই গল্পটিতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে বাঙালি সমাজ ও মনের মধ্যে ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও তাদের কর্মজীবনে প্রভাব ফেলেছিল তারই যেন সম্পূর্ণ একটি দেশীয় গল্পের আখ্যানের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। ‘ঝাঁপান খেলা’ গল্পটি কথকের বন্ধু শুনিয়েছেন। এই বন্ধুর পরিচয় দিতে কথক বলেছে, ‘বন্ধুবর আসলে ছিলেন মুন্সেফ, কিন্তু তাঁর হওয়া উচিত ছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। প্রথমত তাঁর ছিল পুরো হাকিমি মেজাজ; আর সেই কারণে তিনি পরতেন ইংরাজি পোশাক, খেতেন ইংরাজি খানা, ফুঁকতেন আধ হাত লম্বা বর্মা চুরুট। উপরন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি লেখেন নির্ভুল ইংরাজি, আর বলেন ইংরাজের মুখের ইংরাজি। কিন্তু মুন্সেফি আদালতে এই দুই বিদ্যের পরিচয় দেবার তেমন সুযোগ নেই — এই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান দুঃখ।’[৬১] কথকের বাবারও ছিল ইংরেজ প্রীতি। কথকের বাবাও ছিলেন সেকালের ইংরাজি-পড়া ঘোর moralist। এছাড়াও তাঁর বাবার ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা, সাহেবদের ন্যায় বিলাতি ফ্যাশানে কুকুর পোষা, দেশি কুকুরের বিলাতি নামকরণ ইত্যাদি বিষয়েও বিলেতিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

গল্পলেখা (অগ্রহায়ণ, ১৩৩২) :

এই গল্পের মধ্যে আমরা দেখি, গল্পের পাত্র-পাত্রীরা ইউরোপীয়। আর এই ইউরোপের সেদেশের লোকজনেদের মধ্যে আবার ফ্রান্স বা প্যারিসেকে বেশি প্রাধান্য দিতে দেখি। তাইতো সব বিখ্যাত সব লেখকেরাই ইউরোপের ফ্রান্স বা প্যারিসের বসবাস করে। সেই সঙ্গে ইংরেজি গল্পের বাংলা অনুবাদের প্রসঙ্গ, বিলেতে লেখা গল্পের অলৌকিকত্ব কী বা কেমন তারও প্রসঙ্গ এসেছে। পাশাপাশি ইংরেজি ও বাঙালির বাইরের চেহারা ও মনের চেহারার মধ্যে পার্থক্য প্রসঙ্গ এসেছে।

লন্ডনের একটি গরীব যুবক পেটের খিদেয় কীভাবে নারীবাদী, নারীমনস্তাত্ত্বিক লেখক হয়ে উঠলেন, অন্তত সমালোচকের দৃষ্টিতে তারই ব্যাখ্যান হল এই গল্পটি। যুবকটি নারীমনস্তাত্ত্বিক লেখক হওয়ার সুবাদে বিলেতের বড় বড় ঘরের মেয়েদের কাছে মধ্যহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ পেতে থাকে। যদিও সেখানে খাবারের থেকে প্রশ্নের সংখ্যা থাকে অনেক বেশি। লেখকের আশা ক্রমে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকলে সেই নব লেখক এযুগের শ্রেষ্ঠ লেখকের আসনের আকাঙ্ক্ষায় অন্যান্য বিখ্যাত লেখকদের মতোই প্যারিসে আশ্রয় নেন। আর সেখানেই এক তরুণী নভেলিস্টের কাছে আসা, ভালোলাগা এবং তার কিছুদিন বাদে মেয়েটি আর্থিক সংকটের কারণে লন্ডনের এক উকিলকে বিয়ে করেন। এদিকে তরুণ নারীবাদী লেখক এই নারীর মন বুঝতে পারেনি, তাই ভালবাসলেও তা কোনোদিন বলতে পারেনি, এখানেই তার আক্ষেপ।

ধ্বংসপুরী (১৩৪৮):

এই গল্পে দুই বিলেত ফেরতের সন্ধান পাই— এদের মধ্যে একজন সদ্য বিলেত ফেরত আর একজন পঁয়তাল্লিশ বছরের পূর্বেকার বিলেত ফেরত। আর এই দুজন বিলেত ফেরতের কথার মধ্যেই উঠে আসে ইউরোপীয় নগরীর এক ধ্বংসপুরীর কথা। যে ধ্বংসপুরীর ইতিহাস কেউ জানে না, কেবল লোকপরম্পরায় তার ইতিহাস লোকমুখে প্রচলিত। সেই অনুযায়ী, এই ধ্বংসপুরী ছিল Fox Hunting করা একটি বড় লোকের। সেকালে তারা রাজার হয়ে যুদ্ধ

করত। তারা ছিল নিষ্ঠুর, নির্মম এবং যথেচ্ছারী। বর্তমানে তাদের শৃগাল বধ করা নেশা ও পেশা হলেও সেকালে মানুষ বধ করা ছিল তাদের ধর্ম ও কর্ম।

ধ্বংসপুরীর বাড়ির মালিক ছিল নামকরা যোদ্ধা, দু-তিন বছর অন্য দেশে যুদ্ধ করতে যান। এই সময় তার পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বিশ্বস্ত বন্ধু Lord-এর হাতে দিয়েছিলেন। কিন্তু একদিন হঠাৎ দুপুরে বাড়ি ফিরে দেখেন তার জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হয়েছে Lord। এতে বাড়ির মালিক সেই পরম বন্ধুকে হত্যা করেন এবং নিজে আহত অবস্থায় লুটিয়ে পরেন। এমত অবস্থায় মালিককে আহত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তার স্ত্রী তাকে বল্লম দিয়ে খুন করে। এই ভ্রষ্টাচারী ও পতিহন্ত্যা মহিলাটি পরে ঘোর ধার্মিক হয়। পরে গুরুর মন্ত্রবলে তার স্বামীর ভূত নামালে সে তার উপপতির জন্য ব্যাকুল হয় এবং পাগল হয়ে আত্মহত্যা করে।

ভূতের গল্প (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯):

এই গল্পে এক ইংরেজ সাহেব পেশায় সরকারি ইঞ্জিনিয়ার যে কর্মসূত্রে বিলেত থেকে সুদূর বাংলায় আসেন। সাহেবের কথায়, 'আমি যখন বিলেত থেকে চাকরি পেয়ে প্রথম এ দেশে আসি, তখন এ অঞ্চলের একটি জঙ্গুলে জায়গা হল আমার প্রথম কর্মস্থল।' [৬২] ফলত একজন ইউরোপীয় বা বিদেশীর কর্মসূত্রে চোখে দেখা বাংলা তথা ভারত কেমন ছিল, বাঙালি নায়িকাদের রূপ ও তাদের সাজসজ্জা ইত্যাদি সুন্দর রূপচিত্র ধরা পড়েছে এক ভূতরে স্বপ্ন গল্পের মাধ্যমে। সেই স্বপ্নময় ভূতের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, 'বিছানা থেকে উঠে রিভলভার হাতে নিয়ে নাবার ঘরের দরজা খুলে দিলুম। খুলেই দেখি, একটি স্ত্রীলোক। চমৎকার দেখতে, একেবারে নীলপাথরের ভেনাস। তার গলায় ছিল লাল রঙের পুঁতির মালা, দুকানে দুটি বড়ো বড়ো প্রবাল গোঁজা, আর ডান হাতের কব্জায় একটি পুরু শাঁখের বালা। মাথার বাঁ দিকে চুড়ো বাঁধা ছিল, আর পরনে এক হাত চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ি। এ মূর্তি দেখে আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।' [৬৩] বাঙালি নায়িকাদের চোখে ইংরেজের সাহেবদের প্রেম ও ভালোবাসার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই সাহেবরা যে কেবল নিজেদের প্রয়োজনে এদেশীয় নারীদের ব্যবহার করত এবং প্রয়োজন ব্যতিরেকে ছুঁড়ে ফেলে দিত সেটিও প্রমথ চৌধুরীর এই লেখার

মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। এছাড়াও ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে রচিত গল্পের মধ্যে বাংলার সৌন্দর্যের এবং লোকায়ত সংস্কৃতির কথাও প্রকাশিত হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীর গল্প সাহিত্য রচনায় ইউরোপীয় প্রবণতার বিশেষত্ব:

পরিশেষে বলতে পারি, প্রমথ চৌধুরীর ইউরোপ পূর্বে প্রভাতকুমারের বর্ণিত ইউরোপ থেকে পুরোপুরি আলাদা। এই ইউরোপ 'যৌবন-চঞ্চল বসন্তভূমি। তা স্বাস্থ্য সৌন্দর্য আনন্দের দেশ। তা প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য ও সংগ্রামের দেশ। প্রভাতকুমারের ইংলন্ড কোমল, আবেগসজল, যেন দ্বিতীয় বাংলাদেশ। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর ইংলন্ড উজ্জ্বল উচ্ছ্বল, তা যে বাংলাদেশ নয় এটাই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।'[৬৪]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, প্রমথ চৌধুরী তাঁর ইউরোপের প্রবাস জীবন নিয়ে লেখা ও দেশীয় মানুষের ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রবণতা নিয়ে লেখা গল্পগুলিকে এক স্বতন্ত্র প্রকৃতি দান করে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। এদিক থেকে প্রমথ চৌধুরীর 'চার-ইয়ারী কথা'র চিন্তার স্বাচ্ছন্দ্য, বুদ্ধির দীপ্তি ও ভাষার বিদ্যুৎ তাঁর অন্য সব রচনার শিল্পমূল্যকে অতিসহজেই অতিক্রম করে গেছে।

উৎস নির্দেশঃ

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, *সাহিত্যসাধক চরিতমালা (৫ম খণ্ড),* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৫

২. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, 'য়ুরোপে পদার্পণ', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫, পৃষ্ঠা- ৮২

৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৮

৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৯১-৯২

৫. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র, 'রবীন্দ্র-সঙ্গমে' মানসী, মাঘ, ১৩২১, পৃষ্ঠা-৭১৬

৬. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *প্রভাত গ্রন্থাবলী* - চতুর্থ খণ্ড, ইংরাজ রমণী, ডি এম লাইব্রেরি, পৃষ্ঠা- ৪৪৯

৭. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *প্রভাত গ্রন্থাবলী* - চতুর্থ খণ্ড, ডি এম লাইব্রেরি, গ্রন্থ পরিচয় অংশ, পৃষ্ঠা- ৫৬১

৮. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *বাংলা গল্প বিচিত্রা,* প্রকাশ ভবন, ভাদ্র ১৪২১, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ২৩

৯. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *প্রভাতকুমারের গল্প সমগ্র* (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ, আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা- ৫২৪

১০. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *প্রভাতকুমারের গল্প সমগ্র* (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ, আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা- ৫২৪

১১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৩৮

১২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৩৮

১৩. প্রভাতকুমারের প্রৌত্র কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার. আমরা এই তথ্যটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক নিত্যানন্দ বিশ্বাসের 'প্রভাতকুমার মুখোপাধায়ের জীবনী ও সাহিত্য' শীর্ষক গবেষণার নিবন্ধের পৃষ্ঠা- ১২২ থেকে প্রাপ্ত.

১৪. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *প্রভাতকুমারের গল্প সমগ্র* (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ, আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা- ৫৭৫.

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৩

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৫

১৭. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *প্রভাতকুমারের গল্প সমগ্র* (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ, আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা- ৩৫

১৮. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *প্রভাতকুমারের গল্প সমগ্র* (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ, আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা- ২৪৮

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫২৫

২০. তদেব

২১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫২৭

২২. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.), *প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প,* প্রকাশ ভবন, পৌষ ১৪২১, পৃষ্ঠা- ১৩০

২৩. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *প্রভাতকুমারের গল্প সমগ্র* (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ, আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা- ১৩৪

২৪. তদেব

২৫. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *প্রভাতকুমারের গল্প সমগ্র* (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ, আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা- ৩৫৪

২৬. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.), *প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প,* প্রকাশ ভবন, পৌষ ১৪২১, পৃষ্ঠা- ১১৯

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫২৮

২৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৯১ - ৯২

২৯. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *প্রভাতকুমারের গল্প সমগ্র* (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ, আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা- ৩৫৪

৩০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৫৬

৩১. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *প্রভাতকুমারের গল্প সমগ্র* (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ, আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা- ১৭৮

৩২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৪৯

৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৮৫

৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৮৬

৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৮৮

৩৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৭

৩৭. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *বাংলা গল্প বিচিত্রা,* প্রকাশ ভবন, ভাদ্র ১৪২১, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ২৯

৩৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ ২০১৮-২০১৯, পৃষ্ঠা- ১২১

৩৯. চৌধুরী, প্রমথ, *আত্মকথা,* দি বুক এম্পরিম লিমিটেড, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা- ৬৩

৪০. রায়, রথীন্দ্রনাথ, *বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী,* জিজ্ঞাসা, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা- ১৫

৪১. চৌধুরী, প্রমথ, *আত্মকথা,* দি বুক এম্পরিম লিমিটেড, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা- ৭২

৪২. তদেব

৪৩. সিংহরায়, জীবেন্দ্র, *প্রমথ চৌধুরী,* মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ পৃষ্ঠা- ২০

৪৪. গল্পসংগ্রহ, প্রমথ চৌধুরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, ১৩৯৪, পৃষ্ঠা- ৭৭

৪৫. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলাসাহিত্যে ছোট গল্প ও গল্পকার* , মর্ডান বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২, পৃষ্ঠা- ২৫১

৪৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫৩-২৫৫

৪৭. চৌধুরী, প্রমথ, *গল্প সংগ্রহ,* সুনীল কুমার সরকার (প্রকাশক), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪১২, পৃষ্ঠা- ২২.

৪৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫

৪৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৯

৫০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫০

৫১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৮

৫২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪০৫

৫৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯১

৫৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯২-১৯৩

৫৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫৮

৫৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫৮

৫৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪৫

৫৮. তদেব

৫৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ২২০-২২১

৬০. তদেব, পৃষ্ঠা- ২২৫

৬১. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭৪

৬২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০২

৬৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০৩

৬৪. দাশ, শিশিরকুমার, *বাংলা ছোটগল্প(১৮৭৩-১৯২৩)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩, পৃষ্ঠা- ১৭৬

ষষ্ঠ অধ্যায়:

ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরাম

ব্যঙ্গ-কৌতুকে ইউরোপ

পৃথিবীর সব দেশের ব্যঙ্গ শিল্পীর দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ হয়। তাঁরা মানব সমাজের অসংগতিগুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখান। তাঁরা সমাজের দুর্নীতিগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন, ফলে তাঁদের লেখনি কখনও জ্বালাময়ী, আবার কখনও হাসিময় হয়ে ওঠে। কিন্তু এই হাসির অন্তরালে মানুষের জমে থাকা দুঃখ কখনও কখনও বিদ্যুতের মতো জ্বলে ওঠে আর তখনই জন্ম হয় ব্যঙ্গের। এই ব্যঙ্গ নানা রূপের হয়ে থাকলেও হাসির মধ্যে দিয়েই তার প্রকাশ সব থেকে বেশি। বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ রসিক লেখকের আবির্ভাব হয়েছে প্রাক-আধুনিক সময়কাল থেকেই। খুবসম্ভবত মঙ্গল কাব্যের মুকুন্দরামের হাতে এর শুভ সূচনা হয়েছে বলা যেতে পারে। এরপর ভারতচন্দ্র হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু প্রমুখ হয়ে ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের মধ্যে এর সার্থকতা প্রাপ্তি ঘটেছে বলা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ সাহিত্য রচনার প্রতি ঝোঁকের অন্যতম কারণ এই শতাব্দীতেই বাংলাদেশে এক বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লব ও শিক্ষা আমাদের দেশীয় সমাজ ব্যবস্থায় এক নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল। একদিকে প্রাচীনের অন্ধতা, ধর্মের মূঢ়তা অন্যদিকে নব্য শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়, যাদের মধ্যে দেখা যায় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অন্ধ অনুকরণ। একদিকে দেশভক্তির ভণ্ডামি, আর অন্যদিকে নানা সামাজিক নোংরামি চলতে থাকে। এদের মানুষত্বের অপমানের বিরুদ্ধে কষাঘাত করতেই ব্যঙ্গ রচনার সৃষ্টি।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭ – ১৯১৯): ত্রৈলোক্যনাথ ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনা জেলার শ্যামনগরের কাছে রাহুতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায় ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তিনি যৌবনে কটক জেলায় পুলিশ-দারোগার চাকরি করতেন। ১৮৬২ সালে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এঁকে এঁকে তাঁর পিতামহী, মাতা ও পিতার মৃত্যু হয় এবং তিনি নিজে প্লীহা জ্বরে আক্রান্ত হন। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তিনি এক আত্মীয়ের কাছে আশ্রয় নেন, কিন্তু সেখানেও দেখা দেয় প্রবল দারিদ্র্য। পরে ১৮৬৫ সালে বাড়ি থেকে পালিয়ে মানভূমে এক আত্মীয়ের কাছে যাওয়ার সময় পথে ডাকাত দলের হাতে পরেন, তারপর অনেক কষ্ট করে বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মানভূমে পৌঁছান।

ত্রৈলোক্যনাথের কর্মজীবন ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনি বিদ্যালয়ের গন্ডি অতিক্রম করতে না পরলেও তাঁর সম্বন্ধ "বঙ্গভাষার লেখকে" বলা হয়েছে– "মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উড়িয়া, হিন্দী, পারসী, উর্দু, সংস্কৃত ভাষায়ও অধিকার কম নহে। ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, নবতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিধ আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রে অধিকারের নিমিত্ত, ইউরোপীয়গণ তাঁহার বিশেষ সন্ধান করিয়া থাকেন।[১] স্বগ্রামে ফিরে এসে যশোরের কোট চাঁদপুরে, বর্ধমানে, কাটোয়ায়, বীরভূমের কীর্ণাহারে, রামপুরহাটে চাকরির উমেদারি করতে তিনি সকল সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করেন। কিছুকাল পরে বীরভূমের দ্বারকায় স্কুল শিক্ষক নিযুক্ত হন, সেখান থেকে রাণীগঞ্জের উখড়া স্কুলে শিক্ষতার করেন। একসময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাবনার সাহজাদপুরে নিজের জমিদারীতে তাঁকে স্কুল শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন, বেতন পঁচিশ টাকা। এইসময় বেতন খুব সামান্য হলেও তিনি সংকল্প করেন যে, দেশে দুর্ভিক্ষ নিবারণের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। পরে আবারও তিনি কাজের সন্ধানে কখনও হেঁটে আবার কখনও সাঁতারে কটকযাত্রা করেন। কটকে এসে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ পেলেন। এই পদে থাকাকালীন তিনি কটকের নানা জায়গায় ভ্রমণ করেন ও বেশকিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করেন। এঁদের মধ্যে লেখক ও সাব জর্জ গঙ্গাচরণ সরকার, ইতিহাসবিদ্ ও সরকারি কর্মকর্তা স্যার উইলিয়াম হান্টার। এরপর হান্টার সাহেব ১৮৭০ সালে কলকাতায় ফিরে তাঁর নিজের অফিসে মাসিক ১২৫ টাকা বেতনের একটি চাকরি দেন। এই কাজে থাকতে তিনি 'Bengal District Gazetteers', 'Statistical Account of Bengal' এবং 'Bengal Manuscript Records' সম্পাদনায় সাহায্য করেন। ১৮৭৫ সালে হান্টার সাহেব বিলেতে গেলে ত্রৈলোকনাথকেও সঙ্গে করে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু নিকট আত্মীয়-স্বজনদের আপত্তিতে তিনি সমুদ্রযাত্রা করতে পারেন নি। এরপর ১৮৭৫ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত ত্রৈলোক্যনাথ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং অযোধ্যায় কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগে প্রথমে হেডক্লার্ক, পরে হেড সুপারিন্টেনডেন্ট এবং শেষে পরিচালক স্যার এডওয়ার্ড বকের ব্যক্তিগত সহকারি রূপে কাজ করেন। এছাড়াও পরবর্তীকালে তিনি ভারত সরকারের কৃষি ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করেন। এরপর রাজস্ব বিভাগের কর্ম পরিত্যাগ করে তিনি কলকাতা মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটর পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু এর

থেকেও বড় চাকরি করতে পারতেন। তিনি বলেছেন, "সদাশয় হান্টার সাহেবও আমাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটি দিবার চেষ্টা করেন। এই সময় উত্তর পশ্চিমে-কৃষি-বাণিজ্য অফিস হইতেছিল। পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে দরিদ্রের দুঃখমোচনে সমর্থ হইব, এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য আশা ছাড়িয়া দিয়া, এখন হেডক্লার্ক পদ গ্রহণ করি।"[২] এসময়ই তাঁর বাংলা সাহিত্য সাধনার সূচনা হয়। পরে ১৮৯৬ সালে অসুস্থতা বশত তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের পর তিনি সাহিত্য চর্চায় অধিকতর মনোযোগ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথের ইউরোপ ভ্রমণ:

বিলাতের শিল্প-প্রদর্শনী (১৮৮৬) উপলক্ষ্যে ত্রৈলোক্যনাথ বিলাত যাত্রা করেন। তখন তিনি কলকাতা মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটর পদে ছিলেন। এই পদে থাকাকালীন সময়ে ভারতের দেশীয় শিল্পদ্রব্য সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহ ও সেগুলির মান উন্নতির উপায় সম্বন্ধে তিনি ব্যাপক ও গভীরভাবে গবেষণা করেছিলেন। তিনি ১৮৮১-৮২ সাল নাগাদ 'A Rough List of Indian Art Manufactures' নামে একটি বর্ণনামূলক বই লিখে সকলকে চমকে দেন। অনেকের মতে, ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টিতে এই বইয়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৮৮২তে আমস্টার্ডামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য তিনি ভারতীয় উৎপন্ন দ্রব্যের একটি বর্ণনামূলক তালিকা তৈরি করেছিলেন, কিন্তু এবারেও আত্মীয়-স্বজনের আপত্তিতে হল্যান্ডে যাওয়া হয় নি। তবে ১৮৮৬ সালে সমস্ত বাধাকে অগ্রাহ্য করে তিনি ব্রিটেনে যান এবং সেখান থেকে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ সফর করেন। কিছুকাল পরে তিনি আবার ইউরোপে যান কিন্তু ফিরে এসে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করেন। এর কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর 'A List of Indian Economics Products' (1884), 'A Description Catalogue of Indian Products' (1888), 'A Hand Book of Indian Products' (1888), ইউরোপ ভ্রমণ কাহিনি 'A visit to Europe' (1888) প্রকাশিত হয়। এছাড়াও ত্রৈলোক্যনাথের বাংলায় লেখা গ্রন্থগুলি হল: 'কঙ্কাবতী'(১৮৯২), 'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৬), 'ফোক্

লা দিগম্বর' (১৯০১), 'মুক্তামালা' (১৯০২), 'ময়না কোথায়?' (১৯০৪), 'মজার গল্প' (১৯০৬), 'পাপের পরিণাম'(১৯০৮), 'ডমরুচরিত' (১৯২৩) প্রভৃতি।

ত্রৈলোক্যনাথের লেখালেখির প্রবণতা:

প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতার সূত্র ধরেই আমরা ত্রৈলোক্যনাথের মানসিক প্রবণতা ও শিল্প-সৃষ্টির পরিচয় পেয়ে থাকি। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দেশের সাময়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ব্যঙ্গ-রসিকের দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যের জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মানব-চরিত্রের অসঙ্গতি প্রদর্শনের জন্যই আমরা তাঁর রচনায় ভূত-প্রেতের আবির্ভাব হতে দেখি। তবে কখনই তাঁর শুধু ভূতের গল্প বলা উদ্দেশ্য ছিল না। পরিবর্তে মানুষের চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব তথা মহত্বের নানা দিক নির্দেশ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। 'কঙ্কাবতী', 'পাপের পরিণাম', 'ভূত ও মানুষ'— ইত্যাদি গল্পে গ্রন্থে তারই প্রয়াস লক্ষ্যণীয়।

কঙ্কাবতী (১৮৯২):

ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম সাহিত্যগ্রন্থ 'কঙ্কাবতী'(১৮৯২) রচিত হয়। এর চার বছর পরে তিনি সরকারি কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসের ভৌতিক চরিত্র স্কল ও স্কেলিটনকে অবলম্বন করে লেখক ব্যাঘাত করেছেন ইংরেজের অনুকরণপ্রিয় দেশের এক শ্রেণীর মানুষকে, যারা নকল সাহেবিয়ানাকে মনে করেন সামাজিক মর্যাদার সূচক। উপন্যাসে দেখি দুটি চরিত্রই খেতুকে বিশাল ধনসম্পদের অধিকারী হতে সহায়তা করেছে, যদিও নাগেশ্বরীর হৃদয়হীনতায় সেই অধিকার ভোগ করতে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। ভৌতিক চরিত্রগুলির আচার-আচরণের অসঙ্গতি যেমন লেখকের সামাজিক ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে উঠেছে, তেমনি জীবিত মানুষের হৃদয়হীনতা ও স্বার্থপরতার সঙ্গে তাদের হৃদয়বত্তার বৈপরীত্যের প্রতীকী উপস্থাপনাও লক্ষণীয় এই দুটি চরিত্রে।

স্কল ও স্কেলিটনের মাধ্যমে এদেশের একশ্রেণীর ইঙ্গভাবাপন্ন মানুষের ইংরেজি কেতা-দূরস্থ প্রথাপ্রীতিকে ব্যঙ্গেবিদ্ধ করেছেন। আর তা করতে গিয়ে লেখক ঔপনিবেশিক যুগের পরানুকরণের অলজ্জ মানসিকতা এবং নিজেদের যুক্তি-বিচারবুদ্ধি ও মর্যাদায় অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধাকে ব্যঙ্গোপকরণ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাদের কোম্পানির ইংরেজি নাম রাখার যুক্তি এভাবে দেখাতে চেয়েছে, 'যদি নাম রাখিতাম, "খুলি, কঙ্কাল এবং কোম্পানী" তাহা হইলে কেহই আমাদিগকে বিশ্বাস করিত না। সকলে মনে করিত ইহারা জুয়াচোর। ... যখন মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা জুতা কি শরাপ কি হ্যাম বা শূকরের মাংসের দোকান করেন, তখন সে দোকানের নাম দেন, "লংম্যান এন্ড কোং"। ... দেশী দোকানির কথা লোকে বিশ্বাস করে না! আবার দেখ, বেদের কথা বল, শাস্ত্রের কথা বল, বিলিতী সাহেবেরা যদি ভাল বলেন, তবেই বেদ পুরাণ ভাল হয়। দেশী পণ্ডিতদের কথা কেহ গ্রাহ্যও করে না।'[৩]

পরানুকরণের পথে তখন এদেশের মানুষের আত্মসম্ভ্রম যে কতখানি তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে, বিভিন্ন কোম্পানি বা দোকানের নামকরণ থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। আসলে এর পেছনে আছে নিজেদের অধোগতি ও নিজেদের প্রতি আস্থাহীনতা। এমনকি নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা বলে বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট তাদের ছিল না। প্রসঙ্গত, মনে আসে এদেশের ইংরেজি-শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের ইঙ্গনবীশী ও অন্ধ অনুকরণপ্রবণতা বিষয়ে বিবেকানন্দের উক্তি— বরফ খাওয়ার ফলে জাত যাওয়া সংস্কারের প্রতি লেখকের তীব্র কটাক্ষ বর্শিত হয়েছে। খেতু আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

> "একটু বরখ খাবে গদাধর?" আমি বলিলাম, "না দাদাঠাকুর। আমি বরখ খাইব না, বরফ খাইলে আমার অধর্ম হইবে, আমার জাতি যাইবে।"[৪]

জনার্দন চৌধুরী উত্তর করিলেন, 'শিবচন্দ্রের পুত্র ঐ যে খেতা, যে কলিকাতায় রামহরির বাসায় থাকিয়া ইংরেজি পড়ে, সে বরফ খায়। বরফ সাহেবেরা প্রস্তুত করেন, সাহেবের জল। শিরোমণি মহাশয় বিধান দিয়াছেন যে, বরফ খাইলে সাহেবত্ব প্রাপ্ত হয়। সাহেবত্ব প্রাপ্ত লোকের সহিত সংস্রব রাখিলে সেও সাহেব হইয়া যায়। তাই, এই খেতার সহিত সংস্রব রাখিয়া সকলেই

আমরা সাহেব হইতে বসিয়াছি।' জাতিরক্ষার্থে সাহেব না হবার এই কারণের পশ্চাতে, সত্যকার কোন সৎ উদ্দেশ্য যে নেই একথা বলা বাহুল্য। ধন ও জাতিরক্ষার এই অহেতুক গোঁড়ামির পশ্চাতে ভণ্ডামিকারণ নিহিত।

গোয়ালিনী— কঙ্কাবতীকে বলিল সকলেই বলিতেছে, 'তুমি বরফ খাইয়াছ, তোমার জাতি গিয়াছে, তোমার মাকে ঘাটে লইয়া যাইলে আমাদের জাতি যাইবে।'[৫]

সাহেবিয়ানা তৎকালীন সমাজের আর একটি বিশেষত্ব। পদানত ভারতবাসী ইংরাজী জানার মোহ ত্যাগ করা দূরের কথা বরং অন্ধ হয়ে ইংরেজি জানায় আত্মসমার্পণ করে গর্ববোধ করত। কোম্পানির নাম থেকে শুরু করে নিজের নাম পর্যন্ত ইংরেজির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও বিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম হত। কোম্পানির নাম ইংরেজিতে রাখার কারণ, "স্কল, স্কেলিটন এণ্ড কোং।" ইংরেজি নাম রাখিয়াছি কেন, তা জান? তাহা হইলে পসার বাড়িবে, মান হইবে, লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিবে। ... বরং ইংদ্রুজ, পিংদ্রুজ দোকানির কথা লোকে বিশ্বাস করে, তবু দেশী দোকানির কথা লোকে বিশ্বাস করে না।'[৬] জাতীয় জাগরণের কালে, মানুষের এই বিজাতীয়সুলভ মনোভাব ও আচারণ, মানব চরিত্রের এক হাস্যকর অসঙ্গি, ত্রৈলোক্যনাথের বিদ্রুপ-কটাক্ষে জর্জরিত হয়েছে। "ব্যাঙ আরও জ্বলিয়া উঠিলেন, ... কেবল বলিবে, ব্যাঙ, ব্যাঙ, ব্যাঙ! কেন? আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে কি মুখ ব্যথা হয় নাকি? আমার নাম, মিস্টার গমীশ।"[৭]

'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৬):

ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর 'ভূত ও মানুষ' বইয়ের 'লুল্লু' গল্পে (৪র্থ অংশে) দেখা যায়, আমরীরে স্ত্রীকে লুল্লু নামক ভূত নিয়ে যায় রাতের বেলা। পরে সেই স্ত্রীকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমীর সন্ধান পায় অন্য এক ভূত। সেই ভূত বলেছে— '... দেশীয় সংবাদপত্রসকল তোমাদিগকে কত সুশিক্ষা দিয়া থাকে, যদি কায়মনচিত্তে পালন করিতে, তাহা হইলে তোমাদের এই দুর্দ্দশা হইত না। এই দেখ দেশ একেবারে নির্দ্ধন হইয়া যাইতেছে, বিলাতী কাপড়ের দ্বারা বিদেশীয়া ধন লুটিতেছে! ভাল, কাপড় না পরিলেই ত' হয়? যদি কাপড় না পর, তাহা হইলে ত' আর তোমাদিগের ধন

কেহ লুটিতে পারে না। রেল করিয়া বিদেশীয়রা ধন লইয়া যাইতেছে। ভাল, রেলে না চড়িলেই ত' হয়, পায়ে হাঁটিয়া কেন কাশী-বৃন্দাবন যাও না? তা যদি কর, তাহা হইলে বিদেশীয়েরা তোমাদিগের দেশে রেল করিতে কখনই আসিবে না, দেশের ধন দেশেই রহিয়া যাইবে। সেইরূপ আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করি।'[৮]

ভূত ও মানুষ বইয়ের 'বীরবালা' নামক গল্পের পঞ্চম পরিচ্ছেদ 'সাহেব ভূত' অংশে দেখি, অদ্ভুতরস, আপাত উদ্ভট কাহিনি। পথে কমলা নামে একটি শিশু 'একদিন গাছতলায় বসিয়া কাঁদিতেছিলেন, এমন সময় সেই পথ দিয়া একটি ইংরেজ বণিক ও তাঁহার স্ত্রী যাইতেছিল।'[৯] তারপর শিশুটিকে দেখে তাদের দয়া হয় এবং তারা শিশুটিকে বাড়িতে নেয়। তখন থেকে শিশুটি সেখানেই থাকতে শুরু করে এবং কিছু দিনের মধ্যে ইংরেজ বণিক দম্পত্তির সৌভাগ্যের উদয় হয় ও বিপুল অর্থলাভ করে স্বদেশে গমন করে। শিশুটিকেও তাদের সঙ্গেই নেয়।

কমলা কে? তার কি গল্প? কমলার পিতা-শাহ সুলতান। তিনি বিপুল অর্থ রেখে পাঁচ বছরের শিশুকন্যা কমলাকে সেই বিষয়-সম্প্রতির উত্তরাধিকারী করে মারা গেলে তার ভ্রাতুস্পুত্র ফরাগৎ হোসেন কন্যাটিকে তাড়িয়ে দিয়ে সম্পত্তি ভোগ করতে থাকে এবং নানারূপ দুষ্ক্রিয়ার দ্বারা অল্পদিনের মধ্যে বিষয় নষ্ট করে পথের ভিখারি হয়ে অবশেষে সাহেবের বাড়িতে চাকরি করতে থাকে। এইসমস্ত কথা জানার পর বীরবালা শিশুটিকে উদ্ধার করে। একথা শুনে বীরবালা হতাশ হয়ে পড়ে কারণ বোগদাদে এসেও কমলাকে পেলেন না। পরে উপায় না দেখে 'এক্ষণে বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। বহুদিন পরে ভূমধ্যসাগর-কূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কি করিয়া বিলাতে যাইবেন, বিষণ্নবদনে সেইখানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। নিজের দূরদৃষ্ট ভাবিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। নিঃশ্বাসটি যেই ফেলিয়াছেন, আর কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া নিকটে কে কাঁদিয়া উঠিল। চমকিত হইয়া বীরবালা চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটি সাহেব-ভূত! সাহেব ভূত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলে, "ওগো তুমি আমার সহিত এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার কেন করিলে? জোরে নিঃশ্বাস ফেলিলে কেন? এই দেখ, আমার শরীরের যোড় সব খুলিয়া গেল।"'[১০]

সাহেব ভূতের কথা মত বীরবালা কাদামাটি দিয়ে খুলে যাওয়া ভূতের শরীরকে আবার যোড়া লাগায়। এবার সুস্থ হলে সাহেব ভূত বীরবালার এখানে আসার কারণের কথা জানতে চাইলে বীরবালা বিলেত যাওয়ার উপায় জানতে চায়। এতে সাহেব ভূত জানায়, "তার ভাবনা কি? আমি এইক্ষণেই তোমাকে টেলিগ্রাফে বিলাত পাঠাইয়া দিতেছি। জন-সাহেব কমলাকে বিলাত লইয়া গিয়াছেন, রঙ্গিণী মেমের নিকট তোমাকে আমি পাঠইব। আমি জীবিত থাকিতে রঙ্গিনী আমার স্ত্রী ছিলেন। জন-সাহেবের মেমের সহিত রঙ্গিণীর ভাব আছে।"[১১] এই বলে সাহেব ভূত সমুদ্রের বালি দিয়ে বড় একটি টেলিগ্রাফের তার প্রস্তুত করে বীরবালাকে তার ভিতর প্রবেশ করে দিলেন। বীরবালা তার ভিতর প্রবেশ করলে সাহেব ভূত তাদের বাঁটটি টক্ টক্ টক্ করে নাড়ে আর সেই মুহূর্ত বীরবালা বিলাতে গিয়ে একেবারে রঙ্গিণীর ঘরের ভিতর গিয়ে উপস্থিত হয়। সেই সময় রঙ্গিণী আরশির সামনে দাঁড়িয়ে মুখে পাউডার মাখছিলেন, এমনসময় বীরবালার প্রবেশে রঙ্গিণী চমকিয়ে যায়। পরে অবশ্য বীরবালা পরিচয় দিলে দুই-একদিন তার কাছে রেখে রঙ্গিণী জন-সাহেবের নিকট নিয়ে যায়। জন-সাহেব জানায়, 'বোগদাদ হইতে কমলাকে তিনি বিলাতে আনিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এখানে আনিয়া কন্যাটিকে বিজয়ার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। বিজয়া অতি সম্ভ্রান্ত মহিলা, অতি দয়াময়ী, অতি পবিত্র-প্রাণা। শিশুটিকে তিনি নিজের কন্যার ন্যায়, অতি যত্নে প্রতিপালন করিতেছেন।'[১২] একথা শুনে বীরবালা বিজয়ার নিকট গেলে বিজয়া অতি মধুরভাবে জানায়, "কমলা আমার প্রাণস্বরূপ। কমলাকে আমি কিছুতেই দিতে পারিব না।"[১৩] এদিকে বীরবালাও ছাড়ার পাত্রী নয়। এরপর বীরবালা বিজয়ার নিকট অনেক কাকুতি-মিনতি, কাতর আবেদনে, স্তুতি বিনতি শুনে বিজয়ার মনে দয়া হয় এবং বীরবলার হাতে কমলাকে সমর্পন করেন। 'বীরবালা তাঁহার কে হন, তাহা শুনিয়া কমলার আর আহ্লাদের অবধি রহিল না। মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু সকলের মুখ দেখিবেন, সেজন্য কমলার মনে অপার আনন্দের উদয় হইল। বীরবালার গলা ধরিয়া কমলা কত কাঁদিলেন, কত হাসিলেন।'[১৪]

রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০):

বাংলা ব্যঙ্গ গল্পের ইতিহাসে পরশুরাম ছদ্মনামে রাজশেখর বসুর (১৮৮০-১৯৬০) আত্মপ্রকাশ এক নতুন অধ্যায় সূচনা করেছিল। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের সন্নিকটে বামুন পাড়া গ্রামে মামার বাড়িতে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল নদীয়া জেলার বীরনগরে। পিতা চন্দ্র শেখরের চার পুত্রের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। চন্দ্রশেখর সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।

চন্দ্রশেখর বাবু প্রথমে যশোহর জেলার একজন সামান্য ডাক বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। পরবর্তীকালে তাকে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার ম্যানেজার পদে বহাল থাকতে তাঁকে বাংলার বাইরে অতিবাহিত করতে হয়। রাজশেখরও পিতার সঙ্গে বাংলার বাইরে কাটান। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে দ্বারভাঙ্গার রাজ স্কুলে পড়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি ১৮৯৫-৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাজশেখর পাটনা কলেজে আর্টস পড়েন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাজশেখর পাটনার পর্ব চুকিয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হন। এবছরেই তাঁর মৃণালিনী দে'র সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্সে দ্বিতীয় শ্রেণির অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর এক বছর পরে অর্থাৎ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে রাজশেখর রসায়নে এম. এ. পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হন।

রাজশেখর এম. এ. পরীক্ষায় পাশ করার দু-বছরের মধ্যে আইন অধ্যয়ন করে বি. এল. পরীক্ষায় পাস করেন। কিন্তু আইন পাস করার পরেও তিনি হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করেননি। পরিবর্তে "১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গ সাক্ষাৎ হল এবং রাজশেখর বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কস-এ রাসায়নিকের পদে বহাল হলেন। ... এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টব্দে তিনি বেঙ্গল কেমিকেলের সর্বময় কর্তৃত্বের ভার গ্রহন করলেন। সেই থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানটির প্রভূত উন্নতিসাধন করে অবসর গ্রহণ করেন।"[১৫]

ইউরোপের সঙ্গে সংযোগ:

রাজশেখর বসুর ব্যক্তি জীবনে ইউরোপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযোগ ঘটেনি। রাজশেখর বসু তাঁর বিজ্ঞান শিক্ষা, আইন শিক্ষা এবং বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের (বেঙ্গল কেমিকেল) কর্তৃত্ব গল্পগুলির উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করেছে। পরবর্তীকালে তিনি জানিয়েছেন, "বাল্যের কবিতা রচনার সখের কথা বাদ দিলে এই প্রতিষ্ঠানেই আমার সাহিত্য রচনার আরম্ভ, এইখানেই তার হাতে খড়ি বলা যায়। অবশ্য মূল্য তালিকা তৈরি করা বা বিজ্ঞাপন লেখাকে যদি কেউ সাহিত্য বলে গ্রাহ্যও করেন। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' এর আগে আমার যা কিছু বাংলা রচনা তা এর বাইরে কিছু নয়।"[১৬] যেমন 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের কোম্পানির আইনের রন্ধ্র সন্ধানে যাঁর জ্ঞান পাকা। আবার বিজ্ঞান বিদ্যাও তাঁর কাজে লেগেছে। কুমড়োর চামড়া কস্টিক পটাস দিয়ে বয়েল করলে ভেজিটিবল শু হলেও হতে পারে– এ ধারণা সকলের মাথায় আসার কথা নয়।

লেখালেখিতে ও ইউরোপ প্রসঙ্গ:

রাজশেখর বসুর গ্রন্থাবলী দুটি নামে পরিচিত, রাজশেখর বসু ও পরশুরাম। তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই দুই নামের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন। আমরা রাজশেখর বসু নামের গ্রন্থাবলীতে তাঁর মনীষার পরিচয় এবং পরশুরাম নামের রচনাবলীতে শিল্পীর পরিচয় পেয়ে থাকি। আমাদের আলোচনায় রাজশেখর বসু অপেক্ষা পরশুরামের রচনাবলী অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

রাজশেখর বসু যে সময়ে সাহিত্য জগতে অবতীর্ণ হন (প্রথম গল্পগ্রন্থ 'গড্ডলিকা'র প্রকাশ ১৯২২) তার সমসাময়িক পূর্বে একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৯), রুশ বিপ্লব (১৯১৭), বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ইত্যাদি ঘটনা। এরফলে একদিকে দেশীয় রাজনীতির টানাপোড়েন, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে কবলিত ভারতবাসীর দারিদ্র, বেকারত্ব ভারতবর্ষকে এক গভীর সংকটের মুখে ফেলেছিল। এই সময় সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল এক শ্রেণির মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

পরশুরাম এই মধ্যবিত্ত জীবনের কতগুলি বিশেষ দুর্বলতা ও মিথ্যাকে অহরহ প্রত্যক্ষ করেছেন, যাকে তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি, আর তাকেই যেন গল্পের মধ্যদিয়ে তিনি প্রতিবাদ করেছেন। ব্যবসা, ধর্ম, প্রেম, দাম্পত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি মানুষের সর্বপ্রকার ভণ্ডামি, ভাববিলাসিতা ইত্যাদিকে পরশুরাম ব্যঙ্গ করেছেন। তবে সবক্ষেত্রেই প্রকাশ ছিল সংযত ও সুমিত। ১৩২৯ বাংলা সালে "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় তাঁর প্রথম 'বিরিঞ্চি বাবা' গল্প প্রকাশের মধ্যে দিয়ে আবির্ভাব হয়েছিল। ১৯২২ এই প্রথম গল্প প্রকাশের পর থকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত পরশুরামের যে গল্পধারা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বাঙালির সামাজিক পরিবর্তন সুষ্ঠভাবে পরিলক্ষিত হতে দেখি। 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলী'র গল্পগুলিতে আমরা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পূর্বের সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্র দেখতে পাই। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সামাজিক অশান্তি ও অবক্ষয়, দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ, স্বাধীনতালাভ ও তার অব্যবহিতপরে ও শান্তির চিত্র একাধিক গল্পে চিত্রিত হয়েছে। পরশুরামের লেখা গল্প সংখ্যা একশ আটটি এবং গল্পগ্রন্থ সংখ্যা ন'টি। গল্পগ্রন্থগুলি হল— "গড্ডলিকা", "ধুস্তরীমায়া ইত্যাদি গল্প", "গল্পকল্প", "কজ্জলী", "আনন্দবাঈ ইত্যাদি গল্প", "চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প", "হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প", "নীলতারা ইত্যাদি গল্প", "কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প"।

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড (১৯২২):

এই গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে। কলকাতায় তখন শেয়ারবাজারের খুব জমজমাট। যে শেয়ার বাজার ইংরেজেরই সৃষ্টি করা। এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরে শেয়ার বাজারও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শেয়ার ব্যবসার নামে চলে অসাধু ব্যবসার কারবার। রাজশেখর বসু এই গল্পে একাধারে ধূর্ত ব্যবসায়ীদের অসাধুতাকে ও বাঙালীর ধর্মান্ধতাকে ব্যঙ্গ করার পাশাপাশি অতি সতর্ক ও সাবধানী মানুষের লোভকেও বিদ্রুপ করেছে।

গল্পের প্রথমে আমরা জানতে পারি, শ্যামানন্দ নানা রকম কারবার করে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। বর্তমানে মানুষের ধর্মগত কুসংস্কারকে মূলধন রূপে খাটানোর জন্য সম্প্রতি তিনি 'ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল' নামে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য ছিল 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' কোম্পানির নামে বাজারে প্রচুর শেয়ার ছাড়া এবং শেয়ার হোল্ডারদের যোগার করা। সেই শেয়ারের টাকায় সিদ্ধেশ্বরী মন্দির নির্মাণ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন সম্ভব এবং তা হিসেব করে সকলকে বোঝাতেও তিনি সক্ষম হন। আর এই লোভের ফাঁদে পা দিলেছিলেন রিটায়ার্ড ডেপুটি তিনকড়িবাবু। তিনি সারা জীবনে মান, যশ যথেষ্ট পেয়েছিলেন এমনকি অর্থেরও অভাব হয়নি। স্বচ্ছলভাবেই সারা জীবন কেটেছে। তবুও জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অধিক লাভের আশায় তিনকড়িবাবু শ্যামানন্দর কোম্পানির শেয়ার কিনে সর্বশান্ত হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা শ্যামবাবুর শ্যালক বিপিনবাবু ছিলেন একটু সাহেবি মেজাজের লোক। তিনি একসময় বিলেতে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। এখন সে 'পরিধানে সাদা প্যান্ট, কাল কোর্ট, লাল নেকটাই, হাতে সবুজ ফেল্ট হ্যাট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ক্ষীণকায়, গোঁফের দুই প্রান্ত কামানো।'[১৭]

তিনকড়ি চরিত্রটির মধ্যে ইংরেজের অধীনে কাজ করা এদেশীয় হাকিমের একটি ব্যঙ্গচিত্র তুলে ধরেছেন। ইংরেজ তোষামদেই ছিল এজাতীয় আমলাদের যোগ্যতার মাপকাঠি। এজাতীয় আমলাদের সাহেবপ্রীতিকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন লেখক তিনকড়ি চরিত্রের মাধ্যমে। তিনকড়ি কোল্ডহাম সাহেবকে লিখেছেন, "হুজুর, তোমরা রাজার জাত, দু-ঘা দাও তাও সহ্য হয়, কিন্তু দেশী ব্যাঙাচির লাথি বরদাস্ত করব না।"[১৮] তাই তিনি কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার কেনার আগে কোল্ডহাম সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করতে চান। এমনকি সর্বস্বান্ত হওয়ার পরেও সেই কোম্পানির নামে নালিশ জানাতেও সেই সাহেবকে চিঠি লিখতে চায়। আসলে তিনকড়িবাবুর 'একদিকে অমিত ধনলোভ দেখা দিয়াছে, অন্যদিকে পরকালের লোভটাও ছাড়িতে পারা যায় নাই, এমত সময়ে এমত সমাজে এই দুই দুই রিপুর তাড়নায় সমস্ত সংসারটাই একটা সুবৃহৎ 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' কোম্পানিতে পরিণত হইয়াছে, আর দলে

দলে শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী গেরুয়া ব্যাগ ও ফোঁটাকাটা ললাট লইয়া অপরের ললাটে লালবাতির শিখটি জ্বালাইয়া দিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে।[১৯]

মুনাফাখোর গণ্ডেরি ভেজালের ব্যবসা করলেও তার মধ্যে কোন পাপবোধ কাজ করে না। সে মনে করে এ পাপ হল কাসেম আলি— কারণ সে স্বয়ং এই ভেজাল মেশায়, সুদ খায়। আর গণ্ডেরি শুধু টাকা দেয়, সে হাতেও স্পর্শ করে না, চোখেও দেখে না। তা ছাড়া 'হামি তো সির্ফ মহাজন আছি—রুপয়া দে কর্ খালাস। ... হমার পুন্‌ভি থোড়া-বহুত জমা আছে। একাদ্‌সী, শিউরাত, রামনওমীমে উপবাঁস, দান-খয়রাত ভি কুছু করি।'[২০] এই সমস্যা হল মানুষের চিরকালীন সমস্যা। আনুষ্ঠানিকতা ও বিবেকের বিরোধ, মন ও কর্মের বিরোধ যার ফলে গণ্ডেরির কর্ম ও ধর্মের মধ্যে বিরোধ, অসঙ্গতি। পরশুরাম ইঙ্গিত করেছেন এই ভাবের ঘরে চুরির প্রতি। রাজশেখর বসু তাঁর 'জাতিচরিত্র' প্রবন্ধে ধর্ম বিষয়ে স্পষ্ট মতামত তিনি দিয়েছেন—

> "আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশের মত নেশাখোর নই, কিন্তু একটা প্রবল মানসিক মাদক এ দেশের জনসাধরণকে অভিভূত করে রেখেছে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তার থেকে মুক্ত নয়। আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি বলে গর্ব করি, কিন্তু আমাদের ধর্মের অর্থ প্রধানত বাহ্য অনুষ্ঠান, নানা রকম অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস, এবং ভক্তি চর্চা। অর্থাৎ পুরোহিত মারফত পূজা, কবজ-মাদুলি, আর যদি ভক্তি থাকে তবে ইষ্টদেবের আরাধনা। আমাদের যেটুকু পুরুষকার আছে দৈবের উপর নির্ভর করে তাও বিনষ্ট হচ্ছে। ... ধর্ম প্রজাগণকে ধারন করে। অর্থাৎ সমাজহিতকর বিধি সমূহই ধর্ম।"[২১]

ধর্মের নামে মানবিকতার লাঞ্ছনা তাঁকে পীড়িত করেছে। তাই সমাজ জীবনে যখনেই তিনি ধর্মের নামে ভণ্ডামি দেখেছেন, তখনই তার প্রতিবাদ করেছেন বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে।

উপেক্ষিতা (১৯২৯):

গল্পের পাত্র চটক 'সে যে পাঁচ বৎসর বিলাতে থাকিয়া সেরেফ এটিকেট অধ্যয়ন করিয়াছে। এমন সুপাত্র আজকালকার বাজারে দুর্লভ।'[২২] পাত্রী গরিমার পিতামাতার কলকাতায় চাকরি করলেও বদলি হয় ঢাকায়। তাই তাদের মনোবাঞ্ছা কলকাতা ত্যাগের পূর্বেই কন্যাকে বাগদত্তা দেখতে চান। 'তাই তাঁহারা যাত্রার পূর্বসন্ধ্যায় ভাবী দম্পতিকে বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ দিয়া দোতলায় বসিয়া সুসংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন।'[২৩] এমন সুপাত্রকে হাত করতে পাত্রী গরিমার আন্তরিকতার কোন ত্রুটি করেনি। সে পিয়ানো বাজিয়ে একের পর এক গান শুনিয়েছে এবং তার মাঝে কথাবার্তায় গল্প জমিয়ে তাকে ধরে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে একসময় গরিমা ক্রন্দনরত গলাকে একটু সামলে অনুরোধ করে বলে— 'আর একটু বসুন'।

এ গল্পে ইঙ্গবঙ্গ আধুনিক সমাজে বয়স্থা কন্যার উপযুক্ত পাত্রকে হাত করার জন্য কন্যা ও কন্যার পিতা-মাতার হাস্যকর প্রচেষ্টা প্রয়াস লক্ষ করে থাকি। কুমারীর গায়ে পড়ে আত্মীয়তা গড়ে তোলার নিলর্জ্জ প্রগলভতা এবং একই পাত্রকে কেন্দ্র করে অনেক পাত্রীর অবিরাম প্রণয় প্রতিযোগিতা ও পারস্পরিক ঈর্ষা— সবকিছুই লেখক ব্যঙ্গের আড়ালে তুলে ধরেছেন। চটক পাঁচ বছর 'বিলেতে সেরেফ এটিকেট অধ্যয়ন' করে এসেছে; তাই চিমটি কাটলেও টুঁ শব্দ করে না— কারণ তা এটিকেট বিরুদ্ধ। আসলে কৃত্রিম সমাজ-ব্যবস্থার বেহায়াপনা এবং ভদ্রতাবোধ, দুই যেখানে মাত্রাতিরিক্ত— সেখানে কল্পনার মাত্রাকে আর একটু সীমা পার করে গল্পে ব্যঙ্গের কষাঘাত করেছেন। সভ্য-ভব্য ও আধুনিক সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ ও প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি সবই যেন এক রহস্যময় হৃদয় সম্পর্কশূন্য। শুধু বাইরের ঠাটবাট বজায় রাখতে গিয়ে তারা সমস্ত অন্তরের সম্পদটুকুকে হারিয়ে ফেলে পরিপূর্ণভাবে 'লেডিজম্যান' হয়ে উঠেছে।

ভূশণ্ডীর মাঠে:

ভূতপ্রেত নিয়ে গল্প রচনার কুশলতা ও তার মধ্য দিয়ে মানব সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি ব্যঙ্গ প্রদর্শনেও বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন পরশুরাম। এই গল্পের কালসীমা জন্ম থেকে জন্মান্তরের। যে জীবন সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। সেই জীবনও পরশুরামের লেখনীতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের জীবনের চাওয়া-পাওয়া, নানা সঙ্গতি ও অসঙ্গতি জড়িত হয়ে ওঠে, আর তখনই তা ব্যঙ্গ-কৌতুকে পরিণত হয়। ভৌতিক জীবনের প্রেম, প্রার্থনা, বিবাহ, কলহ ইত্যাদি সবই আমাদের কাছে নতুন ছবি। তাইতো পেতনী, শাকচুন্নী, ডাকিনী— ইত্যাদি প্রেতাত্মার কাছে ব্রহ্মদৈত্যরূপী শিবুর প্রেম ভিক্ষা ও শেষে প্রেত সংসারের অমীমাংসিত দাম্পত্য সমস্যার ভয়াবহ দৃশ্য আমাদের হাস্যরসের অতলে নিয়ে যায়। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামীর দাম্পত্য সমস্যা নিয়ে পরশুরাম 'ভূশণ্ডীরমাঠে' গল্পটি লিখেছেন—

'সাহেবরা জীবদ্দশায় যে স্বাধীনতা ভোগ করেন, ভূতাবস্থায় তাহা অনেকটা কমিয়া যায়। বিলাতী প্রেতাত্মা বিনা পাসে ওয়েটিংরুম ছাড়িতে পারে না। যাঁহারা séance দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন বিলাতী ভূত নামানো কি-রকম কঠিন কাজ। হিন্দুর জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত কারণ আমরা পুনর্জন্ম স্বর্গ, নরক, কর্মফল ত্বয়া হৃষীকেশ, নির্বাণ, মুক্তি সবই মানি।'[২৪]

'জর্জটি সাহেব বিলেত গেলে আমিও পেনশন নিয়ে এক শখের যাত্রা খুললুম। তার পর পরমাই ফুরুলে এই হেথা আড্ডা গেড়েছি।' [২৫]

স্পূক, পিক্সি, নোম, গব্লিন প্রভৃতি গোঁফ-কামানো বিলাতি ভূত বাঁশি বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। ...[২৬]

এই গল্পের মধ্যে কিছুটা প্রেততত্ত্ববাদীদের এবং কিছুটা সমকালীন সাহিত্যে পরকীয়া প্রেমের প্রতি সুক্ষ্ম ব্যঙ্গ আছে।

গামানুষ জাতির কথা (১৯৪৫):

পরশুরামের ব্যঙ্গ-কৌতূক রাজনীতির জটিল আবর্তের মধ্যেও নেমে এসেছিল। সেখানে তিনি দেখাতে চেয়েছেন মানুষের অপরিসীম লোভ, হিংসা কুটিলতাকে। মুখে তারা যতই শান্তি ও সাম্যের কথা বলুক না কেন বাস্তবে কিন্তু এরা চায় অশান্তি ও অসাম্য। নিজেকে বড় করে তোলার, শক্তিশালী বলে প্রতিষ্ঠিত করার উদগ্র আকুলতা তাদের সমগ্র চেতনা আচ্ছন্ন। সত্য, ন্যায়, ধর্ম বলে যেন তাদের কাছে কিছু নেই। তাই তাদের শান্তি স্থাপনের যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে কত মিথ্যা ও হাস্যকর তাকেই লেখক দেখিয়েছেন।

গল্পের পটভূমিতে লন্ডন তথা ইউরোপ বিদ্যমান। 'লন্ডন প্যারিস নিউইয়র্ক পিকিং কলকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরে রাস্তার নীচে যে গভীর ড্রেন ছিল তাতে লক্ষ লক্ষ ইঁদুর বাস করত। ... এদের মানুষ বলেই গণ্য করা উচিত মনে করি। আমাদের মতন প্রাচীন মানুষের সঙ্গে প্রভেদ বোঝাবার জন্য এই গামা-রশ্মির বরপুত্রগণকে 'গামানুষ' বলব'।[২৭] গামানুষ জাতির কথার পাত্রগুলি মানুষ নয়। এদের উৎপত্তি সম্পর্কে লেখকের মতে, মানুষ বহুকাল আগে পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে, এরা গোড়ায় ছিল ইঁদুর এখন আণবিক রশ্মির প্রভাবে একপ্রকার মনুষ্যত্ব লাভ করেছে। এদেরই বিচিত্র ইতিহাস হল এই গল্প। 'দু-চারটি রাষ্ট্র অসৎ উপায়ে বড় বড় সাম্রাজ্য লাভ করে দেদার কাঁচা মাল আর আজ্ঞাবহ নিস্তেজ প্রজা হস্তগত করেছে, উপনিবেশও বিস্তর পেয়েছে। কিন্তু আমরা বঞ্চিত হয়েছি, আমাদের বাড়তে দেওয়া হচ্ছে না। যদি যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করতে হয় তবে বিশ্বসম্পত্তির আধাআধি বখরা আমাদের দিতে হবে। ...' [২৮]

কচিসংসদ:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর তৃতীয়-চতুর্থ দশকের প্রথম দিকে বেশ কিছু ধনী শিক্ষিত মানুষ ছিল যাদের তরুণ প্রজন্ম উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিরাট অর্থ-সম্পদের জোড়ে নিজেদের খেয়াল খুশিমত জীবন যাপন করতেন। এখানে তৎকালীন সমাজের তারুণ্যের রুচি বিকৃতি, উচ্ছ্বাসের অসংযমকে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন। গল্পটিতে লেখক দার্জিলিং-এর মুন সাইন ভিলায় কচিসংসদের সদস্যদের সমবেত হওয়া, কেষ্ট-ব্রজেন-পদ্মর-হাইকোর্টশিপ ব্যবস্থা, কেষ্টর রাত

বারোটায় টুনি দিদির ঘরের কাছে টিপিটিপি আগমন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ব্যঙ্গ-কৌতুক সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া গল্প কথক ব্রজেনের মধ্যে আমরা ইংরেজের জিনিসে প্রীতি লক্ষ্য করি। সে বলে, 'যানের রাজা রেলগাড়ি, রেলগাড়ির রাজা ই. আই. আর।'[২৯] তার গৃহিণীর ইংরেজি বিদ্যা ফার্স্ট বুক পর্যন্ত থাকলেও গুটিকতক ইংরেজি শব্দ শিখেছে এবং সুযোগ পেলেই সেগুলি তারই ওপর প্রয়োগ করে থাকে। 'হোয়াট-হোয়াট-হোয়াট', হোয়াট ইয়ে, হ্যাং ডালহৌসী,— এমন সব বাংলা মেশানো ভাঙ্গা বিকৃত ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ নিঃসন্দেহে ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে ওঠেছে।

স্বয়ম্বরা:

এই গল্পে দেখি বৃষ্টির দিনে বিনোদ উকিল চাটুজ্যে মশায়ের বাড়িতে আটকে পড়ে। এই পরিবেশে বিনোদ চাটুজ্যে মশায়কে গল্প বলতে বললে, চাটুজ্যে মশায় তার ট্রেন ভ্রমণের সময় সাহেব, মেমের সাক্ষাৎ দর্শনাভিজ্ঞতার কথা বলেন।

'মেম নৃত্যপরা অপ্সরার মতন চঞ্চল ভঙ্গীতে এসে বেঞ্চে বসলেন। ... মেম বললেন— সিট ডাউন বাবু, ডরো মৎ।

দেবীর এক হাতে বরাভয়, অপরহাতে সিগারেট।'[৩০]

মেমের পাণিপ্রার্থী দুই সাহেব টিমি আর ব্লটো উভয়েই মদ খেয়ে শুয়োয়ের মত ঘোৎ ঘোৎ ঘুমাতে থাকে। মেম ব্রেকফার্স্ট করতে অন্য কামরায় গেলে তারা প্রথমে কথা কাটাকাটি থেকে মারামারি করতে থাকে। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে মেম ডাকে আর একজন নতুন সাহেবকে, নাম মিস্টার বিল বাউন্ডার। পরে চাটুজ্যে মশায়ের পরামর্শে মেম পূর্বের দুই পাণিপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করে সেই নতুন সাহেবকে বিয়ে করেন। বিলাতি এই নব দম্পতিকে আশীর্বাদ করেন চাটুজ্যে মশায়। তারা কলকাতায় গিয়ে গ্র্যান্ড হোটেলে বিয়ে করবে বলে চাটুজ্যে মশায়কে নিমন্ত্রণ করে আসতে অনুরোধ জানায়। চাটুজ্যে মশায় গ্র্যান্ড হেটেলে গিয়ে এক খানসামার কাছে জানতে পারে 'বিয়ের পরদিনই বেটী পালিয়েছে। সায়েব তাকে খুঁজতে গেছে।'[৩১] যে গল্পের মধ্যদিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার পোশাক-আশাক, খাদ্যাভ্যাস, মদ্যপান, ধূমপান, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি আচার-ব্যবহারের মিশ্রণে এ গল্পে ব্যঙ্গের সৃষ্টি করেছেন লেখক।

আসলে যে বিবাহ বন্ধন ভারতবর্ষে চিরন্তন, দেবতার আশীর্বাদপুত অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রূপে দেখা হয় পাশ্চাত্য সভ্যতায় তা যে যৌবনের বিলাস ছাড়া আর কিছু নয় তাই দেখানো হয়েছে এ গল্পে। সতীত্বের আদর্শ, ধর্মীয় অনুশাসন ইউরোপীয় সমাজে অবান্তর। এই বিবাহের ক্ষণিকতা, অন্তঃসারশূন্যতাকে পরশুরাম তীব্র কটাক্ষ করেছেন আলোচ্য গল্পে।

উলট-পুরাণ:

ইংরেজ শাসনে আমাদের মনে হয়েছিল ইংরেজরাই একমাত্র সভ্যজাত। তাই তাদের সব জিনিসকে আমরা অন্ধভাবে অনুকরণ করছিলাম, আমরা ভেবে দেখিনি তাতে আমাদের কতটা সুবিধা বা কতটাই অসুবিধা। ইংরেজ শাসনে ভারতীয় রাজনীতির শিক্ষায়-দীক্ষায়, আচার-ব্যবহারে ও বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে চেহারা ফুটে উঠেছিল তারই একটা ব্যঙ্গরূপ হল এই গল্প। আমাদের এই অন্ধতাই লেখকের ব্যঙ্গের উপকরণ হয়ে উঠেছিল। এ গল্পে ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্ক শাসক ও শাসিতের উল্টো দিক থেকে দেখানো হয়েছে। ভারতবাসীই শাসক এবং ইংরেজ শাসিত। এই বিপরীত কল্পনার মধ্য দিয়ে তীব্র হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে গল্পে। তাই তিনি পুরাণ কথাকে আমাদের সামনে লিখলেন, কিন্তু লিখলেন উল্টোভাবে।

এই গল্পের প্রথমে রিচমণ্ড ইঙ্গ-বঙ্গীয় পাঠশালায় পণ্ডিত মশায় ক্র্যাম ও তাঁর ডিক, টম, হ্যারি ইত্যাদি বালককদের নিয়ে ছাত্র পড়ানোর চিত্র। ডিক ইতিহাস পড়ছে, পড়াছে ক্র্যাম। ডিক। 'ইওরোপীয়গণের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হইতেছে। তাহাদের লোভ কমিয়াছে, অসভ্য বিলাসিতা দূর হইতেছে, ইহকালের উপর আস্থা কমিয়া গিয়াছে, পরকালের উপর নির্ভরতা বাড়িতেছে। ভারত-সন্তানগণ সাত-সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এই পান্ডববর্জিতদেশে আসিয়া নিঃস্বার্থভাবে শান্তি শৃঙ্খলা ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। আচ্ছা পণ্ডিতমশায়, এসব কি সত্যি? ক্র্যাম। ছাপার অক্ষরে যখন লিখেছে আর সরকারের হুকুমে যখন পড়াতে হচ্ছে তখন সত্যি বইকি।' [৩২]

রাজশেখর বসু দেশের পরাধীনতা, দেশবাসীর নানা যন্ত্রণা তাঁকে ভীষণভাবে ব্যথিত করে তুলেছিল। কিন্তু সেভাবে তিনি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে না পারায় আক্ষেপ করে 'উলট-

পুরাণ'-এ বলেছেন— "একবার ভাবিয়া দেখ তোমার এই মেরি ইংল্যান্ড— যেখানে একদা দুগ্ধ ও মধুর স্রোত বহিত—তাহার কি দশা হইয়াছে। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বীফ নাই, মাখন নাই, পনির নাই— এইবার বিয়ারও বন্ধ হইবে। বিদেশ হইতে গম আসে তবে তোমার রুটি প্রস্তুত হয়। ... ভারতের কার্পাসবস্ত্র তোমার বিখ্যাত লিনেন শিল্প নষ্ট করিয়ছে। হায়, তুমি কাহার বসন পরিয়াছ? তোমার নগ্নতা ঘুচিয়াছে কিন্তু লজ্জা ঢাকে নাই, শীত নিবারিত হইয়াছে কিন্তু তুমি অন্তরে অন্তরে কাঁপিতেছে। ..."[৩৩] এছাড়াও তাঁর বেশকিছু গল্প যেগুলি স্বাধীনতাত্তোরকালে প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের মধ্যেও ব্যঙ্গ-কৌতুকের ইউরোপ এসেছে। এগুলি হল— 'ধুস্তরী মায়া' (১৯৫০), 'রামধনের বৈরাগ্য' (১৯৫১), 'অক্রুরসংবাদ' (১৯৫২), 'বরনারীবরণ' (১৯৫৩), 'জয়হরির জেব্রা' (১৯৫৫), 'বটেশ্বরের অবদান' (১৯৫৬), 'গগন-চটি' (১৯৫৭), 'দাঁড়কাগ' (১৯৫৯) ইত্যাদি।

পরশুরামের গল্পগুলির বহিরঙ্গে হাসির প্রলেপ মাখানো থাকলেও সেই হাসির অন্তরালে লুকিয়ে আছে গভীর জীবনবোধ। গল্পগুলির ব্যঙ্গছলের গভীরে রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধ, স্বদেশভাবনা, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ তাঁর গল্পের মধ্যে বড় একটা জায়গা জুড়ে আছে। একটু উল্ট পথে হেটে সমাজ দেহে নানা ব্যাধির প্রতি তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করে মানুষকে সচেতন করেছেন। 'ত্রৈলোক্যনাথের মতোই পরশুরাম মানুষের ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত জীবনের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মূল্যগুলিতে বিশ্বাসী। অর্থাৎ জীবনের সৌন্দর্য ও সুষমা, সত্য ও আদর্শবোধ, সামাজিকতা ও পারিবারিকতার বন্ধনগুলির প্রতি তাঁদের অসীম শ্রদ্ধা। তাঁদের অশ্রদ্ধা যা কিছু অসুন্দর, অসত্য ও সর্বোপরি যা কিছু ছদ্মবেশী— তার প্রতি। এই সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁরা উভয়ই বৃহত্তরভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেননি। তাঁদের লক্ষ্য ছদ্মবেশী কয়েকটি মানুষ বা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ওপর।'[৩৪]

উৎস নির্দেশ:

১. *মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ, ত্রৈলোক্য রচনাবলী* – ২ (প্রথম খণ্ড), সাহিত্যম্‌, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, পৃষ্ঠা- ৬০৫

২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬০৬

৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০২

৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৪

৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৫

৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০২

৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৩-১১৪

৮. মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ প্রণীত, *ত্রৈলোক্যনাথ রচনা সংগ্রহ,* আনিসুজ্জামান (সম্পা.), সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০১, পৃষ্ঠা- ১৬২

৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০৩

১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০৬

১১. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০৭

১২. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০৭

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০৭

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০৭-২০৮

১৫. ভট্টাচার্য, গৌরীশঙ্কর, *কথাসাহিত্যঃ রাজশেখর বসু,* সংবর্ধনা সংখ্যাঃ শ্রাবণ, ১৩৬০, আমরা নিয়েছি, পরশুরাম গল্পসমগ্র গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশ থেকে, পৃষ্ঠা- ১৪

১৬. অদ্বিতীয় রাজশেখর, অমিতাভ চৌধুরী, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, ২০০১, পৃষ্ঠা- ৫

১৭. বসু, রাজশেখর, *পরশুরাম গল্পসমগ্র* (সম্পা. দীপংকর বসু), এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯, পৃষ্ঠা- ৪৫

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫১

১৯. বিশী, প্রমথনাথ, *বাংলা সাহিত্যের নরনারী,* পৃষ্ঠা- ১৯৭

২০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৯-৫০

২১. গঙ্গোপাধ্যায়, উজ্জ্বল, *পরশুরামের গল্পঃ দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২০১১, পৃষ্ঠা- ৩৫

২২. বসু, রাজশেখর, *পরশুরাম গল্পসমগ্র* (সম্পা. দীপংকর বসু), এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯,পৃষ্ঠা- ২০৭

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০৭

২৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৯১

২৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৭

২৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০০

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭৭-৭৮

২৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭৯

২৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৯

৩০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৮

৩১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৮

৩২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭৭

৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮১

৩৪. দাশ, শিশিরকুমার, *বাংলা ছোটগল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩, পৃষ্ঠা- ১৬৬-১৬৭

সপ্তম অধ্যায়:

দিলীপকুমার রায়

দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০)

ব্যক্তিজীবনে ইউরোপের সঙ্গে সংযোগসূত্রের সন্ধান:

দিলীপকুমার রায় ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক মানুষজনের সংস্পর্শে এসেছিলেন, যাঁদের কাছ থেকে কখনও প্রত্যক্ষ আবার কখনও পরোক্ষভাবে ইউরোপ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এই সকল ব্যক্তিবর্গের কথা তিনি তাঁর 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তাঁর পিতৃদেব। যিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন, বিশেষ করে ইংরেজিতে তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর পিতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সরকারি বৃত্তি পেয়ে বিলেতে যান। 'ইংল্যান্ডে সিরেনসেন্টার (Cirencester) কলেজে তিনি কৃষিবিদ্যায় যথাক্রমে F.R.A.S, M.R.A.C তথা M.R.S.A.E. এই তিনটি খেতাব পান। অন্যদিকে, লন্ডনে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে মাত্র বাইস বৎসর বয়সে Lyrices of Ind কাব্যগ্রন্থ ছাপিয়ে স্বয়ং এডুইন আর্নল্ডের ভূয়সী প্রশংসা পান।'[১] সে সময়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের 'হাকিমি' পদবির বিশেষ কদর ছিল। আর ম্যাজিস্ট্রেট তো কথাই নেই। তাঁর পিতাও যথাকালে নিশ্চয়ই ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারতেন, সেকথা তিনি 'স্মৃতিচারণ'-এ বলেছেন, 'সহজে যেমন শুয়োপোকা প্রজাপতি হয়'। কারণ এরজন্য যে কর্মদক্ষতা ও সততার প্রয়োজন ছিল তা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খুব সহজেই সাহেব মহলে অর্জন করতে পেরেছিলেন।

"উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল" বইয়ে দিলীপকুমার রায় তাঁর নিজের পিতার চরিত্র সম্পর্কে কতগুলো বিশেষণ ব্যবহার করেছেন; বাইরে তিনি কবি, গায়ক, সুরকার, সন্তানবৎসল পিতা, বন্ধুবৎসল মিত্র আর মজলিশি মানুষ। কিন্তু ভিতরে ছিলেন ছিলেন একেবারেই উদাসী। দিলীপকুমার বলছেন, 'মাতৃদেবীর মৃত্যুর পর থেকে তাঁর উদাসী প্রকৃতি আরও চোখে পড়ত সকলের।'[২] তার্কিক অর্থে তিনি সংশয়ী ছিলেন। 'পিতৃদেব এ সময় (১৯০৮ - ১১) নিজেই প্রায় নাস্তিক বলে পরিচয় দিতেন ও আমাকে বলতেন — তর্ক করা ভাল — সাচ্চাকে কষে নেওয়া চাই-ই চাই।'[৩] আরো বলতেন, "সবকিছুই যাচিয়ে নিবি বাজিয়ে নিবি রে মন্টু, ধাঁ করে মেনে নিস নি কখনো কোনো কিছুকে অকাট্য সত্য বলে, বুঝলি? তর্ক বিচার প্রবৃত্তি আমাদের খানিকটা দেখতে শেখায় বৈকি কোনটা টেঁকসই, কোনটা অপল্‌কা।"[৪] উল্লেখ্য, এর প্রভাব

দিলীপকুমারের জীবনেও পড়েছে। আমিও কথায় কথায় তর্ক করতাম শুধু কম বয়সীদের গুরুজনদের সঙ্গেও বটে তারা অনেক সময় বিরক্ত হতেন ও করতেন এমন সব মন্তব্য করতেন যা আমার কাছে একটুও শ্রুতিমধুর মনে হতো না।

দিলীপকুমার জানাচ্ছেন তাঁর মেসোমহাশয়ের সঙ্গে খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে পরিচয় হলেও অন্তরঙ্গতা হয় তর্কাতর্কির মধ্য দিয়ে। ‘তিনি আমাকে শুধু গভীর স্নেহ নয়, আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। পই পই করে মানা করতেন কারুর নজরে কিছু মেনে নিতে। “স্বাধীন চিন্তা” ছিল তাঁর একটা প্রিয় বুলি। অতএব একদিকে পিতৃদেব অন্যদিকে মেসোমহাশয় দুয়ের প্রভাবে পরে আমি যে তার্কিক হয়ে উঠব এতে বিস্ময়ের কি আছে? আমার আত্মীয়-স্বজন তথা পিতৃবন্ধু অনেকেই এঁচড়েপাকা ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ভেবে হাহুতুশে হয়ে উঠতেন।’ [৫]

‘লোকেনকাকা মেম বিয়ে করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী মেবেল পালিত সাত-আট বৎসর পরে, ১৯২০ সালে, লণ্ডনে আমাকে ও সুভাষকে নিমন্ত্রণ করেন তাঁর গোলডার্সগ্রীনের সুন্দর দুতলা বাড়িতে থাকতে— যেখানে তিনি আমাদের মাঝে মাঝেই ভারতীয় “ক্যরি” রেঁধে খাওয়াতেন।’[৬]

দিলীপকুমারের জীবনে তার বাবার বন্ধু হরিদাসবাবু আর তার মেজমামার (পুরো নাম খগেন্দ্রনাথ মজুমদার) অবদান নেহাত কম নয়। তিনি তাঁর ‘স্মৃতিচারণ’-এ বলেছেন, ‘আমি যখন বিলাত যাই তখন তিনি যেন নতুন করে পরিচয় দেন প্রথম মনোবৃত্তিরটির। বললেন: “বিলেতে যদি হঠাৎ কিছু টাকাকড়ির দরকার হয় আমাকে অসংকোচে জানাবে তো?” আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলি: “যখন আমি অকূল পাথারে পড়ি তখন আপনি আর মেজমামা এই দু’জনেই তো এগিয়ে এসেছিলেন পারে পৌঁছিয়ে দিতে। আপনাদের জানাবো না তো জানাব কাকে?”[৭] হরিদাসবাবু বললেন: “তোমার মেজোমামার সঙ্গে আমার নাম কোরো না। তিনি তোমার জন্যে যা করেছেন তা দ্বিজদাও করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। আমি তো জানি দ্বিজদা কী রেখে গিয়েছিলেন। তাকে শুধু যখের ধনের মতন বুক দিয়ে আগলে রাখাই নয়— তোমার জন্য নতুন একটি তিনতলা বাড়ি তুলে দেওয়া ঠিকাদারকে টাকা না দিয়ে— এ-রাম মনুষ্য নয় মন্টু! তোমার বহু ভাগ্যে এমন মামা পেয়েছিলে। ... বলতে কি, বিলেতে আমার আর্থিক স্বচ্ছলতার মূলে ছিলেন মেজমামা আর হরিদাসবাবু। তাই তো বহু টাকা খরচ করে

ডিগ্রি না নিয়ে ফিরে এলেও আমাকে পরের চাকরি করতে হয়নি— হরিদাসবাবু বইয়ের হিসেব রাখতেন, আর আমার পিতৃকল্প বিচক্ষণ মেজমামা ভান্ডারী হয়ে আমার সঞ্চিত অর্থ খাটিয়ে বাড়াতেন। আমি বৈষয়িকতার ক-খ না জেনেও সারা ভারতে নিরবচ্ছিন্ন হেসে খেলে গান গেয়ে চলতে পেরেছিলাম শুধু এই দুটি মানুষ আমার বৈষয়িক তল্পি ধরেছিলেন বলেই।’[৮]

দিলীপকুমারের ছাত্রজীবন:

দিলীপকুমার তাঁর ছাত্রজীবন সম্পর্কে নিজে বলেছেন, ‘১৯১৭ সালে আমি বি. এসসি. পরীক্ষা দিয়ে ফেল করি— ব্যবহারিক রসায়নে। বি.এসসি. নিয়েছিলাম পরে আমি আই. সি. এসে বিজ্ঞান নেব বলে। আমাদের দেশে তখন বিজ্ঞানের প্রতিপত্তির উঠতি বয়েস। তাই লোকজনের প্ররোচনায় “আই. এসসি” নিলাম “আই. এ” না নিয়ে। আমার নেওয়া উচিত ছিল আই. এ-র পাঠ— সংস্কৃত, ইতিহাস ও ন্যায়। কিন্তু দশচক্রের ফেরে পড়ে আমি নিলাম আই. এস সি-র পাঠ—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই আমার চক্ষুস্থির! এ কী কাণ্ড ! কয়লা, ক্ষার, আগুন, বকযন্ত্র, তুলাদণ্ড নানা দুর্গন্ধ গ্যাস— এইসব নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে সত্যি আমার কান্না আসত— কেন মতিছন্ন হল আমার। থিয়োরিটিকাল ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে আমি অবোধ ছাত্র ছিলাম না, কিন্তু ল্যাবরেটরিতে এলই আমার মনে হত যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনের কথা। ... ১৯১৭ সালে বি. এসসি. পরীক্ষায় ফিজিক্স প্র্যাকটিক্যালে আমি টায়ে টায়ে পাশ করেছিলাম— একশোর মধ্যে একচল্লিশ পেয়ে— চল্লিশ পেলে পাশ। কিন্তু কেমিস্ট্রিতে প্র্যাকটিক্যালে লজ্জার হল স্রেফ ভরাডুবি : একশোর মধ্যে মাত্র ৩২ নম্বর— হা হতোস্মি! আমার গর্ব ছিল— আমি মেধাবী, পরীক্ষায় ফেল করতেই পারি না, কিন্তু “অতিদর্পে হতালঙ্কা”— আমি তো কোন ছাড়! [৯] অন্য একস্থানে তিনি বলেছেন, ‘পিতৃদেবের মুখে প্রায় শুনতাম প্রবচন: ‘Fair exchange is no robbery’ বটেই তো। পরে কেম্ব্রিজে এল. এল. বি পড়াবার সময়ে আইনের পারিভাষিক মকশো করেছিলাম— quid pro quo.’[১০]

দিলীপকুমার ছাত্রবৃত্তি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়ার ফলে তাঁর কৈশোর জীবনে সব থেকে বেশি লাভ হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ। সুভাষের প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সুভাষের অন্তরপুরুষ হয়ে উঠেছিল মহিমান্বিত, দীপ্যমান— এই হল ওর মহত্ত্বের চরম তর্পণ। এ শুধু আমার মুখের কথা নয়। যখন ও বিলেতে আর পাঁচজনের মতন একটি পরীক্ষার্থী ছাত্ররূপে লোকচক্ষুর অন্তরালে দিনের পর দিন পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছে— তখনও ওর কাছে যেই আসত সেই ওর চরিত্রবল ও মহত্ত্বের আঁচ পেত। আমি ও ক্ষিতিশপ্রসাদ তো ওর প্রবল প্রভাবের পরিধির মধ্যে আসার দরুনই আই. সি. এস. পরীক্ষা দেওয়ার সংকল্প ত্যাগ করি। লন্ডনে কত যুবকই যে ওকে দেখতে না দেখতে বরণ করেছিল নেতারূপে সে কি বলব? ওর দেহান্তরের পরে দেশ ওকে ভক্তিভরে যে "নেতাজী" উপাধি দিয়েছিল সে কনক-মুকুট এ-যুগে আর কার মাথায় বসানো যায় ভেবে পাই না। কলকাতায় ফেরার পরেও কত দেশধ্বজই যে ওর আলোকিত প্রতিভার কাছে আসতে না আসতে মিইয়ে পড়েছিলেন কে না জানে? কেমব্রিজে পুরী বলে একটি পাঞ্জাবি র‍্যাংলার ছিল দারুণ অশ্লীলভাষী। একদিন আমার কাছে এসে সে চুপি চুপি বলে: "আমি সব পারি দিলীপ, কিন্তু সুভাষকে দেখলেই কেমন যেন মুখচোরা হয়ে পড়ি!"[১১] বিলেতে আমার এক বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন সংঘাতিক সাহেব। তিনিও সুভাষের কথা উঠলে বলতেন: "ওকে দেখলে ভরসা হয় যে, হয়তো বাঙালি থেকেও বাংলাদেশ বাঁচতে পারে।"[১২] এঁর মত ছিল এই যে, আমাদের সভ্যতার ভিতরে ভিতরে ঘুণ ধরেছে, তাই বাঁচতে হলে আমাদের সবাইকে সাহেবি ধরনধারণ ও ডিসিপ্লিনকে পুরোপুরি বরণ করে নিতে হবে— জাতীয়তার অভিমান ছেড়ে। সুভাষের সঙ্গে এই নিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আলোচনা হত বিলেতে। সে বলত: "অমুকের কথার সবটাই অসার নয়। তবে কি জানো? আমাদের জাতীয় জীবনের যে-ঘুণের কথা সে বলেছে সে আর কিছুই নয়— শুধু ব্যাপক তামসিকতা। ... আমাদের জাতীয়তা বর্জন করলে চলবে না, শুধু সাহেবদের রাজসিকতাটুকু ছেঁকে নিয়ে আত্মসাৎ করতে হবে। কেমন জানো ?"[১৩]

দিলীপকুমার রায় ফরাসি ভাষা প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে প্রমথনাথ বাবুর কথা বলেছেন। কারণ প্রমথবাবু সে যুগে ফরাসি ভাষাপ্রীতির ছোঁয়াচ অনেক তরুণের মনে লাগাতে পেরেছিলেন যাঁদের মধ্যে সম্ভবত সত্যেন্দ্রনাথ আর দিলীপকুমার রায় ছিলেন অন্যতম। দিলীপকুমার বলেছেন, 'আমাদের মতন কিশোর ও তরুণ অনেকের কাছেই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন খানিকটা কন্টিনেন্টাল কালচারের প্রতীকই বলব। কিন্তু আমাদের দেশ তো— একদল লোক উঠে পড়ে লেগে গেল প্রতিপন্ন করতে যে সুকুমার বৈদগ্ধ্যের ঝিকিমিকি-লোকে তিনি চিকচিক করলেও সোনা নন। অর্থাৎ ফরাসি ভাষা তিনি ভাল জানেন না— বলল তারা মুচকি হেসে।' [১৪]

'একথা সত্যি কি না কী করে বলব, কারণ আমি সে সময়ে এ-ভাষায় প্রথম পাঠও নিইনি। কিন্তু এটুকু বলতে পারি সত্যের অপলাপ না করে যে, ফরাসি ভাষা তিনি সত্যিই ভালোবাসতেন। নইলে তাঁর ফরাসী-প্রীতির ছোঁয়াচে আমাদের অনেকেরই উৎসুক মন রাতারাতি রঙিন হয়ে উঠতে পারত না কখনই।'[১৫]

দিলীপকুমার রায় তাঁর 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থের জীবনস্মৃতি পরিচ্ছেদে বলেছেন, 'সংসারের কেউ বেশি বয়সে পাকে, কেউ কম বয়সে। আমি বাল্য-পর্বে একটু তাড়াতাড়িই পেকে উঠেছিলাম তর্কাতর্কিতে, মুরুব্বিয়ানায়, অজস্র সারগর্ভ তথা বাজে বই পড়ায় একথা প্রথম বুঝি যৌবনে— বিলেত পৌঁছে নানা চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার পরে, তার আগে নয়। দিলীপকুমার জানাচ্ছেন ১৯১৯ সালে বিলেতে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। দিলীপের কথায়, 'বিস্ময়ই আমার মনের সাড়ে পনেরো আনা অংশে জুড়ে বসল। চারিদিকে যা দেখি তাতেই বিস্ময়ানন্দে মন ছেয়ে যায়— কেবলই মনে পড়ে কবি এডগার অ্যালান পো-র উক্তি— "ইট ইজ এ হ্যাপিনেস টু ওয়ান্ডার!" একেবারে অক্ষরে অক্ষরে।'[১৬] সে সময় বিদেশে তিনি যাই দেখতেন, তাতেই পুলক জাগত তাঁর রোমে রোমে। প্রথমে দেশছাড়া হয়ে জাহাজে ওঠে জলের মরুভূমির দিকে তাকিয়ে, বন্ধুহীন অবস্থায় তিনি মনমরা হলেও পরে বিলেতে পৌঁছানোর পর তাঁর বিস্ময় আর আনন্দে মন ভরে যায়। বিলেতে ইংরেজ বন্ধু পেতে কিছুটা দেরি হলেও লন্ডনে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তাঁর এক চেনা বাঙালির সাক্ষাৎ পেয়ে সেই অভাব পূরণ হয়। তাঁর নাম তিনি দিয়েছিলেন শৌখিনবাবু। তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আমার

চেয়ে বয়সে বছর চার-পাঁচ বড়। দেশে থাকতে তিনি আমাকে সত্যিই পছন্দ করতেন। তিনি এমন কিছু আমার আত্মার আত্মীয় ছিলেন না, তবুও বিলেতে তাঁকে পেয়ে মনে হল যেন হাতে চাঁদ এল।'[১৭] এই শৌখিনবাবুই তাকে লন্ডনের থিয়েটারে, মিউজিক হলে, কার্নিভালে, হিপোড্রামে, নাইট ক্লাবেও নিয়ে যেতেন। এরপর আরও নানাজনের সংস্পর্শে আসা ও বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে প্রায় সাড়ে তিন বছর তিনি বিলেতে কাটিয়ে দেন।

দিলীপকুমারের লন্ডনে প্রথম দেখা হয় রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। যাঁকে তিনি বলেছেন 'লন্ডনে আমার প্রথম বন্ধু'। এনার সঙ্গে দিলীপকুমারের অবশ্য আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তিনি **১৯১৮** সালের আই. সি. এস. পরীক্ষা পাস করে লন্ডনে সুখী জীবনযাপন করছিলেন। তিনিই প্রথমে দিলীপকুমারকে কেমব্রিজে নিয়ে গিয়ে নানা কলেজে ভর্তির চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধু শ্রীঅমিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ফিটজ উইলিয়াম কলেজে ভর্তি করে দেন। উল্লেখ্য সেখানেই কয়েক মাস পরে সুভাষচন্দ্র বসু যোগ দেন। এই রবীন্দ্রনাথ বাবুই বিলেতে আগত ভারতীয়দের নানা কীর্তিকলাপ সম্পর্কে দিলীপকুমারকে অবগত করেছিলেন। কারণ বিলেতে একটা দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়, নানা ভারতীয় সুসন্তান তাদের ল্যান্ড-লেডির মেয়ে নিয়ে মশগুল থাকেন। 'কেন আমাদের অনেক ভাল ছেলেও বিলেতে এসে অতি নিম্নশ্রেণির শ্বেতাঙ্গিনীর মোহে পড়ে মাথা ঠিক রাখতে পারেন না ও কোন ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের পাঁকে পড়ে আমলা না হোক ধবলার টানে ধীরে ধীরে অধঃপাতে যান।'[১৮] রবীন্দ্রবাবুর কাছে এসব ললনাদের ছলনার লোমহর্ষক কাহিনি শুনে প্রথমে খানিকটা অবিশ্বাস করলেও পরে সে বুঝতে পারে এসব নির্মম সত্য বটে। এই একই বিষয়ে দিলীপকুমারকে সচেতন করেছিলেন শ্রীশরৎ দত্ত। তিনি প্রায়ই বলতেন: "এর মূলে শুধু যে শ্বেতচর্মের মোহ লুকিয়ে আছে তাই নয়, আছে এক ধরনের ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স। ভাবখানা যেন সাক্ষাৎ মেমকে হাত করেছি !"[১৯] ভারতীয় ছাত্রদের এ-ধরনের মতিগতি দেখে সুভাষেরও দুঃখের সীমা ছিল না। দিলীপকুমারের সঙ্গে এ নিয়ে প্রায়ই তর্ক বাধত, কারণ দিলীপকুমার মনে করত— এসব ক্ষেত্রে সমাজের চেয়ে প্রেম বড়। এই প্রেম সম্পর্কেও শরৎবাবু সচেতন করে বলতেন : "কিন্তু যাকে প্রেম বলছ, সে যদি প্রেম না মোহ হয় ?'[২০] তারপর ধীরে ধীরে,

দিনে দিনে যখন এক এক করে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা স্বপ্নভঙ্গ ঘটতে থাকে তখন তিনি অত্যন্ত বেদনা বোধ করেন। তারপর দিলীপকুমার বলেছেন, '... যখন বিলিতি মেয়েদের নানা অভাবনীয় মতিগতি দেখি সত্যি সত্যিই হতবুদ্ধি হয়ে যেতাম তখন মানতে হত বই কী যে, রবি বাড়িয়ে বলেনি।'[২১] রবি কিন্তু বিলিতি সভ্যতাকে সত্যিই ভালোবেসেছিলেন, তাই তাঁর কাছে ইংরেজ চরিত্র সম্বন্ধে খানিকটা অন্তর্দৃষ্টি জেগেছিল। তাই বলে 'বিলিতি সভ্যতা যে ভারতীয় সভ্যতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ'— তাঁর এই সাহেবি মতে তিনি কিছুতেই সায় দিতে পারতেন না। তাঁর একটি কথা তাকে সত্যিই বড় ভাবিয়ে ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন: "একটু চোখ চেয়ে দেখতে শিখ দিলীপ, এরা সভ্যতার নানা টেকনিককে আবিষ্কার করে কীভাবে এগিয়ে গেছে। তাই তো বলি এদের কাছ থেকে এই এগিয়ে যাওয়ার পদ্ধতিটা আমাদের আয়ত্ত করাই চাই গতানুগতিকতায় সর্বনাশ।"[২২]

দিলীপকুমার রায় এই রবীন্দ্রনাথ বাবুর সম্পর্কে আরও বলেছেন, "রবিই আমাকে সর্বপ্রথম সুদূর বিদেশে সহজ প্রীতির ডাকে কাছে টেনে নিয়ে ভরসা দেয়, নির্দেশ দেয়, চোখ খুলে দেয় তার গভীরতর অভিজ্ঞতার আলোকপাতে। লন্ডনের অনেক কিছুই আমাকে চমকে দিত বটে দিনের পর দিন: নানা থিয়েটার, মিউজিক হল, কনসার্ট, কিউ গার্ডেন, রিজেন্ট পার্ক, ... ব্রিটিশ ম্যুসিয়ম, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, পিকাডিলি উইম্বলডন— সর্বোপরি লন্ডনের টিউব ট্রেন যার প্রতি উদ্ভাসে আমার মনে হত যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের জিন দেখিয়ে চলেছে অঘটনের পর অঘটন— কিন্তু এ-সব চমক তো স্নায়বিক— কাজেই আসতেও যেমন যেতেও তেমনি— এতে কি আর স্নেহবুভুক্ষুর মন ভরে ?"[২৩]

দিলীপকুমার রায় বিলেতে থেকে ইংলন্ডের বিভিন্ন দেশে গিয়েছিলেন ও সেখানকার বিভিন্ন স্থানে গান করার সুবাদে সেই সমাজের বিভিন্ন মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা 'স্মৃতিচারণ'-এ বলেছেন। তিনি বলেছেন, "১৯২০ ও ১৯২১-এ আমি সুইজারল্যান্ডে যাই ফরাসি ও জার্মন অঞ্চলে। ১৯২২ শে প্রথম জয়যাত্রা ইতালিয়ান অঞ্চলে— রম্যনগরী লুগানোয়। বার্লিনে থাকতে আমি এক অসামান্য মহিলার সংস্পর্শে আসি। তাঁর নাম ফ্রাউ কির্সিংগার। আধা জার্মন-আধা ফরাসি। যুদ্ধের আগে ছিলেন ক্রোড়পতি, যুদ্ধের পরে

দেউলিয়া। ... প্রথম যুদ্ধের পরে জার্মন মার্কের পতন তথা পতিবিয়োগের ফলে তিনি দেউলে হন। বার্লিনের বিখ্যাত চৌরঙ্গি কুরফুর্শস্তেন্দাম শত্রাসে তাঁর ত্রিতল প্রাসাদের দুটি তল ভাড়া দিয়ে ত্রিতলে তিনি সালঁ পার্টি দিতেন— যেখানে আমি বার্লিনের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকা শিল্পী কবির সঙ্গে পরিচিত হই।"[২৪] দিলীপকুমার রায় বলেছেন, "বিলেতে— মানে ইংল্যান্ডে ছিলাম প্রায় দু' বৎসর। এর মধ্যে প্রায় দেড়বৎসর কাটিয়েছি কেমব্রিজে, বাকি সময়টা কখনও লন্ডনে, কখনও নানা রম্যস্থানে, কখনও প্যারিসে, সুইজারল্যান্ডে, হলান্ডে, রাইন উপত্যকায়। তৃতীয় বৎসরে যাই বার্লিনে গান ও জার্মন ভাষা শিখতে। তারপরে লুসানো, ভিয়েনা, প্রাগ, বুদাপেস্ত প্রভৃতি নানা শহরে নিমন্ত্রিত হয়ে গান গেয়ে ও গানের সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি ১৯২২-এর শেষে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর য়ুরোপে ভ্রাম্যমাণ হয়ে।"[২৫]

দিলীপকুমারের কাছে ইউরোপের বাণী— ইহলৌকিকতা, কর্মে আসক্তি, উৎসাহে অনুরাগ, অশঙ্ক পরীক্ষা। গায়ক হয়ে ভিয়ানা, প্রাগ, বুদাপেস্ত প্রভৃতি নানা শহরে ভারতের মহিমা প্রচার করতে শুরু করেন। এতে তার লাভ হয়েছিল, "আমি য়ুরোপের বিশাল রূপটিকে চিনবার সুযোগ পেলাম, শুধু ইংল্যান্ডকে জানাই যে যথেষ্ট নয়, এই সত্যের পরিচয় পেলাম ইংল্যান্ড থেকে খানিকটা দূরে এসে।"[২৬] দিলীপকুমার রায়ের ১৯২৮ সালে তার সাহিত্যিক ও সঙ্গীত জীবন থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের কাছে যোগদীক্ষা নিতে পন্ডিচেরি যান এবং সেখানে আট বৎসর প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বৈরাগ্য সাধনের মধ্যেই মুক্তির স্বাদ খুঁজে পান। 'য়ুরোপে থেকে পূর্ণ্যভূমি ভারতবর্ষের মাটিতে ফিরতে নতুন করে জাগা বৈরাগ্যের অঞ্জনে দেখতে পেলাম মুক্তিনাথের হারিয়ে-যাওয়া পদচিহ্ন, শুনতে পেলাম তাঁর ডুবে যাওয়া বাঁশির ডাক— সঙ্গে সঙ্গে দেখা হল মহা-ঋষি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে— তাঁর শ্রীমুখে শুনলাম ফের চিরন্তনের বাণী: যে, বাইরের তোড়জোড় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ সাধনের পথে দেহের সুখ বা বিলাসের ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু মেলে না আত্মার শান্তি, ফোটে না শাশ্বত অমৃত সত্যের দিশা।'[২৭] তাই শেষ পর্যন্ত বিলিতি ডিগ্রি না নিয়েই দিলীপকুমার জনপ্রিয় গায়ক হয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন। ইউরোপে থাকাকালীন একাধিক লেখকের বই পড়েছিলেন, যেগুলির দ্বারা

তিনি কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম দুটি হল— রোলাঁর 'জন ক্রিস্টফার' ও রবার্ট রাসেলের 'Roads to Freedom'।

দিলীপকুমারের সাহিত্য ও সাহিত্যিক জীবনে ইউরোপ প্রসঙ্গ:

'বহুবল্লভ' উপন্যাসের ভূমিকায় দিলীপকুমার রায় তাঁর উপন্যাসগুলির সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার উপন্যাসগুলির ("মনের পরশ", "দুধারা", "রঙের পরশ", "দোলা", "বহুবল্লভ" ও "তরঙ্গ রোধিবে কে?" – শেষেরটি ১৯৩৬ সালে প্রকাশ্য)— কোনোটিই নিছক গল্প নয়। আমি বার বার এ-কথা বলেছি যে, গল্প-লেখার লক্ষ্য নিয়ে–ঘটনা-বিবৃতি করতে আমি উপন্যাস লিখি না কোনোদিনই,— কিন্তু তবু দেখতে পাই যে, বার বারই অনেকেই আমার উপন্যাসে খোঁজেন গল্প, ঘটনাপর্য্যায়, অনিবার্য্যতা (inevitability), গাঁথুনি— এই সবই। ...। আমার বক্তব্য এই যে, গল্প যা নয় তাকে গল্পের নিকেষে কষতে যাওয়া অনুচিত, এবং উপন্যাস বিশেষ ক'রেই জটিল আর্ট— তাই সে বহু রীতি-নীতির সমন্বয় খোঁজে তার নিত্য-নব প্রেরণার নিত্য নব পরিবর্ত্তনের আলোয়। ...'

'মনের পরশ' (১৯২৬):

উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষ', পত্রিকার আষাঢ়, ১৩৩২ সংখ্যায়। আমরা আলোচনার ক্ষেত্রে এই পত্রিকা সংস্করণটিকেই অধ্যয়ন করেছি। এই উপন্যাসটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে টিপ্পনীতে লেখক বলেছেন, 'আর্ট বা চরিত্রচিত্রণ আমার এ উপন্যাসটির উদ্দেশ্য নয়। য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের মধ্যে কারুর কারুর মন কি ভাবে সাড়া দেয় সেটাই খানিকটা বাস্তব ও খানিকটা কল্পনার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে, সাধ্যমত ফুটিয়ে তোলা আমার লক্ষ্যস্থল। সুতরাং নিছক উপন্যাসের মাপকাটি বা তুলাদণ্ডে এ উপন্যাসটির মূল্য নির্ধারণ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। — যেহেতু এর লক্ষ্য ও আদর্শ ভিন্ন।'[২৮]

এই উপন্যাসের নায়ক পল্লবের সঙ্গে দিলীপকুমারের এবং নায়কের পিতা জর্জ অনুপমের চরিত্রে লেখকের পিতৃদেবের মধ্যে প্রভূত সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে থাকি। দিলীপকুমারের

'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থ থেকে জানতে পারি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবিকার জন্য যে, তাঁকে বিদেশি রাজতন্ত্রের আমলা হতে হয়েছিল এ দুঃখ চিরদিন তাঁর মনে কাঁটা হয়ে বিঁধে ছিল। কারণ তিনি তেজস্বী স্বভাবের মানুষ ছিলেন। সমাজের গণ্যমান্য হাকিম হওয়ার জন্য সে কিছুটা সান্ত্বনা পেতে পারতেন। কিন্তু সান্ত্বনা পাওয়া দূরে থাকুক, তিনি যে চাকরিতে ইস্তফা দিতে পেরে উঠছেন না এজন্য তার আত্মগ্লানির সীমা ছিল না। দিলীপকুমার রায় লিখছেন, 'মনে আছে একবার আমাকে মফস্‌সল থেকে লিখেছিলেন: "মনিবরা আমাকে ফের বদলি করলেন— দেবই এবার চাকরি ছেড়ে। আমি কি একটা ফুটবল না কি যে ওরা যখন যেখানে খুশি 'শুট' করে পাঠাবেন?"[২৯] নিরন্তর মনঃকষ্টের পরেও তিনি জীবিকার জন্য দাসত্ব বন্ধন স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

দিলীপকুমারকে বিয়ে না দিয়ে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন, এতে তাঁর পিতা ব্যতীত পরিবারের সকেলের মনে সন্দেহ ছিল। আর সেজন্য তাঁর দাদা মহাশয় মহারাজের কাছে আশীর্বাদ নিতে গেছেন। 'দাদা মহাশয়: ওর উপরে ছেড়ে দিতে তো আমরা গররাজি নই মহারাজ, কিন্তু মুশকিল বেধেছে এই জন্যে যে, ও ধরেছে বিয়ে না করেই বিলেতে যাবে— এই বৎসরেই। কাজেই আমরা ভয় পেয়েছি বই কী, বুঝলেন না ? ও যেরকম ঝোঁকালো ছেলে— ওদেশে মেমরাও যে কী বস্তু জানেন না তো— কী সাজসজ্জা রং-ঢং তাদের ! ও পড়বেই পড়বে কোনও-না-কোনও রঙ্গিণীর ফাঁদে আর করবে তাকে ঘরনি। তখন ?— (একটু থেমে) তাই তো ভেবে-চিন্তে আপনার আশীর্বাদ নিতে ওকে ধরে নিয়ে এলাম মহারাজ!— সাধুদের আশীর্বাদের মতন রক্ষাকবচ সংসারে আর কী আছে বলুন? (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) তা ছাড়া এখন আর উপায়ই বা কী বলুন?— হ্যাঁ বলতে ভুলেছি— তার উপর ও আবার কী বিষম গান-পাগলা জানেন না তো। আর মেয়েরা গান শুনলে— বুঝলেন কিনা ... '।[৩০]

এই উপন্যাসটি শুরু হয়েছে জর্জ অনুপম পুত্র পল্লবের মানসিক টানাপড়েন ও সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যদিয়ে। কেননা পল্লব জীবনের শুরুতে 'রহিম খাঁ কোচমান' হতে চাইলেও একের পর এক পিতা ও ঠাকুরদাদার মতো জর্জ, ডাক্তার, সিভিলিয়ান, কমিশনর, ব্যারিস্টার এবং শেষটায় এঞ্জিনিয়ার হতে মনঃস্থির করে। 'সেজন্য সে গণিতে মন দিল। ডিগ্রী পরীক্ষায়

যখন ফল ভালই হ'ল, তখন তাঁর পিতা অনুপম পুত্রর ইচ্ছামত এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বিলেত পাঠালেন। তিনি নিজে দাসত্বের রজ্জু গলায় দিয়ে অবধি ভেবেছিলেন, পুত্রকে আর যাতেই নিযুক্ত করুন না কেন, চাকরিতে নিযুক্ত করবেন না। তাই পল্লবের বিলাতে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাবার ইচ্ছায় তিনি খুবই সহানুভূতি প্রকাশ করলেন।'[৩১] এছাড়া তিনি স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়ায় বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের শত অনুরোধ ও সাবধান সত্ত্বেও পুত্রকে ২১ বছর বয়সে বিয়ে না দিয়েই বিলেতে পাঠাতে কখনো দ্বিধা করেন নি। কিন্তু পুত্রকে বিলেতে কীভাবে জীবন-যাপন করতে হবে সে বিষয়ে কিছু উপদেশ না দিয়ে, বলেছেন "তোমার যা ইচ্ছে হয় হোয়ো, ...।"[৩২] অন্যদিকে, পুত্র পল্লব বিলেত যাওয়া নিয়ে ভেবেছিলেন, 'এঞ্জিনিয়ারিং—স্বাধীন পেশা। আর টাকাও আছে;— যেহেতু "বাণিজ্যে বসতি লক্ষী" এ কথা শাস্ত্রেই আছে। তাছাড়া, পল্লবের বিলেতে আসার সময়ে ধারণা ছিল যে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন শুধু পুরুষের নয়, মনুষ্যত্বেরও একটা প্রধান লক্ষণ।'[৩৩] এদিকে পল্লব বিলেতে গিয়ে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শেষটায় বিলাতি সঙ্গীত চর্চায় জীবন নিয়োগ করে। তাই সে পিতাকে বিলেত থেকে চিঠি লেখে জানায়, সে ইঞ্জিনিয়ারও হবে না, ডাক্তারও হবে না, হবে— গায়ক। তাই সে এবার বিলাতি সংগীতশাস্ত্র অধ্যয়ন করবে।

সেকালে বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়া যে কতটা মোহ ছিল তা অন্যান্য উপন্যাসের মতোই এই উপন্যাসের নায়ক পল্লব ও তার পিতার কথায় স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তা সে ওকালতি ব্যাবসা করুক বা নাই করুক। ব্যারিস্টারি পড়া সেকালের একটা সম্ভ্রমের বিষয় ছিল। পল্লবের পিতা পল্লবের সঙ্গীত শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছে, "... আমার বক্তব্য বা অনুরোধ, আদেশ নহে— যে তুমি সঙ্গীত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ ব্যারিষ্টারিটিও পাশ করিয়া আসিও।"[৩৪] শুধু পিতার কাছেই নয়, ছেলের কাছেও ব্যারিস্টারি পড়াছিল ফ্যাশানের মতো "এ কৃতজ্ঞতা অপরিশোধ্য ঋণ আংশিকভাবে শোধ করিবার জন্যই আমি ব্যারিস্টারি পড়িব, যদিও ব্যারিস্টারি কখনও করিব না।"[৩৫] কিন্তু বিলেতে এসে তার পারিপার্শ্বিকের আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। ক্রমে তার বাল্যকালের আদর্শের গরীয়ানত্ব সম্বন্ধে সংশয়ী হয়ে উঠতে থাকে। যার পরিণাম হিসেবে আমরা একদিন দেখব যে পল্লব আর ব্যারিস্টারি না শিখে বিলেতি সঙ্গীতচর্চায় মনোনিবেশ করে।

পল্লব, মোহনলাল ও কুঙ্কুম তিনজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তার পর তিনজনে দূর বিদেশ এক বিশ্ববিদ্যালয়ে একত্রে পড়ার দরুণ বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়ে উঠেছিল। এই ত্রয়ীর মধ্যে মোহনলালই সর্ব্বপ্রথম বিলাতে আসে— ইউরোপে তখন সবে যুদ্ধাবসান হয়েছে। তার বৎসরখানেক পরে পল্লব এসেছিল ও তার তিন মাস বাদে কুঙ্কুম এসে যোগ দেয়। পল্লবের ব্যারিস্টারি ছেড়ে সঙ্গীত শাস্ত্রে মনোযোগের অন্যতম কারণ তার বাল্যকাল থেকে গড়ে ওঠা দুই বন্ধুর প্রভাব, যারা তার পূর্বেই বিলেতে গিয়েছিলেন। এই বন্ধু যুগলের একজন মোহনলাল, যে বিলেতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেশের সেবা করার জন্য কৃষিকাজ শিখতে আরম্ভ করে। অন্যজন কুঙ্কুম, ব্যারিস্টারি পড়তে আরম্ভ করে দর্শনশাস্ত্রে মনোযোগ দেন। 'মোহনলাল বল্‌ল, নিজে গণ্যমান্য হওয়াই জীবনের লক্ষ্যস্থল নয়, আসল কথা দেশের সেবা। কুঙ্কুমও বল্‌ল, দেশকে বড় করতে হ'লে পরিণাম চিন্তা ত্যাগ ক'রে আদর্শবাদকেই বড় করে দেখ্‌তে শেখা দরকার।'[৩৬] ক্রমেই তার মনে হচ্ছিল এরূপ বন্ধুর সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখে চলতে হলে শুধু তাদের আদর্শবাদকে তারিফ করলেই চলবে না, নিজের জীবনকেও আংশিকভাবে সে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে হবে। এছাড়াও পল্লবের বিলেত যাত্রার জাহাজে একজন মাত্র মোটা ও বেঁটে বড় সাহেব ছিলেন। তার জীবনের ব্রতই ছিল— পল্লবকে সর্বদা বিলেতি আদব কায়দা ও ভদ্র ব্যবহার সম্পর্কে নিখুঁত উপদেশ দেওয়া। যদিও এসময় পল্লব হঠাৎ আত্মীয়-স্বজন-প্রিয়-পরিজনের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

পল্লবের বিলিতি সঙ্গীত সাধনায় বাধা দিতে বন্ধু মোহনলাল তার বাস্তববাদী দৃষ্টি নিয়ে নানা যুক্তি তর্কের সাহায্যে বাধাদানের চেষ্টা করেছিল। সে পল্লবকে বার বার বোঝায় বিলেত ও আমাদের দেশ এক নয়। অর্থাৎ বিলেতে শিল্পীর প্রতিপত্তি প্রচুর হলেও আমাদের দেশের অবস্থাটা ঠিক সে রকম নয়। সুতরাং সেটা ভালো করে উপলব্ধি না করে এ লাইনে তার যাওয়া ঠিক হবে বলে মনে করে না। সে আরও বলেছে "ভাই পল্লব, কিছু মনে কোরো না; তুমি যতই দেশের লোককে বোঝাতে চেষ্টা কর না কেন যে সঙ্গীত একটা মস্ত বড় আর্ট, য়ুরোপে তার এত আদর, এত প্রতিপত্তি, একাগ্র সাধনা নইলে তার চর্চ্চা রাখা অসম্ভব ইত্যাদি— তুমি যদি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সঙ্গীতকেই ব্রত করে দেশে ফের তাহলে তারা কি এ সব হেসেই উড়িয়ে দিয়ে

বলবে না যে ছেলেটা কেবল কেবল লম্বা লম্বা বোলচাল ছাড়া আর কিছুই শেখবার সময় পায় নি ? ...”[৩৭] পল্লবকে সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে আরও সচেতন করে, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে তথ্য তুলে ধরে বলে, “... আমার প্রধান বক্তব্য এই যে সঙ্গীতকে ব্রত করলে আমাদের দেশে ও সমাজে যে অবজ্ঞা সইতে ও ঘা খেতে হবে— (অর্থোপার্জ্জনের কথাও ছেড়েই দাও)— তার গুরুত্ব সম্বন্ধে খুব ভাল করে সচেতন না হওয়া পর্য্যন্ত এ পথ নিও না। অর্থাৎ এক কথায় কিছু করো না। ভাব, ও নিজেকে নানান্ উপায়ে পরীক্ষা কর। এইটুকু মাত্র তোমার বন্ধুর অনুরোধ, উপদেশ নয়।”[৩৮] কিন্তু অন্য বন্ধু কুঙ্কুম পল্লবকে সঙ্গীত চর্চায় উৎসাহ দিতে থাকে। তখন কুঙ্কুমকেও মোহনলাল সতর্ক করে দেয়। কুঙ্কুম ও পল্লব যে এক নয়, এক ধাতুতে দু’জনের মন তৈরি নয় এটা সে বোঝায়। এবং পরবর্তীকালে কুঙ্কুম যেন পল্লবকে প্রভাবিত করতে না পারে তা বোঝাতে মোহন বলেছে, ‘পল্লবের মন ও তোমার মন এক প্রকৃতির নয়। তুমি নিজে দারিদ্র্যের মুখ দেখেছ। পল্লব বরাবর সুখের কোলেই মানুষ।’[৩৯] অন্যদিকে কুঙ্কুমও মোহনলালের ব্যারিস্টারি ছেড়ে ধনী লোকের সন্তান হয়ে কৃষি শেখাকে মসকরা করে।

আসলে পল্লব আশৈশব সঙ্গীতকে বড় ভালবাসত। এমনকি অতি শৈশব থেকেই সে পিতার কাছে গান শিখত। কিন্তু কেম্ব্রিজে গিয়ে পল্লবের উচ্চশ্রেণীর সংগীতের অভাবে তার প্রাণটা সময়ে সময়ে বড় পিপাসিত হয়ে উঠত। মনের এই ব্যাকুল অবস্থাতে তার অজ্ঞাতে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রতি তার মনটা ঝুঁকতে থাকে। তবে বিলেতে ভাল হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের সুযোগ পেলে হয়তো তার মন বন্ধুদের সংস্পর্শে এলেও য়ুরোপীয় সংগীতের প্রতি অনুরক্ত হতে সুযোগ পেত না। কিন্তু বিলেতে সেই চিরাভ্যস্ত সংগীতের রস ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে তার মনটা মাঝে মাঝেই রাস্তা-ঘাটে শোনা পিয়ানো বা বেহালার নতুন ধ্বনি-স্রোতে ধীরে ধীরে বেশি করে সাড়া দিতে থাকে। সেইসঙ্গে পল্লব কেম্ব্রিজে যে lodging এ থাকত, তার পাশের বাড়িতে সে প্রায়ই পিয়ানো বাজানো শুনতে পেত। সুরগুলি ছোট ছোট হলেও শক্ত ছিল না— যা তার কাছে ভারি মিষ্টি লাগত।[৪০] তার ওপর সে জানালা দিয়ে দেখতে পেত যে, সে ঘরে বসে প্রায়ই যে মিষ্টি পিয়ানো শুনতে পেত— সে সব আসলে একটি ছোট মেয়েরই কীর্তি। পরে পল্লব তার

সহপাঠি জন নর্টন-এর কাছে জানতে পারে তার নাম রিণা। তার পিতা বিগত মহাযুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

পরবর্তীকালে দেখা যায়, সেই রিণার শিক্ষকের কাছেই পল্লব পিয়ানো শিখতে শুরু করে। পল্লব এবার সেই বিলেতি সংগীতের পাশাপাশি বিলেতি সঙ্গীতের গায়েন রিণার মা মিসেস নার্টনের দ্বারাও ধীরে ধীরে প্রভাবিত হতে থাকে। তার সঙ্গে চলতে থাকে দীর্ঘ কথাবার্তা। পল্লব এই নর্টনকেই বিলেতে এসে প্রথম মন খুলে সমস্ত কিছু বলতে পেরেছে। আমরা জনতে পারি, এই মিসেস নর্টনের স্বামী দু-বছর আগে মহাযুদ্ধে মারা গেলেও সে আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে রাজি হয়নি। যদিও এই দু-বছরেই তার কয়েকজন করপ্রার্থীকে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। বিবাহ না করার কারণ জিজ্ঞেস করলে 'তিনি বরাবর ম্লান হেসে বলতেন যে, বিবাহ মানুষের একবারই হতে পারে।'[৪১] যার গলার মধ্যে আমরা অনেকটা বাঙালি নারীর স্বর শুনতে পাই। যা কিনা বিলেতি সমাজে ধনী সুন্দরী বয়স্কা বিধবার "না" বলাকে কেউ বিশ্বাস করে না। দেশে থাকতে অনেক অশিক্ষিতের পথে ঘাটে পিয়ানোর পটুত্বের সে নমুনা শুনত, তাতে তার মন য়ুরোপীয় সঙ্গীতের মহিমা সম্বন্ধে সচেতন হবার বড় একটা সুযোগ পায়নি। আর এখন সে আস্তে আস্তে উপলব্ধি করতে শুরু করল যে বিদেশি কোনও মহিমময়ী কীর্তিকেও মনপ্রাণ খুলে গালি পাড়া কত সহজ। 'বিলাত ও ভারতের মধ্যে ব্যবধান কতখানি! এখানে একজন বড় শিল্পীর কি আদর, কি প্রতিপত্তি! আর তার স্বদেশ! তার মনটা ভারি হয়ে উঠল।'[৪২] বিলেতে আসার আগে পল্লব ভাবতেই পারেনি যে সঙ্গীতকে অবলম্বন করে বড় হওয়া যায় বা জীবিকা নির্ধারণ করা যায়! কিন্তু যেদিন সে একজন বাদকের ভাগ্যে কৃতজ্ঞ শ্রোতৃবৃন্দের অজস্র করতালি, উজ্জ্বল প্রশংসাদৃষ্টি ও ফুলের তোড়া লাভের দৃশ্য তার মনকে তার শত আপত্তি সত্ত্বেও সঙ্গীতকারের গৌরবময় জীবনের দিকে সচেতন করে দিয়েছিল।

আমাদের সমাজে তথা দেশে গান করাকে ঠিক কোন দৃষ্টিতে দেখে তা পল্লব মিস্টার টমাসকে জানায়। সম্মান ত নয়ই, বরং তা কলঙ্কেরও। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, "আমাদের দেশে সঙ্গীতকলা অশিক্ষিত ও অসচ্চরিত্র পেশাদার ও বাইজীদের হাতে পড়ার দরুণ সঙ্গীত দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা আজ এত হেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজে কাজেই ভদ্রলোকের পক্ষে

আমাদের দেশে গান গেয়ে টাকা রোজগার করা মহা কলঙ্কের কথা। তাছাড়া আমাদের দেশ গরীবও বটে। ...”[৪৩] কিন্তু মিস্টার টমাস বর্তমানের এ অবস্থা মেনে নিয়েও ভবিষ্যতের ওপর আস্থা রাখতে চাইলে (“আমার মনে হয় তোমাদের দেশেও ক্রমে হাওয়া ফিরে যাবে ও আমাদের দেশের মতন অবস্থা হবে।”) তাতে পল্লব সহমত পোষণ করে না। এমনকি সে স্পষ্টত জানায়, সে এখন যথেষ্ট অর্থোপার্জন করতে চায়। কারণ হিসেবে জানায় টাকা ছাড়া সংসারে কোন বড় ভালো কাজ সম্ভব হয় না। ঠিক এইভাবে পল্লব দিনের পর দিন তার নিজের পেশা বা জীবনের চলার আদর্শ নিয়ে দোলাচলে থাকে। বারে বারে নিজের যুক্তি, বন্ধুদের দেওয়া পরামর্শ বা যুক্তির জালকে খণ্ডন করে প্রতিবারে নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় ও তা নিজেই বাতিল করে দেয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সে সঙ্গীতের প্রতি মনস্থির করে ও পিতার কাছে জানায়। এরপর ‘হার্মনি’, পিয়ানো ও গান শিখতে শুরু করে কেমব্রিজ ও জার্মানিতে।

সেকালে বিলেতে যাওয়া যে কতবড় ফ্যাশান বা প্রবণতা ছিল পাশাপাশি চাকরি বা উপার্জনের রাস্তা ছিল তার আমরা প্রমাণ পেয়ে থাকি এই উপন্যাসের মধ্যে। পল্লবের বন্ধুরা বাল্যকাল থেকেই পল্লবকে প্রায়ই সেই উৎসাহে ‘চিঠিপত্র লিখ্‌ত তারা কত আশা করে বসে আছে যে পল্লব বিলেত থেকেই একটা মস্ত চাকরি নিয়ে দেশে ফিরে তাদের সকলের মুখোজ্জ্বল করবে। আত্মীয় স্বজনও ঐ একই ঢঙে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ জাহির করত যে— পল্লবও যখন বিলেত থেকে ফিরে এসে রাশি রাশি অর্থোপার্জ্জন করবে। পল্লব বিলেত এসেছিল, তখন এই মান্যগণ্য হওয়া, বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করে মহা দান-ধ্যান করে খ্যাত হওয়া—এই সব তার স্বগণ্ডীর আদর্শেই অন্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত হ’ত।’[৪৪]

উপন্যাসটিতে পল্লবের মুখ থেকে আমরা জানতে পারি, ইউরোপের বিভিন্ন শহরের পরিচয় ইউরোপের বেশিরভাগ শহরই সমুদ্রের উপরে অবস্থিত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পল্লব বিলেত গিয়ে দেশের অতিথিপরায়ণতার সঙ্গে বিলেতের তুলনা করেছে মনে মনে। পল্লব বিলেতে মিস্টার টমাসের পরিবারের মধ্যে থাকতে থাকতে বুঝতে পেরেছিল, বিলেতের মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মানদণ্ড (Standard of living) আমাদের দেশের থেকে অনেক উঁচুতে। ইউরোপে মধ্যবিত্তদের আয়ও যেমন, ব্যয়ও তেমনি বেশি। তাই ইউরোপীয়দের পক্ষে একজন বাইরের

অতিথিকে ঠিক তাদের মানদণ্ড অনুসারে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে হলে সেজন্য সাজসরঞ্জম নিতান্ত কম রাখতে হয় না। ফলে তাতে তাদের খরচও হয় বেশি। মিস্টার টমাস তাকে মিস্টার বাক্‌চি বলে ডাকতেন। 'দেশে থাক্‌তে দেশের পণ্ডিতদের ভোজন বিলাস বা মেয়েদের সাতান্ন রকমের ব্যঞ্জন রাঁধতে গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেরব হওয়াটা তার চোখে খারাপ লাগত না। বরং স্থানে অস্থানে সময়ে অসময়ে অথিতিকে ঘটা করে জলযোগ করানোটাও সে হৃদ্যতা প্রকাশের একটা মস্ত উপায় মনে করত। কিন্তু বিলেতে এসে এ বিষয়ে মতামত এর মধ্যেই অনেকটা বদলে যায়। সে বুঝেছে 'য়ুরোপীয় সামাজিকতায় সর্ব্বত্র খাওয়ানো-দাওয়ানোকে উপলক্ষ হিসেবেই গণ্য করে মেলামেশা ও আলোচনাকেই বড় করে দেখবার মধ্যে সে একটা নূতন সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্য দেখতে আরম্ভ করে। য়ুরোপীয় সমাজে খাওয়াবার জন্য কেউ অতিথিকে যে পীড়াপীড়ি করে না; লজ্জা না করার সমীচীনতা সম্বন্ধে কেউ নিরন্তর উপদেশ দেয় না; অতিথিকে আর চাই কি না একবারের বেশি কেউ জিজ্ঞাসা করে না ইত্যাদি সব প্রবণতাকেই তার সুষ্ঠ মনে হত।'[৪৫]

এরপর আমরা এই উপন্যাসের মধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতকে লক্ষ করে থাকি। মিসেস সিংহের বাড়িতেই ভাড়া থাকতেন পল স্মিথ। স্মিথের সঙ্গে কথা বার্তায় আসে যুদ্ধের প্রসঙ্গ। যুদ্ধের আগে একটি ব্যঙ্কের খাজাঞ্চির কাজ করতেন আর যুদ্ধের পরে সওদাগরি অফিসে হিসেবের কাজ নিয়েছিলেন। এমনকি গত যুদ্ধে তিন বছর ধরে তিনি ফ্রাঙ্গে যুদ্ধও করেছিল। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে একটি গোলার একখণ্ড ইস্পাত লেগে তাঁর বাম চক্ষুটি নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে তিনি চক্ষু গহ্বরের মধ্যে কাচের চোখ বসিয়ে নিয়েছেন। এছাড়া বিষাক্ত বাস্প তাঁর ফুসফুসকে চিরকালের জন্য নষ্ট করে দিয়েছিল। স্মিথ আরও মিসেস সিংহকে জানায়, "... যুদ্ধের কষ্ট যে কি তা যে নিজে জানে নি, তাকে বোঝাব কেমন করে বলুন? জানেন তো The wearer only knows where the shoes pinches? শিশুকে কি পুত্র শোক বোঝানো যায়? আপনাদের কেমন করে বোঝাব বলুন যে শুধু যুদ্ধের অযোগ্য বলে গণ্য হবার আকাঙক্ষায় কত শত লোক প্রত্যহ অঙ্গহানির কামনা করেছে। শুধু একবার শুভ্র শয্যায় শোবার স্বপ্নে অবসন্ন সৈনিক রোগ প্রার্থনা করেছে? কামান গর্জ্জনের শব্দে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে শুধু ঘন্টাখানেকের জন্য নিস্তব্ধতা ভোগ করার জন্য কত লোক বিধাতার কাছে বধিরতার রব চেয়েছে? ...

ফ্যাক্টারিতে কাজ করা ও ট্রাম চালানো? ... ফুঃ ! দিনের পর দি পরিখায় বাস; মাসের পর মাস অভুক্ত হয়ে থাকা; বছরের পর বছর শুধু যন্ত্রের মত চালিত হওয়া; —তার ওপর প্রত্যহ প্রিয় সহচর বন্ধুর হস্তপদ ও এমনকি ছিন্নমুণ্ডু চোখের সাম্‌নে গোলার আঘাতে উড়ে যেতে দেখা—।"[৪৬]

দেশের বন্ধু বিলেতে এসে দেখা মোহনলাল ও কুঙ্কুমর সঙ্গে। পল্লবকে তারা বলে বিয়ে করে সংসার গণ্ডির মধ্যে নিজেদেরকে আবন্ধ না রেখে দেশের কাজ করবে। সেজন্যই মোহনলাল বিলেতে এসে হঠাৎ একদিন সিভিল সার্ভিস ছেড়ে দিয়ে দেশের সেবার জন্য কৃষি শিখতে শুরু করে। পল্লব পিতার পরামর্শ মত ব্যারিস্টারিতে ফি জমা দিলেও অনেক ভেবে-চিন্তে সঙ্গীতের প্রতি মনোনিবেশ করে। মোহনলালের পর পল্লবের মধ্যেও বাল্য বা কৈশোরের যে দেশীয় অভিজ্ঞতা ছিল তা যেন বিলেতের মাটিতে এসে আস্তে আস্তে সরে যেতে শুরু করল। এখন পল্লবের মনে হয় বিলেতে এসে প্রথম "আমি বদলাব না মোটেই" ছেলে মানুষির কথা। তার এই ছেলে মানুষি কথা শুনে কুঙ্কুম সেদিন সামান্য তর্ক না করে হেসেছিল কেন, তা এখন সে বুঝতে পারে। পল্লব বুঝতে পারে ইউরোপীয় ছাত্রদের মান (Standard)। কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড ইউরোপের এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে তর্কালোচনা হয়। সেই আলোচনায় ইংলণ্ডের বড় বড় পদাধিকারীদের এমনকি পার্লামেন্টের প্রধানমন্ত্রী, সচিব, প্রমুখদের নিমন্ত্রণ করে আন হত। তাদের তর্কের Standard মধ্যে মধ্যে এত উচু হয় যে, টাইমস প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়। কারণ বিলেতে তরুণের যুক্তিতর্ক আমাদের দেশের মতন শুধু তারুণ্যের ওজরে অবজ্ঞাত হয় না। এইরকম আলোচনা সভাতে একদিকে কুঙ্কুম ভারতীয়দের স্বাধীনতা ও স্বয়ত্তশাসনের জন্য মত প্রতিষ্ঠা করলে সেই মতকে মোহনলাল খণ্ডন করে সাহেবদের বাহবা অর্জন করে। মেমকে বিয়ে করে মোহনলাল ভারতীয়দের স্বাধীনতা বা স্বয়ত্তশাসন না পাওয়ার একাধিক যুক্তি বলে। এতে বিলেতে অবস্থিত প্রায় সকল ছাত্র সমাজ তার বিরোধিতা ও তাকে নানাভাবে সমালোচনা করতে থাকে। এতে বাল্যকালের বন্ধু কুঙ্কুমের সঙ্গে সম্পর্ক হিংসায় পরিণত হয়। একমাত্র পল্লব ব্যতীত এখন আর কেউ তার কাছে যাতায়ত করে না। এতে মোহনলাল মনে মনে কুঙ্কুমের সঙ্গে মিলতে চাইলেও বাইরের দিক থেকে ইগো

তাতে বাঁধার সম্মুখীন করেছে। পল্লবও তাদের মিলনের সহযোগিতা করতে চাইলে হিতে বিপরীত হয় এই ভয়ে সাহস করে না। যদিও একসময় মোহনলালের নিষ্ঠুর আঘাতে পল্লবের সঙ্গেও তার বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটে।

পল্লব এতদিন দেশে থাকার সময় ইংরেজদের একটা বিশেষ দৃষ্টিতে দেখত। তার মনে হত 'যেন ইংরাজের ও ভারতীয়ের মনোজগতের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আছে'।[৪৭] বিলেতে এসে মিসেস নর্টনকে কাছে পেয়ে সেই অভিজ্ঞতাটি যেন আরও বিচিত্রশ্রী হয়ে ধরা দেয়। স্বদেশ ও বিদেশের আদব কায়দা, সম্মান ও সম্মানহানির নানান চিন্তা ও চেতনা দেখা দেয় তার মনের মধ্যে। বিলাতি সমাজের সমস্ত খুঁটিনাটি তার চোখে পড়ে। বিলাতি বাড়ির পরিপাটি সাজানো গোছানো বাড়ির সামনে ফুলের বাগান, প্রতিটি ঘরে, সিঁড়িতে, কোণে নানা স্থানে সুন্দর সুন্দর ফুলের টব, যা পল্লবের খুব বড় ভালো লাগে। বিলেতেও নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরাও প্রায় সব গৃহকর্ম নিজেদের হাতেই করে থাকে। পল্লব দেশে থাকতে ভাবত বিলেতের মেয়েরা বুঝি ইঙ্গবঙ্গ মেমসাহেবদের মতোই বিলাসিনী। কিন্তু বিলেতে এসে তার এ ভ্রম ভাঙতে বেশি দেড়ি হয়নি। এমনকি সে লক্ষ করে অনেক বড় বাড়িতে একটার বেশি দাসী থাকে না—ভৃত্যত থাকেই না। 'মেয়েরাই সেখানে বাজার করে, রাঁধে, সেলাই করে, ঘরদোর পরিষ্কার ইত্যাদি রাখে। মিসেস সিংহও খুব পরিশ্রম করতে পারতেন। ...'[৪৮] এছাড়াও মিসেস সিংহ তাঁর লন্ডনের বাড়িতে প্রায়ই ভারতীয় ছাত্রদের ও ইংরেজ বন্ধুবান্ধবদের চা, ডিনার প্রভৃতির নিমন্ত্রণ করতেন। তিনি নিজের কথাবার্তায় বা আদবকায়দায় কখনও ইংরেজ নারী হলেও বঙ্কিমগ্রীবা মেমসাহেব ছিলেন না। তিনি ভারতীয়দের কখনো পর মনে করতেন না, বরং স্বামীর সম্পর্কে মনে প্রাণে আত্মীয় বলেই মনে করতেন। প্রায় সব সময়ই শাড়ি পরতেন। এখন আর পল্লব বিশ্বাস করে না বাঙালির ইংরেজ মহিলা বিয়ে করে সুখী সম্ভব নয়। যে পল্লব ইংরেজ জাতিকে একসময় খাদকের ভূমিকায় দেখত, এখন সেই পল্লব মিসেস সিংহকে দেখে ইংরেজের সদিচ্ছার কথা ভাবে।

বিলেতের দস্তর মত থিয়েটার বায়স্কোপে মিস স্মিথকে নিমন্ত্রণ করার কথা ভাবতে থাকে পল্লব। যদিও তার এসম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই ছিল না। তাই মিস স্মিথকে নিমন্ত্রণ করার ইচ্ছা থাকলেও কোনোদিন সাহস পেত না। পল্লবের চোখে পড়ে বিলেতের জলহাওয়ায় মোহনলালের চারিত্রিক পরিবর্তন। 'এই কি সেই মোহনলাল যে দেশে থাকতে অনাত্মীয়া মেয়েদের সঙ্গে মিশতে তার চেয়েও বেশি সঙ্কুচিত হত।'[৪৯] সেই মোহনলালকে শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, সে মেমসাহেবকে বিয়ে করেছে, এতদিনের নিজের আদর্শচ্যুত করে। এতে পল্লব অবাক হয়ে ভাবতে থাকে। মোহনলাল অবশ্য পল্লবকে তার মোহের কথা বলে, "ভাই পল্লব ভগবান না করুন— তবে তুমি যদি কখনও মোহে পড় তখন আমার কথার মর্ম্মটা বুঝবে। ..."[৫০] এছাড়াও মোহনলাল নিজের মনের এই ভাবান্তর নিয়ে পল্লবের কাছে একের পর এক যুক্তি বলে চলেছে। সে বলেছে, "... একটু ভেবে দেখ দেখি, কত সময়ই না আমরা দেখতে পাই যে অশৈশব দারুণ ভীষ্মব্রতধারী ব্রহ্মচারী বিলেতে আসতে না আসতে আবিষ্কার করেন যে তিনি আসলে ভীষ্মর ছায়াও মারান নি। নয় কি? বরাবর নিজেকে বিবেকানন্দ মনে করে আসার দরুণ কত ছেলেই না আগুণ নিয়ে খেলা করতে যায়। এদের যদি নিজেদের চরিত্রবল সম্বন্ধে আত্মম্ভরিতা অভ্রভেদী না হত তাহলে হয়ত এদের জীবনে অনেক সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংস হতে হত না। ... পল্লব, নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণাকে প্রথম থেকে একটু অবিশ্বাস করে চলতে শেখার মত বন্ধু জগতে কমই আছে।"[৫১] শুধু তাই নয়, মোহনলাল অকপটে তার দেশীয় অতীত জীবনের কথা আদর্শের সমালোচনা করেছে। "তুমি ত জান যে আমি নিজে দেশে থাকতে কখনও থিয়েটারে যেতাম না, নাটক নভেল পড়তাম না, মেয়েদের ছায়াও মাড়াতাম না ইত্যাদি। কিন্তু এখন ত বুঝতে পারছি যে এ ভাবে উপবাসে রাখলেই নারী সঙ্গলাভের দুর্জ্জয় বাসনাকে শুকিয়ে মারা যায় না!"[৫২] এমনকি এখন তার মনে হয় ছেলেবেলা থেকে নারীর সঙ্গ কমবেশি পেয়ে এলে সেটার মোহ নিষিদ্ধ ফলের মত দুর্দ্দম্য হয়ে ওঠে না। অন্য দিকে, "আমরা ছেলেবেলা থেকে বাধ্য হয়ে নারীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত থাকি বলে হঠাৎ যখন এদেশের ললনাগণের সঙ্গে মেলামেশার অনেকটা অবাধ স্বাধীনতা পাই তখন আর টাল সামলাতে পারি না।"[৫৩] মোহনলালের এই ইউরোপীয়ানাকে, এই যুক্তিকে পুরোপুরি মেনে নিতে না পেরে প্রায়ই কুঙ্কুম

ও পল্লবের সঙ্গে তার তর্ক বেঁধেছে। আসলে মোহনলাল এখন পুরোপুরি ইউরোপীয় মানসিকতায় প্রস্তুত, আর সেই মানদণ্ডের নিরিখে এখন সে পল্লবকেও বোঝাতে চায়। তাই সে এবার উদাহরণ যুক্তি দিয়ে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ স্থান-কালের সাপেক্ষে পরিবর্তনের কথা বলেছে। আমাদের সমাজের বিভিন্ন বিধি যেমন— সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, সমুদ্রযাত্রা, ছুৎমার্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছে। সামাজিক মানদ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিগত মানদণ্ডের প্রভেদের কথা বলেছে। কারণ সমাজ অনেক সময়ই কোন আচরণকে নিন্দা বা বিধিনিষেধ আরোপ করে সমাজের মঙ্গলের কথা না ভেবে, গতানুগতিকতার প্রভাবে বা বিচারে।

ইউরোপীয় সমাজে মেয়েদের চুম্বন করা ও সাধারণের মধ্যে flirtation সম্বন্ধে শিথিল ধারণা প্রচলিত আছে। উদাহরণ হিসেবে সে বলেছে, তার পরিচিতা এক ধনী উচ্চশিক্ষিতা ফরাসি বিধবা একদিন তার সামনেই তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, সে যখন স্কুলে পড়ত তখন থেকে সে flirtation রূপ প্রথাটির একটু বেশি পক্ষপাতি ছিল। যা আমাদের দেশে কোনও মার মুখে ছেলের সম্বন্ধে ঠাট্টা শোনা কদাপি যায় না। এদেশে কিন্তু মা ছেলেকে, ভাই বোনকে ও বাপ মেয়েকেও flirt হলে ঠাট্টা করতে কখনো কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ এরা যাদের শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে তাদের flirt করতে দেখলে বিশেষ ত্রস্ত বা লজ্জিত হিয় না। কারণ এরা ভাবে এটা ধর্ম্ম— বেশি দূর না গড়ালে এতে বেদ অশুদ্ধ হয় না।[৫৪] তাদের কাছে দেহের ও মনের পবিত্রতাই সবচেয়ে বড় জিনিস। শেষ পর্যন্ত মোহনলাল পল্লবকে সেই যুক্তি দিয়েই মিস স্মিথকেই বিয়ে করতে চায়।

বিলেতে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ঘুমাতে যাওয়ার আগে বাড়ির সকলকে, আত্মীয় বন্ধুদের চুম্বন করে, না হয় তাদের সঙ্গে হস্তমর্দ্দন করে রাতের মত বিদায় নিয়ে থাকে। পল্লবও মিসেস নর্টনদের বাড়িতে থাকার সময় আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়েছে সেই সমস্ত সে অভ্যাসে। এর একবছর পর পল্লব বাড়ি সে ফিরলে খুব কষ্ট পায়। তবে পল্লবের য়ুরোপীয় সমস্তকিছুকেই যে ভালো লাগত তা কিন্তু নয়। তার কিছু ভালো না লাগারও বিষয় ছিল। যেমন বিলেতে শিক্ষিতা মেয়েদের সিগারেট খাওয়ার প্রথাকে পল্লব বরাবর বন্ধু মহলে নিন্দা করে। তিনি টমাসকে তাই বিজ্ঞভাবে বলেছে, "কিন্তু আপনাদের গৃহজীবন (home-life) তেমন নয়, যেমন

আমাদের। আপনাদের দেশে ত কত লোক দেখি দিনের পর দিন দুবেলা হোটেলে খায় ও সন্ধ্যাটা ক্লাবে কাটায়! ডিকেন্সের লেখায় আপনাদের গৃহচুল্লীর (fire-place) চারদিকে পরিবার পরিজন-পরিবেষ্টিত হয়ে গল্পগুজব করার যে বিবরণ পড়ি সেটা আপনাদের আজকালকার সভ্যতায় ত বড় একটা দেখতে পাই না।"[৫৫] মিস্টার টমাস পল্লবকে জানিয়েছে, ইউরোপীয় সমাজে ক্রম যান্ত্রিকতার ফলে মানুষের অভ্যেস ও বিলাসের পরিবর্তন হচ্ছে। তবে সঙ্গে এটাও বলেছে, "... পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের সুকুমার প্রবৃত্তির যে অনুশীলন হচ্ছে না এটা ধ্রুব। হচ্ছে কেবল- অসম্ভব উচ্চাশার প্রশ্রয়দান, ক্ষমতার মদমত্ততায় আসক্তি বৃদ্ধি ও জাতীয় অভিমানের খোরাক যোগানো।"[৫৬] পল্লবও শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরে মিস্টার টমাসকে বলেছে, "কিন্তু আমাদের দেশে যে গান-বাজনায় অর্থাগম নেই মিস্টার টমাস? অথচ অর্থাগম না হলে শুধু যে জীবনযাত্রায় নানা অসুবিধা ঘটে তাই নয়, দেশের কোন কাজও যে হয় না। এটা আমার কাছে একটা মস্ত বড় সমস্যা মনে হয়। ..."[৫৭]

আমরা জানতে পারি, রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে থাকাকালীন দিলীপকুমার রায় তাঁর 'মনের পরশ' বইটি পাঠালে সেই বইটি যে রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেননি সেকথাও 'স্মৃতিচারণে'র মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ও উপন্যাস হয় নি দিলীপ। যেখানে সেখানে রাজ্যির তর্ক উড়ে জুড়ে ব'সেছে। অথচ বইটি চমৎকার উপন্যাস হ'তে পারত যদি তুমি মনে রাখতে যে উপন্যাসের সব আগে চরিত্র-চিত্রণ ও গল্পের ইমারৎ পাকা হওয়া দরকার।"[৫৮] শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ মতোই ১৯৫৬ সালে ছয় মাস ধরে এই উপন্যাসটি কে নতুন করে লিখেছেন, যেখানে অবান্তরকে বাদ দিয়ে শুধু গল্প, চরিত্র-চিত্রণকে বরণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর মতে এটি দাঁড়ায় আমার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস; যার আমি নব নামকরণ করি: "ভাবি এক হয় আর।"[৫৯]

দু-ধারা (১৯৩৫):

'১৯২৭ সালে যখন দ্বিতীয়বার য়ুরোপে যাই তখন "দুধারা" লেখার সময়ে এই "দোসর উপন্যাসটি" (sister novelette) লেখার প্রেরণা পেয়েছিলাম। কিন্তু তার পরে "দোলা" লিখতে সুরু করি ব'লে হ'য়ে ওঠে নি। কাজেই "দুধারা" এতদিন অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল বৈ কি। কাল রাত্রে হঠাৎ সে-হারানো প্রেরণাটি নামল, এবং এত দ্রুত যে, আমি নিজেই আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই, কারণ কাল রাত্রে আরম্ভ ক'রে আজ রাত্রের মধ্যেই এটি শেষ হ'য়ে গেল লেখা। ... ' (বহুবল্লভ উপন্যাসের ভূমিকাংশে লেখক বলেছেন)।

এই উপন্যাসের সকল চরিত্ররা একত্রিত হয়েছে বন্ধু ভেবে দুটো প্রাণের কথা প্রাণখোলাভাবে বলতে। গ্রীষ্মকালে রোমে টাইবার নদীর ওপারে একটি নির্জন 'কাফে'তে ওরা সেদিন 'আইসক্রিম পেয়ালা' সামনে করে গল্প করতে থাকে। একজন নারী একসঙ্গে কতজন পুরুষকে ভালোবাসোতে পারে বা একজন পুরুষ একসঙ্গে কতজন নারীকে ভালোবাসোতে পারে এই ভাবনা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সূচনা হয়েছে। রেনে বলে "আমিও তো তাই বলি হে। বর্ত্তমান মাপাজোপা নীতি মেনে চলতে আমার আপত্তি নেই: আমি শুধু চাই যে, লোকে অন্ততঃ মুখেও স্বীকার করুক্ যে, য়ুরোপের এই একপতি ও একপত্নীত্বের আইডিয়াটার মধ্যে এমন কোনো সত্য বিরাজ করে না যা প-বি-ত্র, ম-হা-ন, গ-ভী-র ইত্যাদি।"[৬০] ওলগার এতে রাগ হয়। পিয়ের অবশ্য রেনের এই মতের সঙ্গে সহমত। ওলগা পরিষ্কার জানায় কোনো মেয়ের পক্ষে দু'জন পুরুষকে একত্রে ভালোবাসতে পারে না— যদিও পুরুষের পক্ষে এটা সম্ভব হলেও হতে পারে। ওলগার মতে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক অনেকটা সরল করে দেখাই ভাল, যে বিষয়ের সঙ্গে তার য়ুরোপীয় বন্ধুরা একমত।[৬১] কিন্তু নিলয় উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে তার অভিমত জানায়, "আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, মেয়েরা সুযোগ পেলে একসঙ্গে দুজনকে ভালোবাসতে পারে।"[৬২] নিলয়ের ছোটবেলা বিদেশ ভ্রমণের সময় মনে উড়ু উড়ু ভাব ছিল। কিন্তু পরে হল্যান্ডের আবহাওয়ায় তার বিষম গদ্যময় ঠেকে, ফলে উড়ান্ত মনের পাখিটিকে মাটির মধ্যাকর্ষণের কবল থেকে রক্ষা করা হয়ে উঠল দূরহ। তারপর ক্রমাগতই তার মনে হতে থাকে এখানে নয়, এখানে নয়। নিলয়ের কথায়, "... য়ুরোপে

গৌরী মেয়েদের মধ্যে এ-রকম ঘনকৃষ্ণ চাউনি আমি আর কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। তার চোখের পল্লব—”[৬৩] (আমহাস্ট স্ট্রীটে ট্রামে হঠাৎ য়ুরোপীয় মেয়ের চোখাচোখির উপলব্ধিতে।) তারপর মেয়েটির কুকুরছানাটি রাস্তায় নামলে গাড়িচাপা পড়ার হাত থেকে কোনোক্রমে নিলয়ের রক্ষা করে যদিও কুকুরটি নিলয়ের হাতেই কামড়ে দেয়। এরপর মেয়েটি তাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়, নিজের একটি কার্ড দিয়ে পরের দিন ডিনারের নিমন্ত্রণ জানায়। মেয়েটি তার পরিচয়ে বলে, ‘তার স্বামী জাতে ওলন্দাজ নয়— জার্ম্মান, একটি জার্ম্মান ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ভারতের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান, আমার সঙ্গে আলাপ করে খুবই খুশী হবেন— ইত্যাদি।’[৬৪] নিলয় সেই মেয়েটির স্বামীর কথা শোনামাত্র বিমর্ষ হয়ে পড়ে। যদিও হোটেলে ফিরে নিলয়ের মন আবারও খুশী হয়ে ওঠে।

যুরোপের আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকদের গবেষণার সঙ্গে আমাদের দেশের মনস্তাত্ত্বিকদের চিন্তায় অনেকটা তফাৎ আছে, তা নিলয়ের কথায় কথায় উঠে এসেছে। নিলয়ের কথায় “কেননা য়ুরোপে এসে মনে হল যে বিংশ শতাব্দীর যৌনতত্ত্ববাদীদের এই আবিষ্কারটির মধ্যে একটা মস্ত সত্যতা আছে যে, প্রতি যৌন চিন্তাই আমাদের অবচেতনের মধ্যে চিরকালের জন্য একটা ছাপ ফেলে যায়, যেহেতু মানুষ কোনো কিছুই কখনো ভোলে না— ভুলতে পারে না।”[৬৫] নিলয় তাই এবার বলে “মিনা যতদিন বেঁচেছিল ততদিন আমার পক্ষে নিজের মনকে তার আকর্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব ছিল না।”[৬৬]

রেনে গাঢ় চিন্তার সুরে বলে, “আমার বার বার মনে হয়েছে যে, জীবন হচ্ছে একটা আর্ট, একটা লীলা, একটা নৃত্য— প্রকাশেই যে হয় সমাহিত– হয় সার্থক। ... আমাদের কল্পনা-জগতে যেখানে যা-কিছু অরূপ লুকিয়ে থাকে, তাকে যে-কোনো উপায়ে ফলিয়ে তোলাতেই মানুষের মনুষত্বের একটা মস্ত সার্থকতা মেলে না কি?”[৬৭] কিন্তু নিলয় বরাবরই বলেছে, আর্টের প্রতি আমাদের বাড়াবাড়ির কথা। আর্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। রেনে বলে আর্টের ক্ষেত্রে অনুভূতি থাকা দরকার না হলে পিতলকে শুধু পালিশ করলেই সোনা করা যায় না। অন্যদিকে নিলয়ও যুক্তি দিয়ে বলে অনুভূতিটাই যদি সোনা হয় তাহলে পালিশ না করলেও তো চলে। এভাবেই নিলয় ও রেনে আর্ট নিয়ে চলতে থাকে যুক্তির পর পাল্টা যুক্তি।

এরপর আমরা এই উপন্যাসে দেখি, প্রেম বা নারীর সতীত্ব নিয়ে ইউরোপীয় রেনে ও ভারতীয় নিলয়ের ভাবনার মধ্যে প্রভেদ বিদ্যমান। রেনে নিলয়কে বলে " ... প্রেম সম্বন্ধেও আমাদের ধারণার সঙ্গে তোমাদের ধারণার একটা মূলগত ভেদ আছে?"[৬৮] কিন্তু নিলয় সেই কথায় সায় দিলেও একটু নিলয়ের ভাবনায় একটু সংশোধন করে বলে, "প্রেম সম্বন্ধে বললে ঠিক বলা হবে না। প্রভেদটা হচ্ছে তোমাদের ও আমাদের নারী ও নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে ধারণা নিয়ে।"[৬৯] নিলয় মিনার কাছে এই সতীত্বের ধারণা পেয়েছে— যেটা আসলে চিরন্তন নয়— বিশেষরূপে আচারগত। তার মতে শিক্ষিত মানুষদের বিবাহ বিমুখতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে নারীর সতীত্বের বাজারদর অত্যন্ত কমে যেতে বাধ্য। বর্তমান য়ুরোপে হচ্ছেও তাই। তার আক্ষেপ "আচারগত সংস্কারকে বাদ দিলে তবেই বোঝা যায় কোথায় প্রেম সত্যিকার বড়। তাই তো আমার এত আক্ষেপ যে, মিনার ক্ষেত্রে তার মুখ্য ভালোবাসার চেয়ে তার গৌণ সতীত্বের দাবিটাকে সর্ব্বেসর্ব্বা করেছিলাম আমি।"[৭০] তার মনে হয়েছিল হারমানের প্রতি মিনার ভালোবাসার সম্বন্ধীর অন্তদৃষ্টি। নিলয় আরও জানায় তার হলান্ড ছেড়ে ইংল্যান্ড বেড়াতে যাবার বাসনা দু-চার দিনের মধ্যেই উবে যায়। সে রোজ বিকালে মিনাদের বাড়ি যেতে আরম্ভ করে। কারণ হারমানও জানায় কিছুদিন ব্যাঙ্কের কয়েকটা কাজের চাপে মিনাকে একাকী কাটাতে হবে। আর মিনাও তার সহচার্যকে স্বাস্থ্যকর মনে করে ইত্যাদি। এতে আস্তে আস্তে নিলয় ও মীনার মনে ভাব জমতে শুরু করে, প্রেম, ভালোবাসা হয়। নিলয়ের প্রশ্ন হল প্রেমের প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্য নির্ধারণ করা। এতে ওলগা আরো খানিকটা স্পষ্ট করে বলে, "সমস্যাটা তো আর প্রেমের মহিমা ঠিক্ কোথায় সে নিয়ে নয়, প্রেমের ধর্ম্ম কি সেইটে ঠিক মত জানা নিয়ে; বটে তো? যদি তাই হয় তবে আগে থাকতে উচিত অনুচিত-রূপ মনগড়া থিওরির ছাঁচে ঢালাই করতে গেলে তাতে ক'রে প্রেমের স্বরূপটি ফুটয়ে দেওয়া হয় কি?"[৭১] পিয়েরও একজনকে ভালোবেসেছিল, পিয়েরকেও একজন ভালোবেসেছিল কিন্তু তাদের প্রেমের ললিত সৌরভটি তাঁদের চোখের সামনে বিবাহের দৈনন্দিনতায় দু-দিনে উবে যায়। রোমা হল সেই পাত্রী, যাকে সে আজ হারিয়েছে।

রেনের মতে প্রেম হল বুনো ফুল— সে সমাজের পরিচ্ছন্ন টবে বাঁচতেই পারে না? নিলয়কে উদ্দেশ্য করে বলে ‘আমার মনে হয় যে, শেষ-পর্য্যন্ত না-গেলে য়ুরোপে এ-রকম একটু–আধটু আদর-আপ্যায়নকে সত্যি সত্যি দোষের মনে করে খুব কম লোক। মানে, আধুনিক উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে– অবশ্য পিউরিটান ও মিসেস্ গ্র্যাণ্ডিরা বাদ।’[৭২] পিয়ের কথা অনুযায়ী বিবাহ আর প্রেম ভালোবাসা এক নয়। বিবাহ হল ‘ওটা হোচ্ছে একটা বাস্তবের ব্যাপার; ওটা কি জানো?– ওটা হচ্ছে একটা শৃঙ্খলার সুবিধার, মিলেমিশে– স্বস্তির মধ্যে থাকার প্রয়াস – কোনো একটা বড় আদর্শের বা রোমান্সের স্বত-উৎসারিত প্রবাহ নয়।’[৭৩] কিন্তু ভারতীয় নিলয়ের ভালোবাসা, প্রেম, সতীত্ব, বিবাহ সম্পর্কে একাধিক ইউরোপীয় মতাদর্শ তার বুঝতে কষ্ট হয়, পদে পদে তাকে হোঁচট খেতে হয়। নিলয়কে ওরিয়েন্টাল বলে বিবেচনা করে।

মিনা তার শরীর অসুস্থ জন্য নিলয়কে সন্ধ্যাবেলা তাদের বাড়িতে আসার চিঠি লেখে, নিলয় এসে মিনার মূর্ছা যাওয়া দেখে বরফ দেয়। পরে মূর্ছা কেটে মিনা সুস্থ হয়ে নিলয় তার কোলের মধ্যে মিনার মাথা রাখে, গরম দুধ খাওয়ায়। মিনার স্বামী হারমান জানায় মিনার জন্য নার্স দেখবে, কিন্তু হল্যান্ড জার্মান-এ কর্মচারী বড় বেশি মেলে না।[৭৪] তাই দিনে নিলয় ও রাতে হারমানের সেবা শুশ্রূষায় মিনা সুস্থ হয়ে ওঠে। মিনা নিলয়কে জানায়— ‘আমি- হারমানকে শুধু যে ভালোবাসি তাই নয়— প্রাণের প্রতি রক্তকণা দিয়ে শ্রদ্ধা করি; তাই তার প্রতি অবিশ্বাসিনী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’[৭৫] মিনার নিলয়ের সঙ্গে রাইন উপত্যকায় বেড়াতে যাওয়ার আবদার করে। নিলয় য়ুরোপে দীর্ঘদিন থাকার পরও হারমান যে তাকে সন্দেহ করে না এ কথা ভাবতে থাকে।

পিয়ের রেনেকে বলে, “মঁশের, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, বিংশ শতাব্দীর একটা মস্তবড় প্রবণতা হচ্ছে— ‘বিবাহ-রূপ অনুষ্ঠানটির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা হারানো। ... ”[৭৬] ‘সমস্ত য়ুরোপের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কি একটা অপরিমিত সংশয়ের কলকল্লোল শুনতে পাও না ? ফ্রান্সে একদল উচ্চশিক্ষিত নারী তো আজকাল প্রকাশ্যেই বলেছেন যে, একজন মেয়ে একই সঙ্গে একজনের আদর্শ স্ত্রী, আর-একজনের আদর্শ প্রণয়িনী ও অন্য-একজনের আদর্শ মা হতে পারে— এবং শুধু হতে পারে নয়, তাই হওয়া উচিত। তাই দু-চারটে আল্‌গোছে চুম্বনাদি কি

বেশি কথা- mon-enfant?'[৭৭] কিন্তু নিলয় এই মতকে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারে না। তার মতে এই শ্রেণির মেয়ের প্রকৃতি হয় উচ্ছৃঙ্খল— নয়, স্বামীর কাছে যা চেয়েছিল তা পায়নি। কিন্তু মিনার ও হারমানের মধ্যে একটা সত্য ভালোবাসা ছিল বলে তার ধারণা। পিয়ের ধারণা হারমানের সমস্ত কিছু জেনে শুনেই তাদের মিশতে দিত। রেনে বলে ওলগাও হারমানের মত বিংশ শতাব্দীর লোক। মিনার কাছে ক্ষমা চাইতে মিনা বলে 'তোমার সুপ্ত শান্ত প্রকৃতিকে আমিই জাগিয়েছি— নানা ছদ্ম ঈঙ্গিতে। দোষ আমারই— কেন না আমি তোমাকে প্রতিদান দিতে অক্ষম। তাই তুমিই আমাকে ক্ষমা কোরো—শুধু ... আমার এ না-পারার ব্যথা একটু কল্পনা করতে চেষ্টা কোরো! শুভরাত্রি।'[৭৮] এরপর নিলয় মিনাকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ স্মৃতি অবতারণা করে চলে— কখন কাছে আবার কখনও পিয়ের কাছে। হারমান নিলয়কে তার আদর্শের কথা জানিয়েছিল— "... হারমান তো আমাকে বার বার বলেছে, ও সতীত্বে বিশ্বাস করে না— করে প্রেমে ; শিকারে বিশ্বাস করে না— করে স্বয়ম্বরায় ; বাঁধনে বিশ্বাস করে না— করে মুক্তিতে।[৭৯] হারমানের শেষ চিঠির কয়েক ছত্র লেখে— নিলয় চলে যাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই মিনার মৃত্যু হয়। সেখানে লেখে, "আমি জানতাম ও তোমায় ভালোবাসত, কিন্তু এতখানি— জানতাম না। জানলে হয়তো ওর অকালমৃত্যু নিবারণ করার একটু চেষ্টা করতে পারতাম। ... ওকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারতাম যে, আমার কাছে ভালোবাসাটা ঠিক যতখানি বড়— সতীত্ব বা দেহশুদ্ধি ঠিক ততখানিই অকিঞ্চিৎকর! ... "[৮০] হারমানের আজ তীব্র আক্ষেপ সে নিজেকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারেনি বলে, প্রকাশ করতে জানতে পারে না বলে।

বহুবল্লভ (১৯৩৫):

এই উপন্যাসের তিন বন্ধু প্রদীপ, শ্রীলা ও ডায়না হল উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী। এই তিনজনের নামে তিনটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন লেখক। উপন্যাসটিতে আমরা দেখি, শ্রীলার সঙ্গে বিভূতির বাগদান করে তার পিতা বিলেতে পাঠিয়েছিলেন বিলেতি ডিগ্রি অর্জন করতে। শ্রীলা বিলেতে গিয়ে বন্ধু প্রদীপের সঙ্গে একসময় ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে আর তার কিছুদিন পরে প্রদীপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দানা বাধে ডায়নার, ফলে শ্রীলা ফিরে আসে বিভূতির কাছে। আর শ্রীলার কথা ভেবে ডায়না বিয়ে করে চার্লসকে, ফলে প্রদীপ থেকে যায় শূন্যতায়।

প্রদীপ: উপন্যাসের শুরু ইংলন্ডের বিখ্যাত হ্রদজনপদে লেক ডিস্ট্রিক্টের বর্ণনা পাই। লেখক বলেছেন, "ইংল্যাণ্ডের নিসর্গ-সুন্দরীর পীঠস্থান"। বিভূতি শ্রীলাকে বলত "যদি কখনো বিলেতে যাও শ্রীলা, এ পল্লী-উপান্তে কিছুদিন নীড় না বেঁধে ফিরো না" সবিদ্রুপে বলত বিভূতি।'[৮১] পরে আমরা জানতে পারি— প্রদীপ, শ্রীলা, ডায়ানা তিনজনই কতবারই যে গেছে এই শান্ত "স্বপ্নঘেরা" পল্লীটির বিশ্ববিশ্রুত 'ডভ-কটেজে' তার ঠিক নেই। এখানেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন ন বছর এবং তাঁর পরে কোলরিজ ডিকুইন্সি কুড়ি বছর— ইংলন্ডের বাণীর তিন বরপুত্র।

শ্রীলা ও প্রদীপ সেই "ডভ-কটেজ" থেকে সেদিন ফেরে। কুটিরের সৌন্দর্য দেখে শ্রীলা মুগ্ধ। শ্রীলার বাবা গৌরিশঙ্কর শ্রীলাকে বিভূতির সঙ্গে বাগদত্তা করে বিভূতিকে বিলেতে পাঠান। অন্যদিকে শ্রীলারও বিলেত দেখার আগ্রহ কম নয়। 'অস্থির—সত্যিই। নৈলে এমন কাজ কেউ করে কখনো? নিজের অবস্থা "বৈল্লাতিকী" নয় ব'লে বাগদত্তাকে বিলেতে পাঠায় একাকিনীই? অবশ্য শ্রীলার বাবা গৌরীশঙ্করই যোগাতেন বেশির ভাগ টাকাটা— কষ্টে— শ্রীলার ভাইবোন অনেকগুলি— তবু বিভূতিকেও তো পাঠাতে হ'ত কিছু না কিছু মাস মাস! "বিলেত দেশটা মাটির" জেনেও যে শ্রীলার বড় ইচ্ছা ছিল দেশটা দেখা।'[৮২] বিভূতির বাবা মারা গিয়েছিলেন এবছরই— কালাশৌচ তাই এবার বিয়ে হয় না, তাই বিয়ের আগে বিলেতে পাঠায় একরকম জোর করেই।[৮৩] শ্রীলার মা মমতার ইচ্ছা ছিল না, মেয়েকে বিয়ে না দিয়েই সাতসমুদ্র পারে পাঠানোর। কিন্তু গৌরীশঙ্করের শির তুঙ্গে থাকায় কারও সাধ্য ছিল না তাঁর সিদ্ধান্ত ব্যাঘাত

করতে। 'যাই হোক্ শেষটায় যা ধার্য্য হ'ল তা এই যে, শ্রীলা হয় লণ্ডনে নয় কেম্ব্রিজে যাহোক কিছু একটা পাশ করবে। পাশটা গৌণ— বিলেত যাওয়াটাই মুখ্য।'[৮৪] বন্ধু প্রদীপও কেম্ব্রিজে যাওয়ার পরামর্শ ও সহযোগিতা করে। প্রদীপ অক্সফোর্ড থেকে মোটরে করে মাঝে মাঝে শ্রীলার কাছে কেম্ব্রিজে যেত, শ্রীলাকে নিয়ে একাধিক জায়গায় ঘোরানোর জন্য কখনও ব্রাইটনে আবার কখনও লন্ডনে যেত। এতে শ্রীলা সব থেকে বেশি খুশি হত। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে যায় গ্রাসমিয়ারে। এরপর সে ডায়নার বাড়িতে তিন সপ্তাহ কাটায়। ডায়ানাকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধ কাকা ফ্রান্সিস দার্জিলিং যাওয়ার পথে ঘোড়া থেকে পড়ে অচৈতন্য হয়েছিল এমন সময় প্রদীপ তাঁকে উদ্ধার করে প্রাণে বাঁচায় ও পরে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। বিপদের বন্ধু। সিভিলিয়ান হলেও কালো প্রদীপকে বৃদ্ধের ভালোই লাগত আর প্রদীপেরও শুষ্ক বৃদ্ধকে পছন্দ হয়েছিল। তাই প্রতি ছুটিতে এক সপ্তাহ এখানেই কাটান। প্যারিসেও সে অনেকটা প্রদীপের জন্য বিলাসে থাকতে পেরেছিল।

কমুনিসম্ পড়ে শ্রীলা জোর আনন্দ পেত।[৮৫] কিন্তু শ্রমদীক্ষায় নয়, সোশ্যালিস্ট দীক্ষায় প্রত্যেকে যা চাইতে পারে তার আদর্শে। প্রদীপ এসব করত কারণ তার ছিল 'আকৈশোর দুর্ব্বলতা: সুন্দরী- বিশেষ সুকণ্ঠী মেয়ের আবদার শোনা— হুকুম তামিল করা। শ্রীলা দুই-ই। কণ্ঠে ওর যদিও বাজত বীণার সুরে জলদমন্দ্রই বেশি—তবু স্বরটা এ-ত মোলায়েম, মানে কণ্ঠের স্বরখানি—যাকে ধ্বনি-বিজ্ঞানে বলে টিম্‌বার—!'[৮৬] অবশ্য তা ডায়নার কাছে মনে হত 'ওরা দুজনে যেন পরস্পরের দোসর—complement: একজন দিত স্বভাবে, নিত অকুণ্ঠে।'[৮৭] বায়রণের English Bards and Scotch Reviewers-এ তাঁর অপার দুঃখ অপরিমেয় জ্বালা একটু গাল খেয়েই। ডায়না ও প্রদীপের কথাবার্তার এসেছে বায়রণ, শেলি, কীটস-এর কথা প্রসঙ্গ। '...যাঁরা সব চেয়ে বেশি প্রশংসা পেয়েছেন তাঁরাই সব চেয়ে বেশি অকৃতজ্ঞ-স্পর্শকাতর ? জীবদ্দশায় বাইরণের মতন প্রশংসা পেয়েছে জগতে কোন্ কবি? সমস্ত য়ুরোপ যাঁর কাছে ছিল নতজানু— শেলি উচ্ছ্বসিত- এমন কি দ্রষ্টাপুরুষ কবীন্দ্র গেটেও যাঁকে বলেছিলেন, "Byron issues from the sea-waves ever-fresh?"'[৮৮] ইংরেজ মেয়ে ডায়নার বর্ণনা 'এই ডায়ানা। ইংরেজ মেয়ে এমন হয় কে জানত? সুন্দরী নয়। শ্রীলার পাশে দাঁড়াতেই পারে না। এমনকি,

শ্রীমন্ত মেয়েও নয়। তবু— কী বলবে? লাবণ্যময়ী? না, লাবণ্য বলতে মুখশ্রী ও দেহশ্রী আসেই। হ্যাঁ, বলবে— অসঙ্কচে বলবে— মাধুর্য্যময়ী মেয়ে! নিটোল— স্নেহে সেবায়! হাসিতে গল্পে! ... আর কী, সুন্দর আঁকে! ... গ্রাসমিয়ারে বৃদ্ধ রুগ্ন কাকার সঙ্গে একেবারেই একলাটি থাকে তো— কিন্তু কী হাসিমুখে! ...' [৮৯]

বিলেতে ডায়নার বাড়িতে শ্রীলা গেলে ডায়না শ্রীলার জন্য দার্জিলিং-এর চা খেতে দেয়— এতে শ্রীলা মহা খুশী। প্রদীপও সেখানে। প্রদীপ আর শ্রীলার ঘনিষ্ঠতা দেখে পূর্বেই ডায়না তাদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকত, যে-কোনো ছুতোয় তদের থেকে চলে আসত একা। আজকেও তারা সঙ্গে থাকতে বললেও ডায়না একই অবস্থান নেয়, বাড়ির কাজের ওজর দেয়। প্রদীপও তাতে সায় দিলে শ্রীলা রেগে চায়ের পেয়ালা ঠেলে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে যায়। এরপর মানসিক চাপে শ্রীলা অজ্ঞান হয়ে পড়ে, প্রদীপের কাছেও এই খবর পৌঁছায়। পরে শ্রীলা চেতনা ফিরে পায়। এখন শ্রীলা আরও সহজ সরল হয়, তাতে প্রদীপের চোখে শ্রীলাকে আরো ভালো লাগে। এরপর আসে দুজনের মধ্যে কবিদের নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা।

ফ্রান্সিসের বাগানের বর্ণনার সাথে আরো একাধিক কথাবার্তায় ফ্রান্সিস প্রদীপকে জিজ্ঞেস করে সে ডায়নাকে ভালোবাসে কি না? না হলে আরও অনেক সচ্চরিত্র পাত্রের অভাব সেদেশে হবে না। কিন্তু প্রদীপ জানে ডায়না চিরকাল বিয়ে করবে না, কিন্তু সেকথাকে ফ্রান্সিস মিথ্যা বলে জানে। ডায়না বিয়ে না করার কারণের কথা প্রদীপকে জানাতে থাকে। প্রথম আঠারো বছর বয়সে এক আমেরিকান ছেলে ডায়নার পিছু নেয়, সেখানে সে বড় ঘাই পেয়েছে। শুধু সেখানে নয়, অন্যত্রও প্রদীপ নিজের দেশের হৃদয় বড় টাকার থেকে বললে তার বিরুদ্ধে পণপ্রথার কথা বলতে থাকে। প্রদীপের আপন ভাবনার স্রোত বয়ে যায় ডায়না ও শ্রীলাকে নিয়ে, প্রেমকে নিয়ে। ডায়নাকে প্রদীপের আপন মনে হওয়া সত্ত্বেও কেন উন্মুখ হয়ে থাকত শ্রীলারই প্রসাদ কণিকার জন্যে?[৯০] সে কি ভালোবাসে না ডায়নাকে? আর না বাসলে এত বেদনাবোধ তার কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবনা।

ডায়না

প্রদীপ বিছানায় শুয়ে দীর্ঘ ভাবনা ভাবতে থাকে। বিশেষ করে তার ভাবনার মধ্যে আসে বৃদ্ধ সানফ্রান্সিসের কথা, ডায়নার কথা। 'মানুষ ছুটে বেড়ায় তার বাসনার ফুলকির আগু টানে।...'[৯১] এই দীক্ষা দিয়েছে তাকে ডায়না, ছোট ডায়না। তাই ডায়নার প্রতি শ্রদ্ধায় তার মনটা ভিজে ওঠে। কেবলই তার মনে হয় ফ্রান্সিসের কথা: "অথচ কে বলবে– বাইরে যে-মেয়ে এত সংসারী ... এত মিশুক"[৯২] বিলাতের গ্রীষ্মকালের বর্ণনা 'ভোর সাড়ে তিনটেয়ই আলো। পণ্ডশ্রম— আর বিছানায় এপাশ-ওপাশ করা—ঘুমের তপস্যায়। চারটের সময়ই পড়ল বেরিয়ে।'[৯৩] প্রদীপ আনমনে ছড়ি ঘুরোয়। যদিও ছড়ি ঘোরানো বিলেতে সুশীলতা নয়— বিশেষত বৃদ্ধের সামনে— তবু। সেই সকালে বৃদ্ধের সঙ্গে হ্রদের দিকে চলতে চলতে বৃদ্ধ ফ্রান্সিস প্রদীপকে জানায় রুডল্‌ফের ছেলে চার্লসের সঙ্গে ডায়নার বিয়ে দিতে চায়— যদিও ডায়না তাকে না বলে দিয়েছে। চার্লসকে প্রদীপের ভালো লাগে না, বিশেষত ডায়ানার চিরসঙ্গী হিসেবে তো নয়-ই। তাই চার্লসের চেহারা নিয়ে মনে মনে হাসি ঠাট্টা, ছি ছিক্কার, ধিক্কার করতে থাকে। প্রদীপ ভেবে পায়না কেন ডায়নার আজীবন একলা থাকতে চায়।

হর্ট হাউসের বাঁ ধারে হনিসাক্‌লের লতাকুঞ্জে অজস্র পীতাভ হনিসাক্‌ল ফুলের চাঁদোয়ার নিচে একটি টি-পায়ের দুপাশে ডায়না ও চার্লস বিশ্রাম্ভালাপে মগ্ন। প্রদীপ, শ্রীলাসহ সবাইকে দেখার পর সকলের সামনে চার্লসকে পরিচয় করিয়ে দিল এবং কিছুক্ষণ পর চার্লসের বাহুলগ্না হয়ে দুজনে বেরিয়ে গেল। এতে প্রদীপের বুকে জ্বালা ও ক্ষোভ দুটো-ই বেড়ে যায়। এই ঘটনা প্রদীপের মনে তোলপাড় করে যায়। এবং সে ভাবতে থাকে বৃদ্ধ চার্লসের মতন লোক ডায়নাকে চাইতে পারলে ডায়না অপার্থিব নন। ডায়নাকে তাই আজ দাবি করতে তারও ইচ্ছা করছে। শ্রীলার থেকে ডায়না কোথায় আলাদা সেটাও উপলব্ধি করে। এই ডায়না ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভক্ত, আর শ্রীলা বায়রনের, ডায়না সত্যেই কবি— শ্রীলা বিদুষী; ডায়না সরল, শ্রীলা জটিল; ডায়না সাড়া দেয় কবিদের স্বপ্নে- শ্রীলা সাড়া দেয় ভাববিলাসীদের অন্তর্বিরোধে। প্রদীপকে ডেকে নিয়ে ডায়না শ্রীলার মূর্ছা যাবার কথা জানায় এবং বিভূতি লন্ডনে এসেছে এই কারণে যে, "শ্রীলার ঘন ঘন মূর্ছা হচ্ছে শুনে গ্রামের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে এসেছেন— তাকে নিয়ে যেতে।

শ্রীলা তার করলে এখানে আসবেন কালই।"[৯৪] ডায়নার কাছে প্রদীপ সমস্ত শুনে শ্রীলার কাছে যেতে চায়। এদিকে ডায়না প্রদীপকে মিস্টার ম্যাকফার্সিঙ্কে আগামী ক্রিস্‌মাসে বিবাহ করার কথা জানালে প্রদীপের চারিদিকে সোনার আলো পাণ্ডুর হয়ে যায়। প্রদীপ এবার সে যেতে চায় শ্রীলার কাছে। কারণ সে জানায় শ্রীলাকেও সে ভালোবাসে। আবার প্রদীপ যে শুধুমাত্র শ্রীলাকেই ভালোবাসার টানে টানে তা নয়, ডায়নাকেও ভালোবাসারই টানে টানে। তাইতো ডায়না বলে— "প্রদীপ, সত্যি ক'রে বলো তো? আমার প্রতি টান অনুভব করো তুমি কখন? যখন চার্লস আমাকে টানে, নয়?"[৯৫] ডায়না আরও প্রদীপকে জানায় চার্লস তাকে প্রথমে ভালোবেসে পরে দূরে চলে গেলেও আবার তার কাছে ফিরে এসেছে। আর তখন ডায়না প্রদীপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। এতে চার্লস তাতে অত্যন্ত পীড়া পেত, এবং সে চাইত ডায়নাকে প্রদীপ ছাড়া করতে। ডায়না জানায় শ্রীলা বিভূতিকেও ভালোবাসে, প্রদীপকেও— বিভূতিকে এখনও ভুলতে পারেনি। ডায়না অনেকটা আক্ষেপের স্বরে প্রদীপকে জানায় যে তাকে বিয়ে করলে হয়তো প্রদীপ সুখী হতে পারবে না, এমনকি ভালবাসলেও, এমনকি যে কোনো মেয়েকেই নিয়ে নীড় বেঁধে সুখী হতে পারবে না প্রদীপ সেটাও জানায় ডায়নাকে।[৯৬] শ্রীলা আজ প্রদীপের মন থেকে দূরে চলে গেলেও ডায়না তার হৃদয় গগন ছেড়ে গেছে।

শ্রীলা: শ্রীলা নিজেকে অসুস্থবোধ করে, তাতে প্রদীপ অভয় দিয়ে শান্ত হতে বলে ও কোলে মাথা টেনে নেয়। শ্রীলা প্রদীপের কোলের মধ্যে ঘুমাতে থাকলে প্রদীপ শ্রীলাকে নিয়ে ভাবতে থাকে। দশ মিনিট পর শ্রীলা জেগে ওঠে প্রদীপ ও ডায়নার প্রসঙ্গে রাগ অভিমান করলে প্রদীপ ক্ষমা চায় আর তাতেই শ্রীলার মুখ লাল হয়ে ওঠে, "আমাকে এমন এড়িয়ে চলছ কেন প্রদী ?" [৯৭] অথচ প্রদীপও নিজেকে ঠিকমত বুঝতে পারে না। তাই সে শ্রীলাকে বলেছে, "রাগ কোরো না শ্রী–সত্যি আমার মধ্যে যে কী হানাহানি চলছে আমি নিজেই ভালো বুঝতে পারছি না। এখন আমি মানুষের সাহচার্য্যেরও বা'র ব'লে ভয় হয় সত্যি— সময়ে সময়ে।"[৯৮] ডায়নার কথা প্রসঙ্গক্রমে শ্রীলা আবারও রেগে গিয়ে ডায়নার প্রদীপকে কাছেই ফিরে গিয়ে ভালোবাসা না বাসা ইত্যাদির ব্যাপারে কৈফিয়ৎ জানতে বলে। শ্রীলা এবার কঠিন কণ্ঠে বলে, "বলছি চোখে

দেখে। আমি স্পষ্ট কথা বলে অভব্য বদনাম কিনতে পারি— কিন্তু ফাঁদ পেতেও ভব্যা সাজি না মনে রেখো। সাধাতে পারি— কিন্তু সাধি না কাউকেও— তুমি আপনি এসে ধরা না দিলে আমি তোমার দিকে ফিরেও চাইতাম না জেনো।"[৯৯] এবং সেই সঙ্গে সে স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, ডায়নার কাছ থেকে প্রদীপকে ছাড়িয়ে নিতে চেয়েছে প্রাণপণে। "কিন্তু কোনো অসৎ উপায়ে নয়, মিথ্যা অভিনয়ে নয়, ওর কুৎসা রটিয়ে নয়— চেয়েছি সোজা উপায়ে—আমার ভালোবাসারই টানে ... "[১০০] প্রদীপ জানায় ডায়না তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। শেষ পর্যন্ত প্রদীপ শ্রীলা ও ডায়না উভয়ই উভয়কে হারাল। আসলে উপন্যাসের মধ্যে 'শ্রীলা ডায়ানা উভয়েই বলল— নিজের নিজের স্বপ্নভঙ্গের এজাহারে— যে, একমুখী নিষ্ঠা ওর নেই— তাই। এই অপরাধ?'[১০১]

দোলা (১৯৩৫-৩৬):

দিলীপকুমার রায়ের 'দোলা' উপন্যাসটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। তিনটি খণ্ডেই একেকজন নরনারীর নামে নামাঙ্কিত। প্রথম খণ্ডের নাম 'সন্ধ্যা', দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'ইসাবেলা' এবং তৃতীয় খণ্ডের নাম 'মসিয়ে বেনার'। উপন্যাসের তিনটি খণ্ডেই আমরা দেখতে পাই, ইউরোপীয় প্রেক্ষাপট বা পটভূমিতে বাঙালি বা ইউরোপীয় এক বা একাধিক পাত্র-পাত্রীদের প্রেম-ভালোবাসা, নীতি-নৈতিকতা বা আদর্শ বিভিন্নভাবে দোলায়িত হয়েছে বারংবার।

দিলীপকুমারের ব্যক্তিজীবনে এই 'দোলা' ছিল, আর তা কোনও একদিনে সৃষ্টি বা নিরসন হয় নি। তারই প্রতিফলন আমরা জানতে পারি এই উপন্যাসের মধ্যে। দিলীপকুমারের বারো-তেরো বছর বয়সে পরমহংসদেবের 'কথামৃত' বইটি পড়ে মনে হয়েছিল আন্তরিক যে, ডাকলে সে ভগবানকে পাবে। তখন তিনি গাইতেন, 'ডাক দেখি মন ডাকার মত— কেমন শ্যামা থাকতে পারে?'[১০২] এ-রঙে যতক্ষণ মনটা রাঙিয়ে থাকে ততক্ষণ তাঁর অবিশ্বাসের কথা মনে হলে হাসি পেতেন। তখন তার কেবলই মনে হত বিশ্বাসের এজাহারই বাস্তব, সংশয় ছায়াময়। এর ফলে তাঁর মনে শুরু হত দোলা— 'যে দোলায় একবার এদিক একবার ওদিক গতির কথা আমার উপন্যাস 'দোলা'য় খানিকটা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি ... এ-দোদুল্যমান অবস্থা ঘটে— এদিকে বিশ্বাসী মন মেনে নিতে চায়, ওদিকে তার্কিক মন প্রমাণ চায়। বলে বটেই তো।'[১০৩]

এর পরেই স্মৃতিচারণে তিনি বলেছেন, 'কথাটি বাল্যকালেই আমার মনে লেগেছিল। কিন্তু ওই যে বললাম মনের গতি বিচিত্র— তাই দোলা থামে না। এক একবার বুদ্ধিমন্তদের দেখে মনে হত; যুক্তি আর না— সরল বিশ্বাস ই ভাল। যেই দেখতাম কোনও সরল বিশ্বাসী ভক্তের স্নিগ্ধ শান্তিময় মুখ— অমনি মন বলত; বুদ্ধির আত্মপ্রসাদকে কাজ নেই আশকারা দিয়ে— যিনি পৌঁছে দেন শুধু অনৈশ্চিত্যে। মাথায় থাকুক আমার সরল বিশ্বাস, পিতৃদেবের কথাই শ্রদ্ধেয়; যুক্তি যাকে গ্রহণীয় মনে না করে সে বরণীয় নয় নয় নয়'।[১০৪] আমরা খণ্ড অনুযায়ী 'দোলা' উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও চরিত্র বিশ্লেষণে সেটাই দেখানো চেষ্টা করব।

প্রথম খণ্ড – 'সন্ধ্যা'

প্রথম খণ্ডের প্রধান চরিত্র– সন্ধ্যা, স্বপন, আনা, মসিয়ে বেনার, নীরা ও মরিস। উপন্যাসটি শুরুতে আমরা দেখি, মসিয়ে বেনারের কাছে বাগান দেখে স্বপনের মনে পড়ে যায় শেলির— 'The emerald green of leaf-enchanted beams... ' আর এমন সময়ই মসিয়ে বেনার ও স্বপনের প্রথম প্রেমিকা আনার প্রবেশ। আগমনেরে উদ্দেশ্য, আনাকে প্যারিস থেকে নীসে নিয়ে যেতে হবে; আর একাজে সাহায্যের জন্য মসিয়ে বেনার স্বপনকে বলে। এতে স্বপন প্রথমে না বললেও পরে যখন তাকে অভিভাবকত্ব দায়িত্ব দিয়ে টিকিট হাতে দেয় বেনার, তখন শুধু রাজি হয়নি, নিজেকে মনে মনে ভাগ্যবান বলেছে। কারণ আনার সঙ্গে অভিমান করে সে নীসে থেকে প্যারিসে আসার প্রায় দেড় মাস হয়েছে। এতেই তার মনে হচ্ছিল আনা তার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। তাই আনার কাছে থাকার এটা স্বপনের কাছে একরকমের সুযোগও বলা চলে। এরপর প্যারিসে ট্যাক্সি করে যেতে যেতে আনার সঙ্গে তার হাজারও অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা হতে থাকে। প্যারিসের গ্রাসে Hotel Beau Sejour সমুদ্রের ধারেই ওঠে। সেখানে আনা অসুস্থ হলে ডাক্তারের পরামর্শে আনাকে সর্বদা শান্তিতে ও আনন্দে রাখার চেষ্টা করে। আনাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যায়, বিভিন্ন নতুন নতুন জিনিস কিনে দেয়, কখনও বা ইংরেজি থিয়েটারে অভিনয় দেখান। এক সময় আনা ঘুমিয়ে পরলে স্বপনের প্রেমিক সত্তা ও অভিভাবক সত্তা নিয়ে মনের মধ্যে নানা রকমের দোলা দেখা দিতে থাকে। তার পর

রাতে স্ত্রী সন্ধ্যার স্বপ্ন দেখা ও পরের দিন মরিসের চিঠি আসে। আনার অপর প্রেমিক মরিসের পত্র আসা নিয়েও তার মনে নানা রকমের দোলা দিতে থাকে। কারণ মরিস একসময় নীরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে বিয়ে করলেও এখন আবার আনার কাছে ফিরে যেতে চায় এমনকি মসিয়ে বেনার পর্যন্ত এ বিষয়ে আনাকে ভেবে দেখার জন্য পত্র পাঠায়। মরিসের স্ত্রী নীরাও আনাকে জানায়, তাকে মরিস বিয়ে করেছে এমনকি তাদের সন্তান হলেও নীরাকে সে কোনো দিন ভালোবাসেনি।[১০৫] তাই নীরা আনাকে মরিসের কাছে ফিরে যেতে অনুরোধ করে একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছে। লিখেছে কারণ নীরা ও আনা একসময়ের বাল্য সখী ছিল। শেষ পর্যন্ত দেখি, নীরা আনার ভালোবাসার কাছে হেরে গিয়ে মরিসকে আনার কাছে তুলে দিতে চেয়েছে। এই সময় আনা নীরার কাছে যেতে চাইলে স্বপনের হৃদয়ে মোচড় দিয়ে ওঠে।

অন্যদিকে, স্বপন আনাকে ও তার বিবাহিত স্ত্রী সন্ধ্যাকে নিয়ে দোলা খেয়েছে। কখনও সে আনাকে কাছে পেতে চায়, আবার কখনও তার থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চায়, আবার তার খেয়াল হয় বর্তমানে সে অসুস্থ আনার অভিভাবক, তারই বায়ু পরিবর্তন করার জন্য সে সঙ্গে এসেছে। স্বপনের এই ভাবনার জন্য আনাও কম দায়ী নয়। 'Nothing is unfair in love and war'— আনা স্বপনকে আকৃষ্ট করতে কত কিছুই না করত। স্বপন বিবাহিত এবং সে স্ত্রী সন্ধ্যাকে ভালোবাসে জেনেও আনা ফরাসি মেয়ের মতো নানা ছলাকলা করেছে স্বপনের কাছে। এতে আনা পুরোপুরি সফল হয়েছে। '... আনা— শুধু আনা কেন— এদেশের মেয়েরা প্রায়ই ভূয়োদর্শী নয়? বিশেষ ক'রে এই ছলাকলার ক্ষেত্রে ? তার ওপর ফরাসিনী হ'লে তো কথাই নেই: এ-সব ধনুর্ব্বিদ্যায় তাদের হাতে খড়ি হয় কৈশোর থেকে!'[১০৬] এমনকি অসুস্থতা নিয়ে ছাড়াছাড়ির সময় আনাও স্বপনের কাছে আবদার করেছে, হয়তো সেটাই তার শেষ ইচ্ছা স্বরূপ প্রার্থনা— "একটা রাতের জন্যেও! ছি! Que tu es cruel caromio!"'[১০৭] আনা প্রায়ই বলেন; গেটে মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন— 'Macht doch den Fensterladen auf, damit mehr Licht hereinkomme.' জানলা খুলে দাও, আরো আলো আসুক, আরো আলো—[১০৮] আনা স্বপনকে বলে, "ঠিক চাং তোমাকে সেদিন মিথ্যা বলেনি যে আমরা স্বাধীন শুধু দেখতে। আসলে আমরা নেপথ্যের লক্ষ শক্তির খেলার পুতুল। নইলে পরীর প্রাসাদ নিমেষে ছাড়খার হয়

কেন বলো জীবন পথের প্রতি বাঁকে? ইন্দ্রপুরীর প্রতিষ্ঠা ভূমিকম্পের ওপরেই কেন হয় নিত্য নিরত্ব?"[১০৯]

দ্বিতীয় খণ্ড: এই খণ্ডের নাম 'ইসাবেলা'।

এখানে স্বপনের চিন্তার স্রোত ইসাবেলাকে নিয়েই আবর্তিত হতে দেখি। স্বপন ইসাবেলাকে রুগ্ন শরীর, জীর্ণ পোশাক ও তীব্র অর্থসংকটাপন্ন অবস্থায় দেখতে পেলে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করে। ইসাবেলা তার স্বামী চাং-এর কাছে প্যারিস যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এর পাশাপাশি মনে পরে বিদেশি সভত্যতায় তার খাওয়ার রুচিবোধ কতটাই না পাল্টে গেছে। এরপর দুজনের কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে সেই ইউরোপীয় দাম্পত্য জীবনের কথা। ইসাবেলা স্বপনকে বলেছে ইউরোপের অনেক দম্পতির মিলনের মধ্যেই বিরহ থাকে। আর সেটা ইসাবেলা ও চাং-এর জীবন সম্পর্কেও সমান সত্য। ইসাবেলা আরো বলে ইউরোপে প্রেমকে আবেগের পংক্তিতে বসিয়ে শুধু রোমান্স মনে করে। চাং প্রথমে ইসাবেলার প্রতি মরিয়া হলেও পরে এঞ্জেলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতে ইসাবেলা এঞ্জেলাকে অপমান করলে চাং-এর সঙ্গে প্রায় ছাড়াছাড়ির ভাব হয়ে যায়। আর অন্যদিকে, বার্টন ইসাবেলার প্রতি পাগল হয়ে পড়লেও বার্টনের প্রতি ইসাবেলা আকৃষ্ট কিনা চাং তা বুঝতে পারেনি। যদিও ইসাবেলার উদ্দেশ্য ছিল চাংকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনা। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইসাবেলা চাং-কে লিখতে বাধ্য হয় 'যেন এঞ্জেলাকে নিয়ে ও সুখী হয়, আমি ওর অযোগ্য ...।'[১১০] বার্টনকে ইসাবেলার ভালোবাসা, ভালোবাসার অভিনয় করা, তাকে ছাড়তে চেয়ে ছাড়তে না পাওয়া, চাং-এর প্রতি ঘৃণার সত্ত্বেও কাছে পাওয়ার আকুতি এসবের মধ্যে তাঁকে দোলায়িত হতে দেখা যায়।

শেষ পর্যন্ত এরোপ্লেনে স্বপন ইসাবেলাকে নিয়ে যখন প্যারিসে চাং-এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়, তখন স্বপনের মনেও একাধিক ভাবনা আসতে থাকে। দুজনে প্লেনে যেতে যেতে ইসাবেলা ঘুমিয়ে পড়লে স্বপনের মন বার বার দুর্ভাবনায় জেগে ওঠে। ভাবতে থাকে ইসাবেলার সঙ্গে চাং-এর মিলন হবে কি না প্যারিসে গিয়ে? আনার গতি কি হবে? এখন সন্ধ্যাই বা কি করছে? ইত্যাদির চিন্তায় স্বপন দোলায়িত হতে থাকে। 'য়ুরোপ – যেখানে একনিষ্ঠ, পাতিব্রত্য, মরালিটি

এসবই কুসংস্কারের কোঠায় এসে পড়েছে সেখানে ...।'[১১১] এবং স্বপনের স্বাধীন চিন্তা নিয়ে মনে সংশয় দেখা দেয়।

তৃতীয় খণ্ড: 'মসিয়ে বেনার'।

মসিয়ে বেনার ছিলেন ফরাসি ব্যক্তি, চিত্রকর। প্রথমে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শুরু করলেও বাবা মারা যাওয়ায় পড়া ছেড়ে দেয়। তার বন্ধু ডেনিস, ডেনিসের বোন সারা। বর্তমানে সে প্যারিসে অবস্থানরত। ইসাবেলা প্যারিসে পৌঁছালে তাকে নেওয়ার জন্য মসিয়ে বেনার অপেক্ষা করতে থাকে। বেনারের কাছে ইসাবেলা পৌঁছে চাং-এর খবর নিয়ে জানতে পারে চাং অসুস্থ।

মসিয়ে ও স্বপনের সঙ্গে প্যারিসে সন্ধ্যার সাক্ষাৎ হয়। এখানে সন্ধ্যা স্বপনের আনার প্রতি দুর্বলতার ভাবনা ও নিজেদের আবার মিলনের বাধা, বিপত্তি ও সহজ ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে থাকে। এরপর স্বপন সন্ধ্যার কাছে জানতে চায় আনাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলে সে কি অখুশি হবে? কারণ স্বপন আনার কাছে ফরাসি শিখতে চায়। অন্যদিকে মসিয়ে বেনার সন্ধ্যার কাছে হাসিমুখেই প্রশ্ন করেছে— একসঙ্গে একাধিক ভালোবাসা জীবনে উচিত কি না? সন্ধ্যা তাতে রাগ করে জানায়, আপনারা কেবল মেয়েদের নীতিবাগীশই মনে করেন। আর এখানেই মসিয়ে সার্থক ভালোবাসার শর্ত কি হওয়া উচিত তা সন্ধ্যার কথার সূত্র ধরে বলেছেন। সে আরও বলেছেন, নারীর সতীত্ব, পুরুষের পত্নী বা প্রণয়ীর সংখ্যা ইত্যাদি 'আমাদের সমাজের এক একটা ব্যবস্থা বা বিধান আমাদের পথের-বাঁকে এক-একটা পান্থশালা মাত্র— চরম গন্তব্যস্থান নয়। ...'[১১২] সেই সঙ্গে এই সতীত্ব নিয়েই মসিয়ে, আজকের য়ুরোপের সঙ্গে মধ্যযুগের য়ুরোপের তুলনার কথা বলেছে।'[১১৩] পাশাপাশি বেনার তার নিজের জীবনের প্রেম ভালোবাসার কথা উদাহরণ হিসেবে স্বপন ও সন্ধ্যাকে বলেছে। বেনারের বন্ধুর বোন সারার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, তাতে কৈশোর ও যৌবন ফ্রান্সে কাটানো, গোপনে বাগদত্তা হওয়া ইত্যাদি। আর তাতে স্বপনের পরিষ্কার হয়েছে ইউরোপীয় দেশের পূর্বরাগ থেকে ভারতীয় পূর্বরাগের পার্থক্য।

ইউরোপে যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার থেকে আর্ট পড়া অনেক বেশি কদর তা আমরা বেনারের কথায় স্পষ্ট বুঝতে পারি। বেনার এখানেই ক্ষান্ত না থেকে তার বন্ধু ভালের, যে বর্তমানে জীবিত নেই তাঁর কথা, তাঁর চিঠিতে লেখা জুলিয়ার সঙ্গে ভালাবাসার কথা, রোমান্সের কথা এবং পরবর্তীতে সেই জুলিয়ার একাধিক প্রণয়ীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ইত্যাদি বিষয়ের অভিমত জানিয়েছেন। বর্তমানে জুলিয়া রোম, ভিয়েনা ও বার্লিন ঘুরে প্যারিসে ফিরে একটি কাবারের প্রধান নর্তকী হয়েছে।

প্যারিসের কাত্তিয়ে ল্যাঁত্যা– এখানে অবিবাহিত অবস্থায় যুগল ছাত্ররা থাকে। যেখানে বেনার সারাকে নিয়ে ছাত্র সেজে ছিলেন এবং এমনকি সারা তখন সন্তান সম্ভাবাও হয়েছিল। যদিও পরে সেই সন্তান মারা যায়। মসিয়ে বেনার অনেকটা দার্শনিক সুরে সন্ধ্যাকে জুলিয়া ও সারার প্রেমের আপাত মিলনের কথা, তাদের আলাদা থাকার যুক্তি ইত্যাদি বিষয় বলতে থাকে। আরও সন্ধ্যাকে জানায়, 'ফ্রান্সের একদল তরুণ বোহেমিয়ানাদের এ অত্যন্ত আদৃত প্রথাটির কথা তুমি জানো না। প্রথাটা এমন কিছুই নয়— ছাত্র বা শিল্পীরা অনেক সময়েই তাদের প্রণয়িনী নিয়ে একসঙ্গে থাকে ও পড়াশুনাও করে– এ-ই।'[১১৪] বিবাহপ্রথা থেকে তাদের কাছে এটা অনেক ভাল বলে মনে হয়। সারা ও বেনার ঠিক এরকমই কৈশোরে ভালেরের কাছে ঘরকান্না শুরু করে। এরপর আনার কথামত জুলিয়া সম্পর্কে বলতে শুরু করে— "জুলিয়া ছিল ভালেরের প্রথম প্রণয়িনী— যদিও ভালের ছিল তাঁর ধরতে গেলে দ্বিতীয় বল্লভ, অর্থাৎ দেহদানের দিক দিয়ে।"[১১৫]

সারা ও জুলিয়ার মধ্যে লিলি একসময় উদ্দীপন হিসেবে তাঁদের নৈকট্যে থাকার কাজ করে। নয়-দশ বছরে লিলির টাইফয়েড হলে সারা, জুলিয়া ও বেনারের মধ্যে মিলন হয়। কিন্তু টাইফয়েড আক্রান্ত হওয়ার ৪৪ দিনের মধ্যেই লিলি মারা যায়। জুলিয়া ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলে বেনার তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরপর জুলিয়া ও পিয়ের একসঙ্গে ডান্সের হলে গেলে সেখানে জুলিয়া চাঁদের আলোয় ভালেরের গান ও নাচ করতে করতে পিয়েরের মন কেড়ে নেয়। সমস্ত কিছু সারা দেখে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। ভোররাত্রে ঘরে শুতে এসে পিয়ের দেখে সারা ঘণ্টা তিনেক আগেই মারা গেছেন। সারার এই আত্মহত্যার স্বপ্নভঙ্গের কারণে। তাই সে

পিয়েরের উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখে গেছে। সারা পিয়েরকে ভালোবাসলেও জুলিয়ার সঙ্গে প্রেমের দৌড়ে না পেরে, ভালোবেসে প্রেমের রাজ্যে চিরবুভুক্ষু হয়ে সে মৃত্যুবরণকে বেছে নিয়েছেন। আর এখানেই যেন সারা একজন চির বাঙালিনী নারী, যার মধ্যে শাশ্বাত ভারতীয় নারীকে আমরা খুঁজে পাই। যে শুধুমাত্র ভালেরের কথার যুক্তিতে বিয়ে না করেই সহবাসে সম্মতি জানিয়েছিল। আসলে সে চেয়েছিল প্রেমের শৃঙ্খল, চরণের নূপুর, তৃষ্ণার জল, নয়নের আলো, বুকের নিশ্বাস— প্রেমের প্রতিদানে প্রেম। জুলিয়া ভালের মত মানুষকে ভালোবাসার পরেও বেনারকে আকৃষ্ট করেছে, পিয়ের উচ্ছিষ্ট যৌবনের দোরে পাত পাতছে বলে জুলিয়াকে সারা ধিক্কার জানাচ্ছে। কারণ পিয়ের ছিল সারার কাছে পৃথিবীর একটি সূর্যস্বরূপ। পিয়ের অন্যের কাছে গিয়ে সারার জীবনকে করে তুলেছে অন্ধকারময়। তাই সারার সম্পূর্ণ চিঠি জুড়ে আছে পিয়ের প্রতি অনুযোগ, নিজের সামর্থ্য ও বিশ্বাসের প্রতি ক্ষোভ, আর জুলিয়ার প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা; নিজে হেরে যাওয়ার আত্মগ্লানিবোধ।

চাং স্বপনকে লিখেছে, "সত্যি, যতই দিন যাচ্ছে, য়ুরোপের অফুরাণ প্রাণ চাঞ্চল্যের পিছনকার এই অশ্রুসম্পুটই আমাকে আঘাত করেছে ক্রমশই বেশি করে। রঙ্গমঞ্চের পাদ-প্রদীপের ক্ষণিকের রংচঙে দীপালি উৎসব নয়— তার পেছনের স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার।"[১১৬] ইউরোপের মধ্যেই ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স যে এক নয় তার প্রসঙ্গ জানা যায়।[১১৭] দিলীপকুমার 'স্মৃতিচারণ'-এ জানিয়েছেন, তিনি প্রায় সাড়ে তিনবছর অজস্র লোকের সঙ্গে মেলামেশায় উল্লাস আর অফুরান্ত আনন্দ উপভোগ করে কাটিয়েছিলেন। সেই সময় সে অগুনতি গান গেয়েছে, বই পড়েছেন এবং ফরাসি ভাষা শিখেছেন। তাঁর ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে তার প্রিয় শহর ছিল লন্ডন। ইউরোপ সম্পর্কে সে বলেছেন, 'অভিধানের রয়েছে, কন্টিনেন্ট হল ইংল্যান্ড-বর্জিত য়ুরোপ। শব্দটির এ-ব্যঞ্জনা গড়ে উঠেছিল কবে বলতে পারি না, তবে কন্টিনেন্টে ভ্রাম্যমাণ হলে বোঝা যায় কেন কন্টিনেন্টের মধ্যে ইংল্যান্ড দ্বীপকে ধরা হয় না। ইংল্যান্ডে গড়ে উঠেছে এক দ্বীপাবদ্ধ (insular) মনোভাব।"[১১৮] "কিন্তু কন্টিনেন্টে— মানে ফ্রান্স, হল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইজারল্যান্ড ও হাঙ্গেরি— ঘুরে চল্লিশ বৎসর আগে এমন কথা আমার একবারও মনে হয়নি যে, ব্রিটানিয়া অদূর ভবিষ্যতে শুধু যে দ্বিতীয় শ্রেণির স্থলশক্তিতে

পরিণত হবেন অথবা সমুদ্ররাজ্ঞীর পদবিও খুইয়ে বসবেন নিয়তি-চক্রের আবর্তনে। য়ুরোপে বলতে সে-সময়ে আমাদের চোখে সব আগে ইংল্যান্ডের ছবিই ভেসে উঠত— অন্তত আমাদের দেশে।"[১১৯] "জার্মানরা ইংরাজদের মতন চাপা-প্রকৃতির জাত নয়, কথায় কথায় উজিয়ে উঠে grossarting, fablehaft, wunderbar, koloasal জাতীয় উচ্ছ্বসিত বিশেষণ ব্যবহার করে থাকে। ইংরেজি ভাষাকে বলা হয় a language of understatement— বেশি উচ্ছ্বাস আবেগের ভার সে সয় না। জার্মন ভাষায় মনপ্রাণের তরণী আবেগ-উচ্ছ্বাসের জোড়া পালে হু হু করে চলে, বিশেষ করে সামাজিকতার খরস্রোতে। একথা এত করে বলছি শুধু জানাতে যে, জার্মানিতে আমি সমাদর পেয়েছিলাম শুধু আমার কণ্ঠের প্রসাদে তাই নয়— স্বভাবে ওরা উচ্ছ্বাসী বলেও বটে।"[১২০]

দিলীপকুমারের এই উপন্যাসের মধ্যে আমরা ইউরোপে স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা ঠিক জানতে পারি। আবার বিলাতি মেয়ে সম্পর্কে দেশি মেয়ে সন্ধ্যার ধারণা পাই তার চিঠিতে। আমরা জানতে পারি, ইউরোপের দাম্পত্যের মধুর মিলনের মধ্যেই বিরহ ও বিষাদের সুর বর্তমান। ইউরোপ ও আমাদের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা সম্পর্কে 'জীবনের প্রতি বাঁকে দেখা মেলে অভাবনীয়ের— অপ্রত্যাশিতের— অঘটনের— বিশেষ করে এ প্রাণচঞ্চল গতি উচ্ছল য়ুরোপে— যারা আমাদের কামনা বাসনা আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা অনিচ্ছার ধারও ধারে না। শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে কোথাও যেন ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি অসন্তোষের সুর উদ্ভাসিত হয়েছে সারার মুখ থেকে— যা শেষ পর্যন্ত ভালেরের মত আর ধোপে টিকে নি। ভারতীয় আদর্শকেই লেখক শেষ পর্যন্ত বেশি প্রেফার করেছে। আর সারা যেন তারই প্রতীক।

তরঙ্গ রোধিবে কে? (১৯৩৮)

উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'এ-উপন্যাসটির মধ্যে মানুষের অন্তরের অসীম আকুতির সঙ্গে তার মন প্রাণের নানা তরঙ্গের চিরন্তন বিরোধের ছবি আমার অন্য উপন্যাসগুলির চেয়ে বেশি উজ্জ্বল ও গভীর হয়ে ফুটেছে।'

এই উপন্যাসটি শুরু হয় বিলেত প্রবাসী ভারতীয় মলয়ের ব্যক্তিগত চরিত্র রহস্য উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে। 'কেউ বলত ও মধুকর, কেউ বলত— প্রজাপতি, কেউ বলত— বিলেতে পড়াশুনো করতে এসে কাব্যরোমান্টিক হলেন আড্ডাধারী ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।'[১২১] তবে মলয়ের ব্যক্তিগত টান ছিল সুইডেনের প্রতি। লেখক বলেছেন, 'সুইডেনের প্রতি ওর টান ছিল শুধু আন্তরিক নয়— রোম্যান্টিকঃ শুভদৃষ্টির শিহরণ।'[১২২] মলয় তার ইংরেজ বন্ধু ম্যাকার্থির (যার সম্পর্কে হেলেনাকে মলয় বলেছে, "আমি ভারতবাসী, তিনি ইংরেজ— খাদ্য ও খাদক।) সঙ্গে বাল্টিক সমুদ্রে বেড়াতে গিয়ে সেখানে এক তরুণীর মাথার টুপি উদ্ধার করে দিয়ে হেলেনার সঙ্গে পরিচয়, তাদের বাড়ি যাওয়া ও পরে কিছুদিনের মধ্যে তাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি হয়। এমনকি হেলেনার বাবার অনুরোধে তাদের বাড়িতেই এরপর থেকে থাকতে শুরু করে। কারণ তার বাবার ভারতবর্ষ ও ভারতীয় দর্শনের ছাত্রের প্রতি খুবই আগ্রহ। হেলেনার কথা অনুযায়ী "ভারতবর্ষ থেকে আসছেন আপনি? চলুন চলুন। বাবা যে ভারতীয় দর্শনের অথৈ জলে সাঁতার কাটছেন আজ বিশ বছর।" মলয়ও স্বীকার করে সে "... বার্লিনে বছরখানেক ক্যান্ট হেগেল প্লেটোর লেকচার শুনেছি একথা হলফ করে বলতে পারি"।[১২৩] মলয় অবশ্য তাতে এককথায় রাজি হয়নি; এর পেছনে অবশ্য তার ভাষাজ্ঞান নিয়ে নিজেরই সন্দেহ ছিল। তাই সে বলে— "ইংরাজিতে বক্তৃতা দিতে পারি, ফরাসিতে উপদেশ, জর্মনে বড় জোড় দুটো বিশ্রাম্ভালাপের বেশি না।"[১২৪] সবমিলিয়ে সুইড মেয়ে হেলেনার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে তারই কথামত হোটেলে না ফিরে তাদের বাড়িতেই যায়। এমনকি মলয় হেলেনার আগে দ্বৈরূপ্য এত স্পষ্ট করে য়ুরোপে কোনো মেয়ের মধ্যে আগে দেখেনি কখনো।

এরপর হেলেনার মতোই তার অধ্যাপক বাবাকে মলয়ের ভালো লেগে যায়। একসঙ্গে প্রায়ই খাওয়া-দাওয়া, ভ্রমণ, পিকনিক ইত্যাদি চলতে থাকে। অধ্যাপকের মলয়ের কাছে সোয়েডেনবার্গ পড়া, মলয়ের সোয়েডেনবার্গ সিম্বোলিসম্ ভালোলাগা শুরু হয়। অন্যদিকে, মলয় এতদিন জানত "পুরুষ বেশি করে দেখায় ব্যাক্তিত্বকে, নারী— তার নারীত্বকে: এ-ই সে জানত মোটামুটি সত্য বলে। কিন্তু হেলেনাকে দেখে তার মনে হল শিক্ষায় নারীর যৌন সংস্কারও যেতে পারে বদলে। তার মনের প্রাণের স্বধর্মও হয়ত পারে— কে বলবে"। [১২৫] আর হেলেনার উভয় রূপই তাকে টানত। একজন টানত তার প্রাণকে, আর একজন টানত তার মনকে; হয়তো বা অন্তরকেও। মলয় যখন হেলেনার জগতে প্রবেশের অধিকার পেল ঠিক সেই সন্ধি লগ্নেই তার মনেও একটা গূঢ় তৃষ্ণা জেগে উঠেছিল। 'য়ুরোপের নিছক সুশীলতা বিলাস ও আতিথেয়তার সম্পদে ওর মন আর ভরছিল না। ওর চিত্তাকাশ চাইছিল একটা নতুন বর্ণরাগ।'[১২৬] পাশাপাশি হেলেনা তার প্রিয় কবিদের (জর্মন, ডেনিশ ও নরওয়োজিয়ান) কবিতা শোনাত ও বুঝিয়ে দিত, মলয় সে সবের অনুবাদ করে ওকে পাল্টা শোনাত— কারণ হেলেনার বড় ভালোলাগত বাংলা ভাষার ধ্বনি-ঝঙ্কার।

মলয় চার বছর আগে অফুরান্ত প্রাণশক্তি নিয়ে ইউরোপে এলেও আজ মনটা কেমন যেন উদাস উদাস— নোঙরহারা। দার্শনিক এক্লেক্টিক আমিয়েলের একটা কথা ওর মনের মধ্যে কেবলই ঘোরাফেরা করত— "Chacun ne comprend que ce quil retrouve en soi."[১২৭] য়ুরোপের প্রাণবত্তা ও তাই সে বুঝেছিল এত নিবিড় ভাবে, তীব্রভাবে— মর্মে মর্মে? তাই কি ও নিজের প্রাণ-সমুদ্রের রঙ-বেরঙের উচ্ছ্বাস আবেশ চঞ্চলতা প্রতিফলিত দেখত য়ুরোপের অগণ্য প্রাণ-বুদ্বুদে? মনে হত ওর— এই বুদ্বুদরাই শুধু সুখী, এরাই জানে জীবন-ঊর্মিলায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে চলতে। প্রতি নতুন মুখ ওর মনে জাগাত ঔসুক্য। প্রাণের আকাশে নিত্য লাগত রূপের আগুন কতরঙা যে তার শিখা! সময়ে সময়ে নিকষ কালোও ওর প্রাণের দোললীলায় আলো হয়ে উঠত—শুধু ঐ আলোর পানে চেয়ে চেয়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে যেমন উজ্জ্বল অপরাহ্ণও হার মানে ছায়ার কাছে। অতি সজাগ না থাকলে যা ধরতে পারা যায় না। এরপর ও এসমস্ত কিছুকে কাটিয়ে উঠতে নিজেকে দৃঢ় সংকল্প করত। এবার হেলেনা

জানায় তার মা-বাবার বিরুদ্ধতার সত্ত্বেও শুধু প্রাণশক্তির টানেই তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরে সন্তান জন্মানো, তাকে বড় করে তোলার আদর্শে মতপার্থক্য তীব্র প্রকট হয়। বিশেষত ভাই অস্কারকে নিয়ে। বাবার হার হলেও তা মেনে নিত কারণ তার মায়ের ক্ষয়রোগ শুরু হয়েছিল বলিষ্ঠ শরীরে। হেলেনাদের সঙ্গ লাভ করে প্রথম কিছুদিন তাতে সফল হলেও উদাসের সুর পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারে না। মলয় নোরার কথা প্রসঙ্গে হেলেনাকে বলে, "... তোমার দুটো দিক আছে স্বতোবিরোধী: একটা তোমার মা-র কাছ থেকে পাওয়া: চঞ্চল, অশান্ত। অন্যটা তোমার বাবার কাছ থেকে: শান্তি তার চোখের আলো, বুকের নিশ্বাস, আশার আকাশ তাই য়ুরোপের শুধু নব জন্মের বাণী, গতির বাণী, চঞ্চলতার বাণীই যে তোমার অভিজ্ঞান তা বলা চলে না। তুমি শুধু প্রাণশীলাই নও—স্বপ্নশীলাও।"[১২৮] হেলেনা অনেকটা ধরা গলায় বলে "তবে... সময়ে সময়ে তোমারো কি মনে হয় না মলয়— কেন বৃথা এ স্বপ্ন দেখা?" হেলেনা মলয়কে তাদের সুইসড কালচারের একাধিক কথা প্রসঙ্গ বলেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলেছে, "আমার দেহের চেয়ে আমার মনের বয়স অনেক বেশি— বলিনি তোমায়? "[১২৯] আরো বলে, "... য়ুরোপে বিশেষত সুইডেনে—আমারা, সবাই না হোক অনেকেই, বড় বেশি তীব্রভাবে বাঁচি। তাই আয়ুর অনুপাতে আমাদের অনুভবকে কষা চলে না।"[১৩০]

নোরা হল হেলেনার দিদিমার কাঠুরে প্রজার মেয়ে। কাঠুরে গাছ চাপা পড়ে হঠাৎ একদিন মারা যায়। নোরার বয়স তখন ১৪/১৫ বছর। অনাথা। হেলেনার মায়ের দয়া হওয়াতে তাকে আশ্রয় দেয় গৃহস্থলীর কাজকর্ম করার জন্য। এরপর কালক্রমে হেলেনার ভাই অস্কার ও নোরার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর সেই সম্পর্ক একদিন নির্জন কুঞ্জে হেলেনার চোখে ধরা পড়লে, হেলেনা বাবাকে বলে, বাবা তার মাকে বলে। এর জন্য হেলেনার মা হেলেনাকে তার বাবার অনুপস্থিতিতে প্রচণ্ড মারধোর ও বকুনি দেয়। বাবা ফিরলে নোরা সব কথা বলে,এতে হেলেনার বাবা তাঁর মাকে তীব্র মনোভাবের কথা জানায়। নিজের ওপর তলা "তোমাকে আর তোমার আদরের ছেলেকে ছেড়ে দিচ্ছি— নিচের তলায় থাকব আমরা।"[১৩১] এবং সেই সঙ্গে ঘরকন্নার সমস্ত দায়িত্ব নোরাকে দিয়ে দেয়। এরপর অস্কারের আস্ফালন দেখে হেলেনার বাবা বাধ্য হয়ে অস্কারকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে সঙ্গে তার মা এল্‌মা ও বেড়িয়ে যায়। এঘটনায়

নোরা কাঁদতে থাকে, পরে হেলেনার বাবা জানতে পারে নোরা অন্তঃসত্ত্বা। এ বিষয়ে জানার পর হেলেনার বাবা আবারও অস্কারের কাছে গিয়ে নোরাকে বিবাহ করার দাবি জানায়। শুধু তাই নয় জোর করে অস্কারকে টেনে বাড়িতে আনেন, পরের দিন এল তার মাও। এরপর তাদের স্টকহল্‌মে এক নর্তকী এলে অস্কার বাবার সিন্ধুক ভেঙ্গে পঁচিশ হাজার ক্রোন ও সেই নর্তকীকে নিয়ে উধাও হয়। ছেলে লম্পট, চোর তার ওপর ফেরার। এতে মা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে শয্যা থেকে আর উঠেনি। তার তিনমাসের মধ্যেই সবকিছু শেষ হয়ে যায়। এদিকে নোরা এক মৃত্যু সন্তান প্রসব করে। অন্যদিকে, দু-বছর পরে বাড়িতে খবর আসে বার্গেনে একটি বাড়িতে আগুন লাগে। সেই জ্বলন্ত গৃহ থেকে একটি ছোট শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে, অস্কারের সমস্ত দেহ মুখ পড়ে যায়। বাঁচার আশা না থাকলেও বেঁচে দৈবক্রমে বেঁচে যায়। শেষ পর্যন্ত অস্কার কাতর মিনতি করে তার বোনের কাছে চিঠিতে জানিয়েছে, তাদের চোখ দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে ও নোরাকে একটি বিবাহ দেবার কথা বলেছে।

দীর্ঘ মন খারাপে থেমে থেমে কথাবার্তায় হেলেনা মলয়ের সঙ্গে চলতে চলতে ইবসেনের নাটক দেখতে যাওয়ার কথা বললে, 'লোকে বলে ইবসেনের ছিলেন তিনি তেমনই বিশেষজ্ঞ যেমন গ্যারিক— শেক্ষপীয়রের। আর ইবসেনের নাটক— যিনি য়ুরোপে আনেন নাটকের এক নব যুগ!' [১৩২] তারপর তারা ঠিক করে নাটক দেখার পর রক্সেন হ্রদে পাড়ি দেবে দুজনে এবং নৌকাবিহারে সারারাত কাটাবে খোলা আকাশের নিচে। অবশ্য এ নিয়ে মান-অভিমান ও মন কষাকষিও চলে কিছুক্ষণ। নাটক দেখে দু-জনই দারুণ খুশই হয়– খুশির প্রকাশেও দুজনে মান-অভিমান করে। এরপর রক্সেন হ্রদে যাওয়ার সময় রাস্তার ধারে কফিবরফ খেতে খেতে মলয় শুনতে পায় সে সে দেশের দেশাত্মবোধক গান। সে দেশের ক্যাফের আদব-কায়দা সংস্কৃতি ইত্যাদি। হেলেনার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে মলয়ের অনুভব "হেলেনা, যখন দেখি নিজেকেই কত কম চিনি তখন যাকে ভালোবাসি তাকে চিনি বলে ভরসা পেতেও যে বাধে।"[১৩৩] এবার মলয় য়ুমার সম্পর্কে– যে অস্কারের প্রেমিকা, একসময় তার সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল বলতে থাকে। সঙ্গে নিজের সম্বন্ধে বলতে থাকে। "তোমাকে বলেছি আমি ধনী পিতার একমাত্র বিলাসী পুত্র। একথাও বলেছি যে আজন্ম সবাইকার আদরে ও প্রশ্রয়ে মানুষ আমি। এ ও আশা করি

অকপটেই স্বীকার করেছি যে, এযাবৎ জীবন সম্বন্ধে কোনো গুরুতর দায়িত্ব জ্ঞানই আমার ছিল না?"[১৩৪] "য়ুরোপে আমি এসেছিলাম ঠিক কী চেয়ে—মাঝে সাঝে ভাবি। দেশ দেখতে? বেরাতে! পড়াশুনো করতে? না তো।"[১৩৫] 'অক্সফোর্ডে ভর্তি হয়ে প্রথম তিনমাস যা কষ্ট পেয়েছিলাম বোধকরি নোপোলিয়ান সেন্ট হেলেনায় তেমন কষ্ট পাননি।' "তবে একটা তাগিদ ছিল আমার আন্তরিক; বিদেশী বিদেশিনীকে কাছ থেকে দেখা— তথা জানা। না, এ ও ঠিক বর্ণনা হোল না— বিদেশী বিদেশিনীকে শুধু জানাও নয়— চেনা, কাছে পাওয়া। ... তথ্যগত জ্ঞানের চেয়ে রসের ঘনিষ্টতাই চিরদিন আমার কাছে কাম্য হয়ে এসেছে।"[১৩৬] আর এই সূত্র থেকে এসেছে তার বন্ধু ম্যাকার্থির কথা। যে তাকে বিদেশি ভাষা শিক্ষা, দর্শন পড়তে আগ্রহী করেছিল। কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল দর্শনের জন্য নয়, 'সাহিত্যে'। কারণ সে ছিল কবি ও ঔপন্যাসিক। উপন্যাস লিখতে শেখায় সেই। তারই উৎসাহে মলয় আবিষ্কার করে 'মিথ্যে গল্প লেখায় সত্য আমোদ আছে।'[১৩৭] সে য়ুরোপের শিল্পী, শিল্প, দর্শন, সাহিত্য সম্পর্কে আস্তে আস্তে একটা সম্যক ধারণা তৈরি করার চেষ্টা বন্ধু ম্যাক ও হেলেনার বাবার কথা অনুযায়ী ম্যাক বলত; "...মলয়, য়ুরোপে আর যার সঙ্গেই মেশো এই সব কবি শিল্পীর সঙ্গে মিশোনা, মিশোনা, মিশোনা। তাদের দান ফুরিয়ে গেছে। ..."[১৩৮] এইসব কথা বলাবলি করতে হেলেনার বাবার ফোন আসে— পরের দিন নোরাকে নিয়ে ট্রেনে রওনা হওয়ার কথা জানায়। কারণ বাবা প্রফেসর অস্কারকে কালমারে নিয়ে যেতে চায়। এরপর প্রফেসরের কথামত মলয়ও রওনা হয়। প্লেন যাত্রাতে তীব্র গা গোলানি যন্ত্রণা অনুভব করে ট্রেনের যাত্রার কথা মনে পরে। বৃদ্ধ মলয় তাঁর স্ত্রীর ভালোবাসার সম্পর্কে বলেন "গেটে বলতেন কাউকে যদি জানতে চাও তুমি তার কাছে যাও, তাকে কাছে টানতে যেয়ো না।"[১৩৯] "য়ুরোপে আমরা- দার্শনিকরা- এমনিই অন্ধ। কথার বাণিজ্য করি- পাই প্রশংসার রাজকর- অমনি ভাবি আমরাই তো বিশ্বপতি- বুদ্ধিগড়া তাসের প্রাসাদে অটল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় মানী মানুষ।"[১৪০] "তাই হয়তো এল্‌মার সঙ্গে বাধত আমার নিত্য সংঘাত। তাকে আমি এল্‌মা ভাবে তো চাইনি: চেয়েছিলাম এরিক-শিষ্যা ভাবে। মানুষ যেখানে সত্যি ভালোবাসে সেখানে সে প্রেমাস্পদের সত্তাকে নিজের মনের মতন করে গড়ে নিতে চায় না, চায়— তার আত্মবিকাশ হোক তারই নিজের পথে। ..."[১৪১]

"এ আমি আভাসে জানতাম। জানতাম যে শ্রদ্ধাই প্রেমের ভিত্তি। কিন্তু ঐ যে বললাম— এসবই জানতাম কথার পথে—উপলব্ধির অঙ্গীকারে নয়। তাই এ-সত্যের স্বীকারে আমার তত্ত্ব লাভ হয় নি, হয়েছিল বড় জোড় তথ্য-পরিচয়।"[১৪২] এরপর একে একে নিজের ভূল ত্রুটির কথা— ছেলে অস্কারের কথা, মেয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কথা নিজের আদর্শ অহমিকার কথা, সেখানে হেরে যাওয়ার কথা বলেছে মলয়কে। তার কথা—"আলো-ভ্রমে বরণ করেছিলাম মরীচিকাকে, সত্য-ভ্রমে— অহমিকার প্ররোচনাকে।"[১৪৩] "তার পর এল— যা আসবার— ভূমিকম্প। তখন বুঝলাম বটে— কিন্তু বড় বেশি বিলম্বে।" "অবশ্য দোষটা একা আমারই ছিল না। এল্‌মাও ঠিক এই ভুলই করেছিল— আমাকে সে-ও চাইত তার মনের মতনটি করে গড়ে নিতে— কাটছাঁট করে। তাই নিরন্তরই চলত একটা শ্রীহীন হানাহানি — তাতে চমক থাকলেও তৃপ্তি থাকত না।" [১৪৪] এইসব কথা বলতে বলতে অস্কার ঘরে ঢুকলে হঠাৎ-ই অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

প্রফেসরের জ্ঞান ফিরে এলে ডাক্তার খুব সাবধানে থাকতে বলে, বিশেষ করে দরকার শান্তি ও শুশ্রূষা। আর এই সূত্রে মলয়ের সঙ্গে অস্কারের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেতে থাকে— অস্কার ওর ভাইয়ের মতন পারিবারিক সমস্যা নিয়ে পরামর্শ করেছে। মলয় প্রফেসরের সঙ্গে থাকতে থাকতে তার মাঝে মধ্যে হেলেনার জন্য মন কেমন করে উঠত। অস্কারেরও মন খুব উতলা হয় হেলেনাকে দেখবার জন্যে। কিন্তু প্রফেসর সেরেও সারলেন না। এরপরেও প্রফেসরকে বা হেলেনাকে বা নোরাকে যতটা আত্মীয় মনে হত ততটা অস্কারকে মনে হত না মলয়ের। এবার মলয় আস্তে আস্তে অস্কারের জীবনযাত্রা চলাফেরা লক্ষ করতে লাগলেন। একসময় থিয়েটার থেকে মলয় তার পিছু নিলে অস্কারের বান্ধবী সে দেশের আইনের কথা, সাবধানতার কথা বলে। আর মলয়ও মেয়েটিকে জানায় "এভাবে ভয় দেখিয়ে ওকে কোথাও নিয়ে যেতে দেব না আমি।"[১৪৫] পরে পুলিশ ডাকতে চাইলে মেয়েটি চলে যায়। মেয়েটি মলয়ের ধমকে চলে যাওয়ার পর অস্কার শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে— দু-হাতে মুখ ঢেকে। এরপরে অস্কার ছেলে মানুষের মতন চেচিয়ে বলে:

"আমি— আমি যাব না মলয়—ম'রে গেলেও যাব না।"

— "কোথায়?"

— "ও চায় আমাকে দেশছাড়া করতে—যাকে ভালোবাসি না তার সঙ্গে থাকতে হবে আমাকে!"[১৪৬]

পিতার বর্তমান অবস্থার জন্য অস্কারের এই ঘটনাই যে দায়ী তা মলয়কে জানায়। মেয়েটিকে নিয়ে তার প্রচণ্ড ভয় হলে মলয় তাকে সাহস জোগাতে থাকে- এবং একসঙ্গে বিছানায় থাকে। এরপর অস্কার তার জীবনের কথা—দুর্বিষহ ঘটনার কথা মলয়কে বলতে থাকে। নোরাকে বিবাহ করার কথা— বাবার শাসনে নোরাকে বিবাহ না করার জেদ, পরে সেই বাবারই আলমারি ভেঙ্গে টাকা চুরি করে নর্তকী য়ুমাকে নিয়ে ইংল্যন্ড, ফ্রান্স, জর্মানি, পোল্যান্ড, রাশিয়া, চিন শেষে জাপান হয়ে নিউইয়ার্কে পৌঁছানোর কথা বলে। সেখানেই সে আবিষ্কার করে য়ুমা তাকে ভালোবাসেনি— ও শুধু চোখের মোহ। তারপরেও য়ুমার ভালোবাসা পেতেই সে বীরত্বের নানা কাজকর্ম করতে চেষ্টা করে। এই উপলক্ষে সে গুপ্তদলে নাম লেখায়— সহয়তায় রুমা নামের একটি মেয়ে। আর তাকেই সে ভয় পাচ্ছিল, তারই সঙ্গে আজ তার দেখা হয় এবং সেই তাকে নিতে এসেছিল। রুমার সম্পর্কে মলয়কে বলেছে— 'এরা হল সেই জাতীয় মেয়ে বাস্তবের একঘেয়ে জীবন যাদের ভালো লাগে না। এরা চায় নিত্য নূতন চমক, নেশা উত্তেজনা, পথ এদেরকে ডাকে বলেই এরা ছুটতে রাজি—বিনা পাথেয় বিনা কোনো লক্ষ্যে।'[১৪৭] এই রুমা অস্কারকে ভালোবেসেছিল, সর্বগ্রাসী সে ভালোবাসা। "কিন্তু এমনই জীবনের পরিহাস মলয়, যে ওকে আমি ভালোবাসতে গিয়েও পারলাম না। য়ুমা বাদ সাধল।" [১৪৮] সেই য়ুমা এখন তার প্রতি উদাসীন। "কিন্তু আমার প্রতি ও যতই উদাসীন হয়ে আসে ওর জন্যে আমি ততই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি। কী করে ওর মন পাব, ওর প্রশংসা পাব, ওকে ফিরে পাব ক্রমে এই-ই-হয়ে উঠল যেন আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।"[১৪৯] কিন্তু শেষটায় "য়ুমাকে যে আমি ভালোবাসি রুমা টের পেতেই ও হয়ে উঠল ক্ষিপ্ত প্রায়। আমাকে আগে যদি বা চেয়েছিল ওর রক্ষক হিসেবে এখন চাইল আমি হই ওর পরিচায়ক— নফর। জ্বলে উঠল অসহ্য জ্বালায়— ডাকল আমাকে ওর দেহের দিকে।" [১৫০] ফলে সে যাকে চাইত তাকে পেত না, আর তাকে সে চাইত তার কাছে যেত না— এহেন চরম সমস্যায় – উন্মাদনার সান্ত্বনায় আবারও মদ ধরে। পরে তার আবারও নানা স্বৈরিনী মোহিনী আসে। কিন্তু তারাও তার রূপে, যৌবনে, প্রাণশক্তিতে ছুটে আসে পতঙ্গের মতন— তাদের অনেকে পুরে মরলেও সেই শুধু পুড়ে মরেনি— এই যা। ফলে মলয়ের কাছে সে বলেছে— "দারুণ বিস্বাদ গ্লানিকর জীবন, মলয়। অথচ আমি সত্যিই এসব চাইনি। আমার এক কামনা ছিল য়ুমাকে ফিরে পাবার। এই কামনাই আমার সমস্ত জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।..."[১৫১] অন্যদিকে, রুমাও অস্কারকে পাওয়ার জন্য অস্কারের মন আকর্ষণ করার জন্য

ক্রাস্টাকিনকে কাছে ডাকল, তাকে খেলাতে লাগল— এই ক্রাস্টাকিনকে একদিন রুমার বিছানায় দেখে কাঁধে ছুরি দিয়ে আঘাত করে, যদিও লক্ষ্য ছিল বুকে। এরপর লন্ডন থেকে নরওয়ে। 'জীবনে তখন গভীর অবসাদ। শরীরও অসুস্থ মন জর্জর — আশা নেই চোখে। সুবিধা হল একটা ঘর পুড়েছিল। শুনলাম একটা শিশুর কান্না, যখন নিচে তার মা চিৎকার করছে বাঁচাও ওকে— বাঁচাও ওকে। "নক্ষত্রবেগে ঢুকলাম। শিশুকে জানলা থেকে ফেলে দিলাম—নিচের লোকেরা কম্বল ধরল, তার ওপর পড়ল। বেঁচে গেল— কিন্তু আমি নামতে গিয়ে বেটক্করে পড়ে গেলাম। দুর্বল শরীর, নইলে হয়ত পড়তাম না— এভাবে পুড়েও যেতাম না।" [১৫২]

রুমা অস্কারের কাছে এসে মলয়কে দেখতে পেয়ে প্রথমে ইতস্তত বোধ করলেও অস্কার যখন তার পরিচয়, হেলেনার স্বামী আর তাদের জীবনের সমস্ত ঘটনার কথা বলেছেন তখন স্বাভাবিকভাবে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে মলয় বলে আন্দামান-বার্লিন ও প্যারিসে ভারতীয় বিপ্লবীদের আড্ডাসহ একাধিক প্রসঙ্গ। মলয় হেলেনাকে সেই রাত্রে কুড়ি মিনিটের জন্য ফোন করতে গেলে রুমা চলে যায়। টেবিলে লিখে জানায় অস্কারকে সুখী করতে পারবে না কারণ, অস্কার এখনও য়ুমাকে মনে প্রাণে ভালোবাসে। একসময় অস্কারকে নিয়ে সে স্বপ্ন দেখলেও, ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও এখন তার সন্দেহ হয় যে পেলেও রাখতে পারতেন কিনা? আর য়ুমা চলে গেলে মলয় ক্ষণিকের অতিথি রুমার সম্পর্কে ভাবতে থাকে। এমনকি সকলে রুমার ভিক্টোরিয়া হোটেলে পর্যন্ত যায়। হোটেলে গেলে ম্যানেজার তার নামের চিঠি হাতে দেয়। চিঠি খুলতেই দেখে "মলয়! বিদায়। পুলিসকে বোলো আমি আত্মহত্যা করেছি। আর অস্কারকে বোলো যেন ডোডোকে দেখে — আমি যা-ই হই সে তো কোনো দোষ করেনি।"

ইতি

তোমার পথের পরিচিতা রুমা"[১৫৩]

এবার ডোডোর প্রসঙ্গ আসে। সে রুমা ও অস্কারের একবছরের সন্তান। এখন ওয়ারস-এ থাকে, প্যারিসে। এদিকে হেলেনা ও য়ুমা এসে বাবার সেবা শুশ্রূষা করতে থাকে। পরে ডোডোর কথায় জানাজানি হলে নোরা হেলেনাকে বলে তুমি অস্কারকে রাজি করাতে পারলে নোরাই ডোডোকে মানুষ করবে বলে জানায়। সঙ্গে চলতে থাকে মলয় ও হেলেনার দীর্ঘ কথাবার্তা।

মলয় হেলেনার সঙ্গে নর্তকী য়ুমার সম্পর্কে একাধিক আলোচনা চলতে থাকে। বাবা তার গায়ক বন্ধুর কাছে শ্যাম্পেন খেয়ে আনন্দ পায়, পরে য়ুমা, রুমাকে ও অস্কারকে নিয়ে নানা দুর্ভাবনায় মূর্চ্ছা যাওয়া পরে জ্ঞান ফিরে শরীর অবসন্ন হলেও মনের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। য়ুমার মা গাইশা ছিলেন। তাই মেয়ে য়ুমাকে বিলাসিনী করে গড়ে তুলতে 'একাধারে গ্রীক স্বৈরিণী ও হিন্দু পরকীয়ার গন্ধ বিলোতে।' [১৫৪] গায়ে মেখেছিল প্রসঙ্গক্রমে মলয় হেলেনার কাছে ইউরোপীয় শ্লীলতার কথা ও জাপানি শ্লীলতার কথা ও তার প্রভেদের কথা বলেছেন। 'ম্যাক ঠিকই বলত —জাপানিদের ভদ্রতার পাশে য়ুরোপীয়দের ভদ্রতা কেমন? –না, যেমন ময়ুরের পাশে পায়রা, য়ুমাও প্রায়ই হেসে বলত যে এদেশে এসে তার প্রথম বিশ্বাস হয় যে, দুঃশীল সভ্যতা বলেও একটা জিনিষ এজগতে থাকতে পারে সত্যিই।'[১৫৫]

জাপানি য়ুমার সঙ্গে ভারতীয় মলয়ের য়ুরোপে মেশার পার্থক্য বুঝতে পেরেছে। সে বলেছে, "আমারা য়ুরোপে এসে সাধ্যমত চেষ্টা করি য়ুরোপের তরঙ্গে মিশত: য়ুমা থাকত পৃথক, আর শুধু য়ুমা না, শতকরা নিরানব্বই জন জাপানিই দেখবে এখানে এসে ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি নীতি মেনে হান্ড্রেড পার্সেন্ট জাপানি থেকেই ঘরে ফেরে।"[১৫৬] য়ুমার মনে করে— য়ুরোপের নাচ কি আবার নাচ? নাচ— ও বলত, আছে শুধু তিনটে জায়গায়: রাশিয়ায়, জাপানে ও জাভায়। য়ুমাকে নিয়ে মলয়ের একের পর এক কথা প্রসঙ্গ হেলেনার কাছে বলেই যায়। য়ুমাকে একসময় "মনে হতে লাগল— একটু একটু করে— য়ুমা ও আমার সম্বন্ধ দুদিন আগেও কী সুন্দর— নির্মলাই না ছিল! কী সুন্দরী সখীই না ও ছিল আমার জীবনে!" বলে একটু থেমে "একেই বলছিলাম স্পর্শোন্মুখ প্রেম হেলেনা— এ জীবনে ভরসা দেয়, তৃষ্ণা মেটায় না— ঘূর্ণীই আনে, বন্দর দেখায় না।"[১৫৭] রাত কেটে গেলে নোরার মলয় ও হেলেনার কাছে আগমন। মলয়

আবার ইউরোপীয় জগতে নারীর শ্রদ্ধার প্রসঙ্গে বলেছে, “তা তো বটেই হেলেনা। আর আমিও তো ঐ কথাই বলছিলাম যে, য়ুরোপের যত দোষত্রুটিই থাকুক না কেন , নারীর প্রতি নির্ভেজাল শ্রদ্ধা যদি আধুনিক জগতে কোনো জাত প্রবর্তন করে থাকে তবে সে য়ুরোপ— আর মধ্যযুগের য়ুরোপ নয়, আধুনিক য়ুরোপ— বৈশ্য সভ্যতার পুরোহিত য়ুরোপ, যান্ত্রিকতার য়ুরোপ, বৈজ্ঞানিক য়ুরোপ। আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে বৈশ্য য়ুরোপ জগতের অশেষ অকল্যাণ করেও যে টিঁকে আছে সে হয় তো তার এই পুণ্যফলে।”[১৫৮] এরপর হেলেনার সঙ্গেও য়ুমার কথাবার্তা চলতে থাকে। এই য়ুমা কি করে য়ুমা হয়ে উঠল তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা চলতে থাকে।

মলয় ও য়ুমা নৌকায় বেড়িয়ে পরে। য়ুমা হাল ধরে আর মলয় নৌকার দাঁড়। সেখানে একটা মস্ত মোটর বোর্টের (পিকনিকের) সঙ্গে ধাক্কা লাগে। তাতে নৌকাটি উলটে যায়। যদিও তারা ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যায়। এপ্রসঙ্গে জানতে পারি, য়ুমার দুই ভাইও জলে ডুবে মারা গিয়েছিল। য়ুমা বিদেশি সাঁতার জানা না থাকলেও জল খেয়েও কোনোরকম উৎকণ্ঠা ভয় নেই বরং ছিল মনের দৃঢ়তা। যার জোরে নিজেই আগে গিয়ে মোটর বোটের কেবিনে উঠে পরে। মলয়ের মনে হয়েছে তার বন্ধু ম্যাকই মর্ডান মানুষের অগ্রদূত। তিনি বলেছেন— ‘মর্ডান মানুষের অগ্রদূত ছিলেন য়ুরোপে তিনিই — একাধারে কত বড় দার্শনিক, কবি, ধ্যানী, মনীষী — এ শিল্পসর্বস্ব যুগে ওঁকে নতুন করে না চিনলে আমাদের নিস্তার নেই—; ’[১৫৯]

মলয় বুঝতে পারে য়ুমা তাদের দুজনকে খেলাচ্ছে। য়ুমাও স্বীকার করে তার পণের কথা— নানা ইউরোপীয় পুরুষকে দুঃখ দেবার কথা। ‘জগৎজোড়া নিগৃহীত নারী জাতির প্রতিনিধি হিসেবে আমি নিজেকে কল্পনা করলাম। ঠিক করলাম আমার জীবনের ভূমিকা হবে মোহিনীর। তাই তো মার মৃত্যুর পরে হাতে অগাত টাকা সত্ত্বেও গাইশা জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে আরও ডুবলাম বেশি করে। প্রথমে দু’জন যুবক আমার নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে হাত পাতে আমার যৌবনের কাছে। তাদের দুজনেই অশেষ দুঃখ পেয়ে দেশত্যাগী হয়, তৃতীয় যুবকটি করে আত্মহত্যা। চতুর্থটি হয়ে যায় পাগল’।”[১৬০] এমনসময় ম্যাক সেখানে এসে মলয়কে জানায় সে এই নাগিনীকে (য়ুমাকে) চার বছর আগে বিয়ে করেছিল। ম্যাক পৌরুষকণ্ঠে আরও বলে, “ভেবেছ আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে নিরালয় বসে প্রেম করবে ওর সঙ্গে? তা

করতে দেব না জেনো।” ম্যাক আরিশকে য়ুমা শুধু তাকে সেই দেশাত্মক শ্লেষাত্মক সুরে আঘাত করে। য়ুমা জাপানি মেয়ে। য়ুমার চিঠি মলয় খুব শন্তপণে পড়তে শুরু করে। চিঠির মারফৎ জানতে পারে ম্যাককে য়ুমার সাবধান করার কথা। “...যদি থাকো এখানে, হয়ত আমার আচরণের জন্যে আমি দায়িক থাকব না। মলয় থাকে আমার পাশের ঘরে —আমার কাছে আছে ছ’নলা পিস্তল। আর মিথ্যা ভয় আমি দেখাই না তুমি জানো।”[১৬১] তারপর ম্যাকের ঈর্ষান্বিত চরিত্র ও দিকবিদিক জ্ঞান শূন্যতার কথা মলয়কে জানায় য়ুমা। য়ুমা আরও জানায় ম্যাক প্রথমে জাপানে বেড়াতে এসেছিল, পরে ভালো লেগে যাওয়ায় সেখানে দশ বৎসর ছিল। অন্য দু-একটি মেয়ের সঙ্গে একটু আধটু সম্পর্ক হলেও গাইশা নর্তকী য়ুমার প্রতি ঘনিষ্ঠতায় বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল। আকৃষ্ট হলে য়ুমা এক জাপানি ছেলেকে নকল প্রেমিকের আসনে বসালে ম্যাক তার কাঁধে গুলি করে জেলে যায়। জেল থেকে বেড়িয়ে আবারও য়ুমা ঘরে নিয়ে যায়। একসময় কঠিন রোগে ম্যাকের যমে মানুষে টানাটানি হয়, এতে য়ুমাও ভালোবাসার আসক্তিতে সেবা যত্ন করতে শুরু করল। এরপর ম্যাক সুস্থ হলে ম্যাক ভালোবাসল আর একজনকে। ছমাস পরে আর একজনকে। এক বৎসর পরে আর একজনকে। প্রতি দেহের মোহে উবে যেতে না যেতে ছোবড়ার মতন একের পর এক দিত তাদের দূরে ফেলে।

শেষ পর্যন্ত অনেক দ্বন্দ্ব বাধা বিপত্তির পরে হেলেনা মলয়কে বলে তার মুক্তি দিতে — কারণ .... বিবাহের বন্ধনের জন্যে সে তৈরি নও। এই সময়ে য়ুমার চিঠি এসে পৌঁছায়। তাতে সে লিখেছে, “মলয়, কাউন্টেস তোমার কথা টেলিগ্রামে সবই জানিয়েছেন। তোমার পথের কাঁটা হয়ে এসেছিলাম সরে যেতে চাই— সত্যিই, বিশ্বাস কোরো। কেবল একবার তোমাকে দেখতে চাই বিদায় নেওয়ার আগে। ...”[১৬২] য়ুমা আজ এও জানতে পেরেছে অস্কারের বোনকে মলয় এখন ভালোবাসে। আর ওদিকে অস্কারের সঙ্গে য়ুমার বিয়ের কথা শুনে ম্যাক আধা-উন্মাদ অবস্থা। ম্যাক তাকে মিনতি করেছে তাকে নইলে ও বাঁচবে না। এমন সময় য়ুমার ঘরে ঢুকল অস্কার, যেখানে আগে থেকেই ম্যাক ছিলই। “সে ম্যাককে দেখেই ভ্রুকুটি করল। বলল সে শুনেছে ম্যাক না কি আমাকে উত্যক্ত করেছে। ম্যাকের চোখ দুটো উঠল জ্বলে। বলল ‘তোমাকে আমি চিনি অস্কার— এই মুহূর্তে যাও বেরিয়ে’।[১৬৩] তৎক্ষণাৎ অস্কার পকেট থেকে রিভলভার

বের করল। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর একটা ছুরি ছিল সেটা নিয়ে ম্যাক লাফিয়ে পড়ল ... অস্কারের কাঁধে ছুরি বিঁধে যায়। পিস্তল আওয়াজ হয়ে গেল — কিন্তু যন্ত্রণারই হোক বা যে জন্যই হোক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গুলি এসে আমার পাঁজরা ভেদ করল। পুলিশ ম্যাককে ধরে নিয় গেছে। অস্কার হাসপাতালেই। আমি হোটেলেই। এখনো কি বলতে হবে কেন দেখতে চাই তোমাকে? যদি আসো হয়তো এখনও বাঁচতে পারি — নইলে কী হবে বলো বেঁচে ? তুমি ছাড়া এমন কে আছে যার জন্য এ পৃথিবী আমার কাছে কাম্য হতে পারে? ... ”[১৬৪]

একটু পরে বৃদ্ধ প্রফেসর জানায়-

“অস্কারের হাসপাতাল থেকেও টেলিগ্রাম এসেছে মা।”

—“কী বাবা?”

—“আর নেই সে।”

কাউন্টেস যুমার আর একটি টেলিগ্রাম সকলকে দেখাতে আনে, যদিও সেটা তার হাত থেকে পড়ে যায়। টেলিগ্রামে লেখা —

‘ম্যাকার্থি আত্মহত্যা করেছেন— হাজতে।’

আর হেলেনা মলয়ের দিকে তাকায় — মলয় ওর দৃষ্টি এড়িয়ে তাকায় সামনের সমুদ্রকে।

দিগন্ত নীল জল ...

ঢেউ ... ঢেউ... ঢেউ

যদিও খানিক আগের যে বাতাসে ঢেউ উঠেছিল সে পড়ে গেছে ...

তবু ঢেউ চলছে ... ।[১৬৫]

দিলীপকুমার রায় **১৯১৯** সালে বিলেতে পৌঁছান ও তার পর তিনি সেখানে পড়াশুনা ও সঙ্গীত চর্চ্চার সুবাদে প্রায় সাড়ে তিন বছর ইউরোপের বিভিন্ন স্থান ঘুরে **১৯২২**-এর শেষের দিকে দেশে ফেরেন। ইউরোপে গিয়ে তাঁর প্রথমে বিস্ময় আনন্দে মন ভরে যায়। তিনি ইউরোপের যে বিশাল রূপটি তিনি প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন, তাতে ইউরোপের বাণী ছিল— ইহলৌকিকতা, কর্মের প্রতি আসক্তি ও উৎসাহে অনুরাগ। ইউরোপ যেন তাঁর কাছে একসময় ‘জীবন্ত সত্য’

হয়ে উঠেছিল। সে জানিয়েছেন, "নানা জায়গায় বক্তৃতা ও গান করে বিদেশিদের মনে কতখানি জ্ঞান বিতরণ করেছিলাম বলতে পারিনে, কিন্তু একথা বলতে পারি যে, নিজে অনেক সম্পদ আহরণ করেছিলাম তাদের প্রীতির আলোয় তথা দরদের রসধারায়। আমার প্রবাস-জীবনের এই শেষ অধ্যায়ে য়ুরোপ আমার কাছে আর ভৌগোলিক তথ্য রইল না, হয়ে উঠল জীবন্ত সত্য।"[১৬৬]

তিনি বলেন, "য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি, শ্রেষ্ঠ বাণী, শ্রেষ্ঠ ভোগ, শ্রেষ্ঠ সঙ্গ সবই আমার ভাগ্যে লাভ হয়েছিল। আমি স্বভাবে অকৃতজ্ঞ নই, তাই সানন্দেই স্বীকার করব যে, য়ুরোপের কাছ থেকে অনেককিছুই পেয়েছিলাম যা আমার অন্তর্জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু তবু বলব যে, য়ুরোপের আবহে আমি একটু একটু করে অতিষ্ঠই হয়ে উঠেছিলাম। য়ুরোপে আমার মনে উচ্চাশা জাগিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, আমার প্রাণশক্তিকেও উদ্দীপিত করেছিল— য়ুরোপের কাব্যে, সংগীতে, উপন্যাসে, গল্পে, প্রবন্ধে, আমোদ-প্রমোদের অফুরন্ত বৈচিত্র্যে— কিন্তু কোনও কিছুতেই আমি স্থায়ী তৃপ্তি পাইনি, প্রতি চমকের পরেই এসেছে বিষাদের প্রতিক্রিয়া, ..."[১৬৭] দিলীপকুমার রায়ের লিখিত প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে, প্রধান চরিত্র বা চরিত্রগুলির ভাবনার মধ্যে সেই ভাবনা যেন সমানভাবে বিদ্যমান হয়েছে। 'মনের পরশ' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র পল্লব যেন সেই লেখকেরই মানস পুত্র। সে ইউরোপে গেছে ব্যরিস্টারি পড়তে কিন্তু সেখানে গিয়ে একাধিক বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পরে একের পর এক নিজের বিষয় বার-বার পরিবর্তন করেছে ও শেষে সঙ্গীত চর্চায় মনোনিবেশ করেছে এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে বিলাতি ডিগ্রি না নিয়ে দেশে ফেরে। শেষ পর্যন্ত পল্লবের মনে হয়েছে সঙ্গীতের মুক্তি মধ্যেই মানব মুক্তি হতে পারে। 'দুধারা' উপন্যাসে ভারতীয় নিলয় দীর্ঘদিন একাধিক দেশি ও বিদেশি বন্ধুদের সঙ্গে বিভিন্ন খোলামেলা ভাবে আলোচনার পর তার উপলব্ধি হয়, ভালোবাসা-সতীত্ব-প্রেম-বিবাহ-ইত্যাদি সমস্ত কিছু বাঁধনে বিশ্বাস করে না, করে মুক্তিতে। আবার 'বহুবল্লভ' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র প্রদীপের অন্তরের মধ্যে চলতে থাকে দীর্ঘ সংশয়। আর এই সংশয়ের ফলে তার মধ্যে একমুখী প্রেম কখনও দানা বাঁধতে পারে নি। তাই সে একবার ডায়নার প্রতি, আর একবার শ্রীলার প্রতি ঝুঁকেছে; আর শেষ পর্যন্ত সে কাউকেও পায়নি। ঠিক একই রকম অবস্থা

দেখি, ‘দোলা’ উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র স্বপনের। সে একবার স্ত্রীকে কাছে পেতে চায়, আবার পরে প্রেমিকা আনাকে পেতে চায় আবার কখনও বা তার থেকে পালিয়ে নিজের আত্মরক্ষা করতে চায়। ‘তরঙ্গ রোধিবে কে?’ উপন্যাসে বিদেশি হেলেনার অধ্যাপক বাবার ভারতীয় দর্শনের প্রতি আস্থা লক্ষ্য করা যায়। আবার এই উপন্যাসের মলয় এমন একজন চরিত্র যিনি ইউরোপের কর্ম্মমুখীনতা, প্রাণচাঞ্চল্যতা, গতিময়তা, নারীর যৌন সংস্কার, স্ত্রী- শ্রদ্ধা ও স্বাধীনতা, অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেও ইউরোপীয় সভ্যতার আতিশয্যকে, ভোগবাদকে তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি। সেকারণে তার চার বছর পূর্বে যে অফুরান্ত প্রাণশক্তি নিয়ে ইউরোপে সে এসেছিল আজ আর তা নেই। তার মন আজ কেমন যেন উদাস উদাস— নোঙরহারা।

উৎস নির্দেশ:

১. রায়, দিলীপকুমার, *স্মৃতিচারণ,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৬, পৃষ্ঠা- ১২

২. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫

৩. তদেব

৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৬

৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪১

৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৩

৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৭

৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৭

৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৫

১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৭

১১. তদেব

১২. তদেব

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০২-২০৩

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭৬

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭৬

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮৯

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৯০

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৯১

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৩৫

২০. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৩৫

২১. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯১

২২. তদেব

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৯২

২৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৯

২৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৯৫

২৬. তদেব,

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৮

২৮. রায়, দিলীপকুমার, *মনের পরশ*, ভারতবর্ষ, পত্রিকা প্রকাশ ১৩৩২ পৃষ্ঠা- ১৫৬

২৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২

৩০. তদেব, পৃষ্ঠা- ২১৮

৩১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৬

৩২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৭

৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৭

৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৮

৩৫. তদেব,

৩৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৯

৩৭.তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৩

৩৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৬

৩৯.তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৪

৪০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬০

৪১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৮

৪২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬২

৪৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫১৪

৪৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৯

৪৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩০

৪৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৩১

৪৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫১৯

৪৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫২২

৪৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৭৭-৭৮

৫০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৯৩

৫১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৯৫

৫২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৯৬

৫৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৯৭

৫৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮০৪

৫৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩০

৫৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩৩

৫৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩৬

৫৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৭৯

৫৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৮১

৬০. রায়, দিলীপকুমার, *দু-ধারা*, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪২, পৃষ্ঠা- ২১৮

৬১. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫৫

৬২.তদেব, পৃষ্ঠা- ২২৮

৬৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৩৭

৬৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪০

৬৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪৫

৬৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪৭

৬৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪৯

৬৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫৯

৬৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫৯

৭০. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৬৪

৭১. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮২

৭২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১৯

৭৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮৬

৭৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০৭

৭৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১৪

৭৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২০

৭৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২০

৭৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৮

৭৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৭৪

৮০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮২

৮১. রায়, দিলীপকুমার, *বহুবল্লভ*, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪২, পৃষ্ঠা- ১১

৮২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫

৮৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫

৮৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬

৮৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬

৮৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৭

৮৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮

৮৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪০

৮৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৫-৪৬

৯০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০২

৯১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৭

৯২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৮

৯৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৮

৯৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৩

৯৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫২

৯৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৪

৯৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭৫

৯৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭৬

৯৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮১

১০০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮১

১০১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯০

১০২. রায়, দিলীপকুমার, *দোলা,* গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৩৫, পৃষ্ঠা- ২৬

১০৩. তদেব

১০৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৫

১০৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৯

১০৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭৭

১০৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬

১০৯. তদেব

১১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২২

১১১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩৩

১১২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪১৯

১১৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪২২

১১৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৫৯

১১৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৬৪

১১৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৯২

১১৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৭

১১৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১৫

১১৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১৬

১২০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১৭

১২১. রায়, দিলীপকুমার, *তরঙ্গ রোধিবে কে?* গ্রন্থম্, কলকাতা, ১৩৬৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, পৃষ্ঠা- ১

১২২. তদেব, পৃষ্ঠা- ২

১২৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫

১২৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬

১২৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১

১২৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪

১২৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯

১২৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪

১২৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৬

১৩০. তদেব,

১৩১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮

১৩২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৮

১৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬১

১৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৬

১৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৭

১৩৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৭

১৩৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৮

১৩৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭০

১৩৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮১

১৪০. তদেব

১৪১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮২

১৪২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮২

১৪৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৩

১৪৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৩

১৪৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৫

১৪৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৬

১৪৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৩

১৪৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৫

১৪৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৫

১৫০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৮

১৫১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৯

১৫২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১১

১৫৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৮

১৫৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৩

১৫৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৫

১৫৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮০

১৫৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ২১৩

১৫৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪০

১৫৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৬১

১৬০. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৬৫

১৬১. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৯৮

১৬২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১৭

১৬৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১৭

১৬৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২২

১৬৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৭

১৬৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩১

১৬৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৪০

অষ্টম অধ্যায়:

অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্নদাশঙ্কর রায়ের (১৯০৪-২০০২) ব্যক্তিজীবন:

অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯০৪ সালের ১৫ই মার্চ ওড়িশায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন হুগলী জেলার নিবাসী। তাঁর পিতা নিমাইবাবু ওড়িশার রাজকর্মচারী ছিলেন। অন্নদাশঙ্কর ছাত্রজীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে ছিলেন ওড়িশার কটক ও বিহারের পাটনায়। তিনি প্রথম থেকেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯২১ সালে কটক থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর প্রথম স্থান নিয়ে ১৯২৩ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই. এ. ও ১৯২৫ সালে ইংরেজি সাহিত্যে সাম্মানিক বি. এ. পাস করেন। ১৯২৬ সালে আই. সি. এস পরীক্ষাতে তিনি রেকর্ড সংখ্যক নম্বর নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং তার প্রশিক্ষণের জন্য তিনি বিলেত যাত্রা করেন। আমরা জানতে পারি, ১৯২৭-১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি লন্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজ, কিংস কলেজ, লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স এবং লন্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ অধ্যয়ন করেন। এরপর ১৯৩৬ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ১৯৪০ এ জেলা জর্জ হন এবং ১৯৪০ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগীয় সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত হন। পরে সেখানকার আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার কারণে চাকরি ছেড়ে সর্বকালীন লেখক হওয়ার অভীপ্সায় রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে বসবাস করতে শুরু করেন। যদিও পরবর্তীকালে তাঁর স্থায়ী নিবাস হয় কলকাতার বালিগঞ্জে।

ছোটবেলায় তিনি স্কুলের ম্যাগাজিন ঘরের চাবি পেয়ে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' কতকটা বুঝে না বুঝেই পড়েছিলেন। 'দিশা' গ্রন্থে 'প্রমথ চৌধুরীর ভাষা'- প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, '... সবুজপত্র যেদিন আমি আবিষ্কার করি, সেদিন আমার আকর্ষণের বিষয় ছিল 'চার ইয়ারী কথা'-র তৃতীয় কথা। সোমনাথের কথা। আগের সংখ্যাগুলি পরে পড়ি। ওসব কাহিনী বোঝাবার মতো বয়স (বারো বছরের বালক) আমার নয়। তবু তন্ময় হয়ে পড়েছি। ... তখন থেকেই বিদেশের প্রতিষ্ঠান আমার অন্তরে। আর এই গল্পগুলির আবেদন বিদেশকে না হোক বিদেশিনীকে ...। আমিও বয়সে গোঁড়া হিন্দু ও স্বদেশী সভ্যতার অন্ধ সমর্থক। ওদের সভ্যতা আমার কাছে পরধর্মের মতো ভয়াবহ। অথচ, সেই আমি ওদের সম্বন্ধে হাতের কাছে যা পাই, তাই পড়ি। বিদেশযাত্রার কথাও ভাবি।'[১] তিনি আরও বলেছেন, '... ইস্কুলের লাইব্রেরীতে

অগুণতি ইংরেজী বই ছিলো, যা পাঠ্য নয়। অপাঠ্যেই আমার অধিকতর রুচি। স্কট, ডিকেন্স ইত্যাদিতো পড়তুমই, পড়তুম ইতিহাসের বই, ভূ-বৃত্তান্ত, কোষগ্রন্থ। যেমন— চিলড্রেন এনসাইক্লোপিডিয়া, সেলফ এডুকেটর। ...'[২]

অন্নদাশঙ্করের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে ইউরোপীয় সংযোগ:

অন্নদাশঙ্কর রায় আই. সি. এস.-র প্রশিক্ষণ সূত্রে ইউরোপের মাটিতে পা রেখেছিলেন **১৯২৭** সালে। এইসময় তিনি ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে একাধিক মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ফলে সেখানকার মানুষের জীবনের গতিধারা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল। অথচ তিনি ভারতীয়, একজন বাঙালি। জন্মেছেন ওড়িশার ঢেঙ্কানালে এক শাক্ত পরিবারে। আবার দাম্পত্য জীবনে ঘর বেঁধেছিলেন মার্কিন মেয়ের সঙ্গে।

ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবনকলার সুবাদে অন্নদাশঙ্কর রায়ের জীবনে ও সাহিত্যে ইউরোপীয় প্রভাব গভীর ও সুস্পষ্ট। তিনি শুধু ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতিতে মুগ্ধ হননি, তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন ইংরেজের জাতীয় চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যেও, তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনাবোধে এবং সর্বোপরি, ইউরোপের পটভূমির বিশালতায়। তিনি বলেছেন, '... বিলেতে আমি **১৯২৭** থেকে **১৯২৯** এই দু'বছর ছিলুম। এর ফলশ্রুতি কেবল 'পথে প্রবাসে' ও 'তারুণ্য', নয়, এই দু'বছরের ফ্রেমে বাঁধা আরো বারো বছর ধরে লেখা ছয় খন্ডে সমাপ্ত 'সত্যাসত্য', ইউরোপের সঙ্গে ভারতকে মিলিয়ে নেবার এ-সুযোগ না পেলে আমি বাংলা সাহিত্যের আসরে অতো সহজে আসন ক'রে নিতে পারতুম না।'[৩] ইউরোপের বিশাল পটভূমির প্রতি লেখকের ব্যক্তিগত আকর্ষণেরও পরিচয় পাই তাঁর নিজের স্বীকারোক্তিতেও। তিনি বলেছেন— "ইউরোপকে আমি না দেখেই ভালবেসেছিলুম, দেখেও ভালবাসলুম।"[৪] তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন— "ভারতবর্ষকে রবীন্দ্রনাথ মহামানবের সাগরতীর বলেছেন। ইউরোপকে আমি বলব মহামানবের মানস সরোবর। সগরে যেমন সকল প্রবাহিনী নির্গত হয়। ইউরোপের মানস থেকে যুগে যুগে কতো ভাবধারা নির্গত হয়ে পৃথিবীকে ভাবোর্বরা করেছে।"[৫] অন্নদাশঙ্করের শিল্পীমনে সবচেয়ে বড় প্রভাব ছিল ইংরেজ জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের। ইউরোপ প্রবাসী লেখক ইংরেজ

জাতীয় ঘনিষ্ঠের সান্নিধ্যের সুবাদে বলেছেন— "ইউরোপের জীবনে যেন বন্যার উদ্দাম গতি সর্বাঙ্গের অনুভব করতে পাই।"[৬]

অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসে ইউরোপ প্রসঙ্গ:

বাংলা কথাসাহিত্যে বিষয়গত ভাবে বা পটভূমিতে ইউরোপ প্রসঙ্গটি ছাড়াও ইউরোপীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনা দ্বারাও কখনো প্রত্যক্ষ ভাবে আবার কখনো বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে বাঙালির মানসপটে যে পরিবর্তন শুরু হয়, তা পূর্ণতা পায় বিশ শতকের প্রথমদিকে বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে। বিশ্বযুদ্ধের নানা পরোক্ষ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ভারতভূমিতে আছড়ে পড়ে কারণ ভারত তখন ব্রিটিশ শাসিত উপনিবেশ। এইসময় ইউরোপীয় রাজনীতি ও বিশ্বযুদ্ধ বাঙালির রাজনৈতিক জীবনে কালান্তরের আভাস বয়ে আনে। ইংল্যান্ডে এতদিনের প্রচলিত পুরনো উদারনৈতিক চিন্তাধারা, পার্লামেন্টারি শাসন প্রণালী, ব্যক্তিজীবন, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, শ্রমিকদল, কমিউনিজিম্ ইত্যাদি একাধিক তত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সহচর্যে বাঙালির ব্যক্তিসত্ত্বা আন্দোলিত বিক্ষুদ্ধ ও বিবর্তিত হয়েছে। ইউরোপীয় জীবনপটের সঙ্গে ভারতীয় জীবনাদর্শ ও চিন্তাভাবনাকে যুক্ত করে যুদ্ধোত্তর মননশীল মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা কীভাবে বাংলা কথাসাহিত্যে চিত্রিত হয়েছে তারই ব্যপক ও জটিল চিত্র এঁকেছেন অন্নদাশংকর রায় তাঁর একাধিক ইউরোপীয় পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসের মধ্যে।

ভারতীয় সাহিত্যচর্চার ধারা ও ইউরোপের রেনেসাঁসের জোয়ার অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যসৃষ্টি ও সংস্কৃতি চিন্তার ক্ষেত্রে অনবদ্য সমন্বয় ঘটিয়ে এক আশ্চর্য মনন তৈরি করেছিল। এর ফলে অন্নদাশঙ্কর রায় উপন্যাসের চরিত্রসৃজন ও কাহিনির গতিময়তার দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের মানুষের জীবনের কথা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। দেশ জাতি সম্পর্কে তাঁর ছিল গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও প্রগতিশীল ভাবনা, যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে জীবন ও সংস্কৃতি। সংস্কৃতির চিন্তাকে তিনি কোন গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। অনেক ভারতীয় তথা বাঙালি মানুষের জীবন সংস্কৃতির সঙ্গে ইউরোপীয় জীবন সংস্কৃতি এমনভাবে

মিশে গেছে যেন, ভারতের মানুষ আর ইউরোপের মানুষ একই পরিবারের অংশ। অনেক বাঙালি বঙ্গদেশে থাকলেও তাদের বেড়ে ওঠা, গড়ে ওঠা ইউরোপের পটভূমিতে। তবে তাদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতির ব্যাপারে কিছু কিছু মিল থাকলেও ইউরোপীয় জীবন সংস্কৃতির ধরন-ধারণ কিছুটা ভিন্ন— একথা স্বীকার করতে হবে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবন ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানে ও সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এক নতুন জীবনবোধ ও সংস্কৃতি। অন্নদাশঙ্করের রচিত উপন্যাসগুলিতে আমরা এরকম একাধিক চরিত্র দেখতে পাই। অনেক চরিত্রেই ভারত থেকে ইউরোপের মাটিতে যাচ্ছেন উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। ইউরোপের মেধাবী ছাত্রদের পাশে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে তাঁরা উচ্চকর্মসংস্থান অর্জনও করেছেন। কেউবা ইউরোপকেই তাদের হৃদয়স্থলে আবাসভূমি করে তুলেছেন। কেউবা ভারতে এসে ভারতীয় জাতীয় জীবনকে সুগঠিত করতে আত্মনিয়োগ করেছেন। আবার ইউরোপ থেকে অনেকেই ফিরে এসেছেন ভারতমাতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে— এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ফিরে এসেছেন। আসলে তিনি চেয়েছিলেন আমাদের ভাবী সংস্কৃতি হবে মডার্ন ও মরাল। আর ইউরোপীয় রেনেসাঁস আমাদের বঙ্গ-সংস্কৃতিকে অনেকটাই 'আধুনিক' করেছিল। তিনি মনে করতেন আধুনিকতার ছোঁয়ায় একদিকে পশ্চাৎপদদের অন্ধতা দূর করবে, অন্যদিকে শক্তিমত্তদের চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়ে সংযত ও সপ্রেম করবে। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর উপন্যাসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবন ও সংস্কৃতি অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনায় একরকম নতুন জীবনবোধকে খুঁজেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: 'আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৩০), 'সত্যাসত্য', (১৯৩২-৪২), 'পুতুল নিয়ে খেলা' (১৯৩৩) প্রভৃতি।

সত্যাসত্য (১৯৩২-৪২):

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডের 'প্রাসঙ্গিক' অংশে সম্পাদক ধীমান দাশগুপ্ত আমাদের জানাচ্ছেন, অন্নদাশঙ্করের তিনটি অন্বেষণ আছে— সত্যের অন্বেষণ, প্রেমের অন্বেষণ, আর সৌন্দর্যের অন্বেষণ। 'সত্যাসত্য' সেই 'সত্যে'র অন্বেষণের কাহিনি। লেখক 'সত্য' সম্পর্কে বলেছিলেন, 'সত্য' কী তা এক কথায় বলা না, সেই 'এক্সপেরিয়েন্স অফ ট্রুথ' নিয়ে 'সত্যাসত্য'

উপন্যাস লেখা। এই উপন্যাসটি ছয়টি খণ্ডে বিভক্ত, যথা- i. যার যেথা দেশ (১৯৩২), ii. অজ্ঞাতবাস (১৯৩৩), iii. কলঙ্কবতী (১৯৩৪), iv. দুঃখমোচন (১৯৩৬), v. মর্ত্যের স্বর্গ (১৯৪০) ও vi. অপসরণ (১৯৪২)।

'সত্যাসত্য' প্রথম খণ্ড 'যার যেথা দেশ'(১৯৩২)-এর ভূমিকায় লেখক উপন্যাসটির সৃষ্টির প্রেরণা, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং চরিত্র বিশ্লেষণে সামগ্রিক আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বিশ্বব্যাপারের সর্বত্র যে দুই বিরুদ্ধ মহাশক্তি সর্বদা সক্রিয় রয়েছে প্রাচীনরা তাদের দেবাসুর আখ্যা দিয়েছিলেন। দেশান্তরে তারাই God এবং Satan; তাদের নিয়ে প্যারাডাইস লস্ট্ রচিত হয়েছে। আধুনিক মন ওসব নাম পছন্দ করে না, তাই তাদের বলে সত্যাসত্য। গোড়াতে আমার সংকল্প ছিল তাদের নিয়ে আমিও একখানি এপিক রচনা করব। কিন্তু পদ্যে নয় গদ্যে, যেহেতু আধুনিক মনের স্বাভাবিক ভাষা গদ্য। গ্রন্থের যুগ্মনায়কের নাম রাখতুম সত্য এবং অসত্য। কিন্তু অমন নাম কোনো পিতামাতা রাখেন না। অতএব সুধী ও বাদল। নারীবর্জিত হলেই ভালো হত। কিন্তু নায়িকাবিহীন কাব্য হয় না। অতএব উজ্জয়িনীর অবতারণা। সত্য এবং অসত্য উভয়ের আকর্ষণ তাকে দ্বিধায় দোলাবে। সে যেন সংকটাপন্ন মানবাত্মা। "সত্যাসত্য" এপিক তথা রূপক হবে।"[৭] আর এই 'এপিক'ধর্মী 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের মধ্যে লেখক ইউরোপের পরিবেশে উপন্যাসের নায়ক বাদল চরিত্রের নানা বির্তক, আলোচনা, চিন্তা ও বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে বর্তমান যুগের জটিল সমস্যার আলেখ্য তুলে ধরেছেন। 'সত্য' ও 'অসত্যে'র রহস্য সন্ধানে লেখক বলেছেন, "এপিকের বিষয়-বস্তু সত্যাসত্যের হিসেব নিকাশ। ... নায়ক নায়িকা তিন জনের তিন পন্থা। সুধী গ্রহণ করেছে ইন্‌টুইশানের মার্গ, বাদল ইন্‌টেলেক্‌টের, উজ্জয়িনী আত্মনিবেদনের। তিন জনেরই আকাঙ্ক্ষা বিশুদ্ধ ও বিপুল, অধ্যবসায় একাগ্র ও একান্ত, নিষ্ঠা নিবিড় ও নিগূঢ়। ওদের স্বভাবে কৃত্রিমতা নেই। এপিকের নায়ক নায়িকা হবার যোগ্যতা ওদের আছে, ওরা পূরা মাপের মানুষের চাইতে মাথায় উঁচু।"[৮]

যার যেথা দেশ (১৯৩২):

উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের সূচনাতে দেখি, দুই বন্ধু বাদল ও সুধী বিলেত যাওয়ার পরিকল্পনা করে। বাদলের বাবা বাদলকে বিয়ে করেই বিলেত যাওয়ার কথা বলেন। এতে বাদলের বাবার যুক্তি ছিল "... বৌ না রেখে বিলেত গেলে পাছে বৌ নিয়ে দেশে ফিরি সেই জন্যে করতে হবে বিয়ে।"[৯] বাদল বন্ধু সুধীর যুক্তিতে ও বাবার চাপে পড়ে উজ্জয়নীকে বিয়ে করে বিলেত যাওয়ার বন্দোবস্ত করে। বিয়ের পাত্রী উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনীর বাবা ক্যাপ্টেন ওয়াই গুপ্ত ও মা মিসেস সুজাতা গুপ্ত তাঁর বড় মেয়েদের ইংল্যান্ড প্রত্যাগতদের জামাইরূপে বরণ করে নিয়েছেন। যদিও সেই জামাইদের বয়স শাশুড়ির বয়সের সমান, তবুও জামাতা রূপে নির্বাচন করেছেন, যেহেতু তারা বিলেতফেরত এবং অত্যন্ত উপার্জনক্ষম। আর বর্তমানে তাদের নতুন জামাই বাদলও সেই বিলেতেই যাচ্ছে।

মিসেস গুপ্ত নিজে বিলেতে না গেলেও বিলেত ফেরতার মেয়ে, স্ত্রী ও শাশুড়ি। তাই চাকর-বাকর বেহারার মুখে তিনিও মেমসাহেব ডাক শুনতে অভ্যস্ত। স্বামীর ত্রুটি ঢাকবার জন্য তিনি অতিরিক্ত রকম সাহেবিয়ানা ফলাতেন। 'তার বসবার ঘরে ইংরেজি ধরনের কয়লার আগুন জ্বলত। অগ্নিস্থলীর উপরিতন ম্যান্টল্‌পীসে একরাশ পুরাতন ক্রিস্‌মাস কার্ড ও নিউ ইয়ার ক্যালেন্ডার শোভা পেত। ...'[১০] তাঁর দুই বড় মেয়ে কৌশাম্বী ও কাঞ্চির-এই পিতৃদত্ত নাম দুটোকে লোকমুখে খারিজ করে দিয়েছে বিলিতি ঢঙে লিলি গুপ্ত ও ডলি গুপ্ত।

বিলেত গমনোদ্যত বাদলকে জামাই করতে যোগানন্দর মনোবাঞ্ছা "সেই সুন্দর ছেলেটির কথাই ভাবি। সে বিলেত চলে যাচ্ছে। তার যাবার আগে তাকে আমার বুকে নিতে চাই। তা সে রাজি হবে কেন, যদি না তুই রাজি হস? — এই বলে কন্যার কাছে আবদার করেন। কন্যা তাতে সম্মতি জানায়।"[১১] এরপরে উজ্জয়িনীরও বিলেত যাবার মোহ আস্তে আস্তে পেয়ে বসে। সে এবার ভাবতে থাকে এতদিন তার একমাত্র সঙ্গী ছিলেন বাবা, এবার তার সঙ্গী স্বামী বাদল। নতুন বন্ধু। এই নতুন বন্ধু বিলেত যাচ্ছে, অতএব বিলেতেও তার একটা বন্ধু থাকল। 'শিশুকাল থেকে বিলেত সম্বন্ধে তার কৌতূহল। একদিন সে বিলেতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসবে কোথায় Little Nell-এর দোকান ছিল, কোথায় কেনিলওয়ার্থ দুর্গ, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল কোথায় কাজ

করতেন, ইংরেজদের পার্লামেন্ট কেমন। ...'[১২] কারণ এ নিয়ে তিনি অনেকের কাছে অনেক কিছু শুনেছে এতদিনে।

শেষপর্যন্ত অর্ধ হিন্দু ও অর্ধ-ব্রাহ্ম মতে উজ্জয়িনীর বিয়ে হয়ে গেলে সে বাদল-এর কাছে ছেলেমানুষী আবদার করে বলে, "বিলেতে গিয়ে আমাকে আরো-আরো-বই পাঠাবেন?" বাদল তাতে সম্মতি জানায়। এদিকে পিতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বাদল চললেন ইউরোপের উদ্দেশ্যে, প্রথমে হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে বোম্বে পৌঁছায়।

এরপর বাদল ইউরোপের জাহাজে উঠে ইউরোপে যাবার উত্তেজনায়। ডেকের উপর ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল যেন এতদিন পর সে তার বন্দী জীবন থেকে ছাড়া পেয়েছে—'এতকাল পরে তার জীবনের স্বপ্ন সফল হতে চলল! ইউরোপ! সে কি পৃথিবীর অংশ! কত মহামনীষীর তপস্যা তাকে সূর্যের মত দ্যুতিমান করেছে, তার দিকে চাইলে চোখ ঝলসে যায়।...'[১৩] বাদলের জাহাজের টিকিট সমুদ্রপথে লন্ডন পর্যন্ত ছিল, কিন্তু তাতে বাদলের ধৈর্য ধরছিল না। চোদ্দ-পনোরো দিন জাহাজে থেকে থেকে এখন তার ইচ্ছা করে মাটিতে নেমে ছোটাছুটি করতে কারণ সে ইউরোপের মুক্তির সম্ভাবনায় অধীর। এরপর আবাল্যের অলকা অমরাবতী লন্ডনে পৌঁছায় সন্ধ্যায়। বন্ধু সুধী তাকে নিয়ে যায় লন্ডনের ঘরে, মার্সেলের বাড়িতে, যেখানে সুধী ভাড়া থাকেন। এখানে বাদলের ঘরে একখানা লোহার খাটের বিছানা, পড়ার একটা টেবিলের উপর ফুল ও ফুলদানী, হাতমুখ ধোবার চিনামাটির একটা কুঁজো ও বেসিন এবং আয়না লাগানো একটি আলমারি। সেখানে কিছুদিন যেতে না যেতেই বাদল সুধীকে জানায় 'কন্টিনেন্টালদের' সঙ্গে থাকতে তার উৎসাহ হচ্ছে না। সে ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে থাকতে চায়। কারণ মার্সেলদের সম্পর্কে সুধীর তাকে জানায় এরা ফরাসী, আর শৈশব থেকে সুজেতের বাড়িতে আশ্রিত। যুদ্ধের সময় সুজেতের মা-বাবা তাকে নিয়ে ইংলণ্ডে পালিয়ে আসে, তখন থেকেই তারা এখানেই থাকে। সুজেতরা শ্রমিক শ্রেণির লোক, যুদ্ধের পরে তারা যখন নামমাত্র মূল্যে বাড়ি পাওয়া যায় তখন এই বাড়িখানা কেনে। বাপ মিস্ত্রি, মা ঘর সংসার বোঝে। সুজেৎ সবে স্কুলের পড়া শেষ করে কোন একটা দোকানে কাজ পেয়েছে। পেয়িং গেস্ট না নিলে তাদের চলে না, কারণ ট্যাক্স অনেক।

লন্ডনে এসে বাদলকে বি.এ. ডিগ্রির জন্য বই পড়তে ও পরীক্ষা দিতে বিশ্রী লাগছিল। এমনকি সে যদি পিএইচডি থিসিস লেখার অনুমতি পেলেও তার উৎসাহ হবে কিনা বুঝতে পারে না। বাদলের বন্ধু সুধীরও একই অবস্থা। ‘সুধীদা বিদেশী ডিগ্রীর মর্যাদা মানে না। সে যদি চাকরি করে তো দেশী ডিগ্রীর জোরেই করবে। ...’[১৪] অন্যদিকে, বাদল আসলে মনে-প্রাণে হতে চায় ইংরেজ— “আমার মন চায় মনে প্রাণে ইংরেজ হতে, ইংরেজের সুখ দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখ করতে, ইংরেজ যে যে সমস্যার সমাধান খুঁজছে সেই সেই সমস্যার সমাধান খুঁজতে। কলেজ পড়ে আমি কতটুকু ইংরেজ হতে পারি বল ? ইংলণ্ডের সব অঞ্চল দেখব, সব রকম মানুষের সঙ্গে মিশব, সব প্রচেষ্টাতে যুক্ত থাকব এই আমার মনস্কামনা।”[১৫]

দে সরকার অবাক হয়ে যায়। ভাবতে থাকে বিলেতে স্বদেশ থেকে কত ছেলে আসে, কেউ ব্যারিস্টার, কেউ আই.সি. এস কেউবা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট আবার কেউবা এঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরে যায়। এই সব নিষ্কর্মা ধনি সন্তানদের সকলেই রেপাব্লিকান ন্যাশনালিস্ট, কেউ কেউ দুর্ধর্ষ কমিউনিস্ট। সকলেই নিখুঁত ইংরেজি বলতে চেষ্টা করে, নিখুঁত ইংরেজি পোশাক পরে, ইংরেজ বন্ধু পেলে ধন্য ধন্য করে। কিন্তু কেউ কি এই পাগলটার মতো মনে প্রাণে ইংরেজ হতে চায়? তা নিয়ে ভাবতে থাকে। দে সরকার বলেন, “আমি স্বদেশী নই, আমি সব-দেশী। ভারতবর্ষই আমার দেশ নয়, ভারতবর্ষও আমার দেশ। ও দেশের মধ্যে তুমি এমন কী দেখলে যার দরুন ওকে একেবারে অস্বীকার করলে ?”[১৬] কিন্তু বাদল পুরোপুরিই ইংরেজ হতে চায়। তাই সে এখন ভারতবর্ষের স্বপ্নও দেখতে চায় না। একদিন রাত্রে দেশের স্বপ্ন দেখে বলে পরের দিন দিনের বেলা আর কোন ভারতীয়ের সংস্পর্শে পর্যন্ত আসে না, ভারতীয় চিঠি পড়ে না, শুধু তাই নয় প্রতি সপ্তাহে দেশের চিঠি এলে সুধীকে দিয়ে পড়াবে ও উত্তর লেখাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। কলেজ খুলে গেলে সে সুধীকে জানায়— “ভেবে দেখলুম আইন পড়ব। তার মানে বার-ডিনার খাব এবং টো টো করে বেড়াব। Called যদি হই তো English Bar-এই প্র্যাকটিস করব। ইণ্ডিয়ায় আমি ফিরছিনে, ভাই সুধীদা।”[১৭] এদিকে উজ্জয়িনী বাদলকে বার বার চিঠি লিখলেও বাদল চিঠির উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা— পড়ে পর্যন্ত দেখে না, অন্যদিকে শুধুমাত্র ‘ইংরেজ’ বলে মিসেস উইল্‌সের সঙ্গে তর্ক করে, তার বাজার করে, নিমন্ত্রণ রক্ষা করে সময়

কাটাতে থাকে। এমনকি এক সময় এই মিসেস উইল্‌সের প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে তার চিঠিপত্র লিখে দিত, তাঁর ফোন ধরত, ফোন ধরতে ধরতে কত লোকের সঙ্গে তার আলাপ হয়ে গেছে। বাদলের পিতা চিঠিতে উপদেশ জানায় 'সুধী ও বাদল যেন পাশ্চাত্যের জীর্ণ কঙ্কাল বহন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করে না। যেন পাশ্চাত্যের বাহ্য চাকচিক্যে সম্মোহিত হয় না। যাহা ভালো তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা মন্দ তাহা সর্বদা বর্জনীয়।'[১৮] বাদল ক্রমে গোমাংস খেতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। বাদল বিলেতে গিয়ে অন্য একাধিক দায়িত্ব নিলেও নিজের সামান্য দায়িত্বটুকু পালন করে নি, শুধুমাত্র ভারতীয় বলে, ভারতীয় স্ত্রী উজ্জয়িনী বলে।

বাদল বিলেত যাওয়ার বেশকিছু দিন হলে উজ্জয়িনীর মনও বিলেতমুখী হয়ে যায়। সে মনে ভাবতে থাকে একবার সুযোগ পেলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বাদলের সঙ্গে কথা বলবে, ইংলণ্ডে পৌঁছাবে। সেখানে গিয়ে, 'আধুনিক যুগের কোন কোন চিন্তানায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, কোন অঞ্চলে চাষাদের ফার্মে থাকবে, কোন কোন কোম্পানীতে শখের য়্যাপ্রেন্টিস হবে ...'।[১৯] ইত্যাদি হাজারও জল্পনা কল্পনা তার মনে। একসময় বাদল তার বিয়ে করার আসল কারণ উজ্জয়িনীকে বলে, "বিয়ে না করলে বিলেত যেতে পাব না বলেই বিয়ে করেছি। আর বিলেত না যেতে পেলে আমার জিনিয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে। এতদিন যে এদেশে আছি এই এক ট্র্যাজেডী।"[২০] ফলে বিয়েটা যেন উজ্জয়িনী একাই করল— যার নামমাত্র স্বামী হল বাদল। তাই উজ্জয়িনীর সিঁথিতে সিঁদুর ও হাতে নোয়া উঠলেও সে অন্তরে কুমারীই থেকে গেল। আর এইরকম শর্ত জানার পরও উজ্জয়িনী বাদলের বন্ধু সুধীরকে চিঠি লিখে, দিনের পর দিন নিজের মনের কথা, ভাবনার কথা জানায়। বাদল যে তাকে বিলেতে নিয়ে যাবে না সেটা সে এক সময় বুঝতে পেরেছে। সুধীকে উজ্জয়িনী স্পষ্টত জানায়, ইংরেজকে পছন্দ করলেও সে কিন্তু ইংরেজ হতে চায় না কোনও দিন। সে বলেছে, 'ইংরেজের প্রতি আমার বিদ্বেষ নেই, তবু ইংরেজ আমি কিছুতেই হব না। আমার দেশের মহান অতীত ও মহত্তর ভবিষ্যৎ তার বর্তমানকালের গ্লানি ও লজ্জার থেকে বড়। সেই বড়ত্বের লোভে আমি ভারতীয়া।' [২১] তাই সে কল্পনা করে হয়তো কোনদিন তার শ্বশুরের সঙ্গে বিলেত যাবে। ঠিক এইরকম অবস্থায় উজ্জয়িনী তার বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছায়। সেই বাড়িতে বাদলের ঘরে অনেক

কিছু দেখতে পেলেও তার ছবি কোথাও দেখতে পেল না। আর শ্বশুর বাড়িতে আনার পরই তাকে ভাবী আই. সি. এস অফিসারের স্ত্রী হিসেবে বিলেতি মেমের মতো হতে বলে। কিন্তু এবারেও সে জানায়, "আমি খাটি বাঙালী হতে চাই।"[২২]

স্বামীর বাড়িতে আসার কিছুদিন পর থেকেই উজ্জয়িনী পাশের বাড়ির তরুণী বধূ বীণার স্বামী ভক্তি ও শ্রদ্ধা-পূজা লক্ষ করে। একসময় সে বীণার প্রতি মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে সখী সম্পর্ক পাতায়। বাদল তার স্বামী হলেও দূরে থাকে, কিন্তু বীণা থাকে অদূরে— বীণার টানই এখন প্রবলভাবে তার কাছে অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু তার পরও বাদলের টান যে, একেবারে মন থেকে শূন্য হয়ে গেছে তা কিন্তু নয়।

বাদল এদিকে অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। 'ইংরেজের ছেলে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করে বিশ বৎসর বয়সে যা হয়ে ওঠে বাদল বিশ সপ্তাহে তা হতে চায়। অথচ বিশ বৎসরেও তা হবার উপায় নেই, কারণ ততদিনে ইংরেজসন্তান চল্লিশ বৎসর বেঁচেছে আর ইংলণ্ডবাসী বাদল বেঁচেছে বিশ বৎসর। ... বাদল উঠে পড়ে দৌড়াচ্ছে। ইংলণ্ডের বিগত বিশ বৎসরের দৈনন্দিন ইতিহাস সে সংবাদপত্র হতে বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত স্মৃতিসাৎ করছে।'[২৩] উজ্জয়িনীর সখী বীনার মতোই বাদলেরও বিলেতে ফ্রেড কলিন্স নামের এক বন্ধু হয়। এই বন্ধু কলিন্স বাদলকে ইংলণ্ডপ্রীতি থেকে কিছু সরে আসতে বলে ও বোঝায়। কিন্তু 'বাদল তাদের বিশ্বাস করাতে পারে না যে তার ইংলণ্ডপ্রীতির হেতু আর যাই হোক এটা নয় যে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের মালিক কিংবা পৃথিবীর সেরা নেশন। ইংলণ্ড যদি কাল ভারতবর্ষের অধীন হয় তা হলেও সে ইংরেজ থাকবে।'[২৪] আর সেজন্যই বাদলের মনোবাঞ্ছা উজ্জয়িনী তার প্রতি রাগ করে তাকে ত্যাগ করে চলে যাক। আসলে বাদল আর সুধী যে দুই-জন দুই মার্গ অবলম্বন করেছে বিলেতে এসে সেকথা লেখক আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন— 'সুধীদা বিজ্ঞের মতো ইন্‌টুইশনের মার্গ অবলম্বন করেছে, সে-সম্বন্ধে ইউরোপে তাকে ওরা অথরিটি বলে স্বীকার ও সম্মান করবে। আর বাদলকে বলবে, হ্যাঁ, ইন্টেলেক্‌চুয়ালদের সমাজে পাত্তা পাবার যোগ্য বটে, কিন্তু আপ-টু-ডেট থাকবার জন্যে প্রাণপাত করেছে, তাই জগৎকে দেবার মতো প্রাণ অবশিষ্ট নেই।'[২৫] বাদল আসলে বারে বারে ইউরোপকে প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন

দেখেছে। অন্যদিকে, সুধী ব্রিটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরিতে তুলনামূলক দর্শন, সমাজতত্ত্ব ও প্রাচীন সাহিত্য পড়ে ভারতীয় সমাজের অতীত ঐতিহ্য অনুসন্ধান করে। রবিবারে জন কয়েক ভারতীয় বন্ধুর খোঁজখবর নেয় ও তাদের কারুর সঙ্গে বাংলা বা হিন্দিতে কথা বলে দিন কাটায়। সেইসঙ্গে উজ্জয়িনীকেও নিয়ে ভাবে। সে বলে চলে—"আমাদের যখন বিশ্ব-চেতনা বাড়বে তখন জাতীয় ঐক্যবোধ বাড়বে, তা আমরা স্বদেশেই থাকি আর বিদেশেই থাকি। 'জাতি' 'জাতি' করলে জাতীয়তা আসে না, 'বিশ্ব' 'বিশ্ব' করলে আসে।"[২৬]

উজ্জয়িনী তার নতুন বন্ধু বীণাদের বাড়িতে প্রতিদিন দুপুর বেলা গিয়ে ধর্মগ্রন্থ পাঠ শোনে আর মনে মনে অভিমান করে তার বাবার প্রতি, স্বামীর প্রতি সুধীদার প্রতি, কেন তারা এতদিন এমন বিষয়ের কথা, এই আনন্দের কথা তাকে জানায়নি। পরে নিজের জীবনকে রাধিকার জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে দেখতে গিয়ে তার মনের ব্যথা আরও দ্বিগুণ হয়ে যায়। এখন তার মনে সন্দেহ হয় বাদল কি বিলেত থেকে আদৌই কোনদিন ফিরবে? আর শ্বশুরের সঙ্গে বিলেত গেলেই কি বাদল তাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করবে? ইত্যাদি একাধিক প্রশ্ন।

বাদলকে না পেয়ে মাটির প্রতিমাকেই এখন তার জীবন্ত বলে মনে হতে লাগল— 'প্রতিমা যে কত জীবন্ত, কত সত্য হতে পারে উজ্জয়িনী প্রত্যক্ষ করল। কে বলবে গোবিন্দজীর প্রাণ নেই! আহা দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কী হাসি, কী চাউনি! মাঝে মাঝে বেশ মনে হয় গোবিন্দজী সব কথা শুনছেন, শুনে টিপে টিপে হাসছেন।'[২৭] তাই এখন সে কৃষ্ণ নাম জপ করে মরতে চায়, বৃন্দাবনের গোপী হয়ে জন্মাতে সাধ করে। সেজন্যই সে হাতকে বালিশ করে মেঝের উপর শোয়া শুরু করে আর মনে মনে কামনা করে গোবিন্দজীর প্রসাদ আর একটু দই খেয়ে প্রাণ ধারণ করবে। ঠিক এই সময় উজ্জয়িনী সুধীকে চিঠি লিখে জানায় সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে চায়, নিরুদ্দেশ হতে চায় ভগবানের সঙ্গে মিশে থাকার জন্য।

ইংল্যান্ডের রাজনীতির সঙ্গে বাদল নিজেকে ক্রমেই জড়িয়ে ফেলতে থাকে। এতদিন বাদল দেশে থাকতে জেনারেল স্টাইকের খবর পেয়েছিল। ইংল্যান্ডে এসে ধনিকে, শ্রমিকে মারামারি দেখতে পায়নি। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন দেখতে পায় শ্রমিক শ্রেণির অবস্থার। যাদের বিশ বছর আগেও পার্লামেন্টে শ্রমিক সদস্য ছিল নখাগ্রগণ্য। সে আর লক্ষ করে, ইংল্যান্ডের পার্টি পলিটিক্স

ইংল্যান্ডের প্রধান জিনিস। প্রায় আড়াইশো বছর ধরে সেখানে কোন না কোন আকারে পার্টি আছে। আমাদের ভারতবর্ষের মানুষ যেমন ব্রাহ্মণ কিংবা কায়স্থ হয়ে জন্মায়, ইংল্যান্ডে জন্মায় কন্সারভেটিভ কিংবা লিবারল হয়ে। কিন্তু বাদল ইংল্যান্ডের হয়েও কোন পার্টির, তা নিয়ে মনে ভাবনা আসে। এই নিয়ে চলতে থাকে মনের মধ্যে দীর্ঘ বোঝাপারার যুক্তি-তর্ক। ফ্যাসিসম্ ও বোলশেভিস্‌ম্, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ইংল্যান্ডের জেনারেল ইলেকশন— এবিষয়ে একের পর এক তার বন্ধুও মিলেছে। মিস্টার উইলস্, ওয়েলী যাদের কাছে এবিষয়ে মতামত জানতে চেয়েছে নিজের মতকেও জানিয়েছে। ইউরোপ গিয়ে বাদলের একমাত্র আস্থা নিজেরই ওপর। বস্তুত, এই ধারণার বশবর্তী হয়েই সে পিতা-মাতা-স্ত্রী এমনকি তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সুধীকেও বারে বারে উপেক্ষা করে গেছে। একসময় বাদল সুধীর অজান্তেই বাড়ির ঠিকানা পরিবর্তন করেছে, শুধুমাত্র সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে নিজের উপস্থিতির খবরটুকু দিতেন।

অজ্ঞাত বাস (১৯৩৩):

চিন্তার একাগ্রতা নিয়ে বাদল লন্ডন ছাড়লেও লন্ডনের স্মৃতি বাদলকে ছাড়ে না। সে বুঝতে পারে লন্ডনের অভ্যেস ছাড়া তার পক্ষে শক্ত। সুধীরকে বাদলের মনে পড়ে। নিষিদ্ধ স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিয়ে বাদল একটু সুখ পায় বটে। মনে মনে অনুভব করে সুধীদা তাকে কত ভালোবাসে। এই ভাবনার মধ্যেও তার মনের মধ্যে উঁকি মারে ইংরেজ হওয়ার চিন্তা। 'ইংরেজের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার সে সর্বায়বে অনুভব করতে পারে কই। ভাষায় ইংরেজ হতে পারে, চিন্তাপ্রণালীতেও ইংরেজ হওয়া যায়, কিন্তু অস্থি মাংস স্নায়ু শিরার আভ্যন্তরিক সংস্থান সঞ্চালন ও বৃদ্ধি মহিমচন্দ্র সেন ও শৈলবালা দেবী এবং তাঁদের পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এবং মাতা মাতামহী প্রমাতামহী চিরকালের মতো অদৃশ্য শৃঙ্খলে বেঁধে দিয়ে গেছেন।'[২৮] এদিকে বাদলকে নিয়ে সুধীর চিন্তা— 'বাদল ইংলণ্ডকে নিজের দেশ করবার খেয়ালে ইন্‌টলেক্‌টের মার্গ থেকে প্রথম কয়েক মাস বিচ্যুত হয়েছিল। বাদলের মতো মনীষীর পক্ষে ওটা কি ছেলেমানুষী হয়নি? বাদল নিজেই একদিন ভ্রম স্বীকার করবে।'[২৯]

দীর্ঘদিন উজ্জয়িনীর কোন সংবাদ না পেলেও বাদলের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। বরং বাদলের বন্ধু সুধী উজ্জয়িনীর দিদির কাছে খোঁজ নিয়েছে, তাতে উজ্জয়িনীর দিদি কৌশম্বীর কাছে মনে হয় সুধীর জন্যই এতসব সমস্যা। তার বোনের বাড়ি ছাড়ার কারণ হয়তো এই সুধীই। সেকথা সুধীকে সে সেজাসুজিই বলেছে। এরপর উজ্জয়িনীর তীর্থযাত্রী হওয়ার সংবাদে সুধী মনে মনে আনন্দও পেতে থাকে। কোথায় যেন সে মন থেকে উজ্জয়িনীকে সমর্থন জানাতে থাকে। তাই সে উজ্জয়িনীর মঙ্গল কামনা করে। 'উজ্জয়িনী যেখানেই থাকুক বিশ্বপতির স্নেহ তাকে পরম যত্নে রক্ষা করছে, তাকে আহারের সময় আহার্য ও বিশ্রামের সময় আশ্রয় দিচ্ছে। উজ্জয়িনী ভক্তিমতী, ভক্তের প্রতি দায়িত্ব ভগবানের আপনার। সুধী কেন অকারণে উদ্বিগ্ন হয়ে চিত্তের প্রশান্তি বিপন্ন করবে?'[৩০]

উজ্জয়িনীর থেকেও বাদলকে নিয়ে সুধীর অনেক বেশি আশঙ্কা হতে থাকে। কারণ বাদল একরোখা গোঁয়ার প্রকৃতির। সেই সঙ্গে অনাবরত মস্তিস্ক চালনা ও তার আনুষাঙ্গিক অনিদ্রা মিলে বাদলের দেহের ও মনের স্বাস্থ্য হরণ করতে পারে। আর সেজন্যই সুধী স্যান্ডাউনে সারাদিন বাদলের অন্বেষণ করে ব্যর্থ হয়ে বাসায় ফেরে। কিন্তু তারপরেও বাদলকে খুঁজে বের করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। এই বাদলের অন্বেষণের সময়ই দেখা হয় মিস মার্স-এর সঙ্গে। যার বাড়িতে মাস তিনেক সে আশ্রিত ছিল— গত তিন দিন পূর্বেই সেই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। এই প্রসঙ্গে মিস মার্শ জানায়, তার ভারতে কাটানো জীবনের কিছু দগদগে স্মৃতির কথা। আসলে তার মুখ থেকেই জানতে পারি, একজন ইউরোপীয় দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির প্রতি মনোভাবের কথা। সে বলে, "কাথিয়াবাড়ে আমার কোলের ছেলেকে ফেলে এসেছি এগারো বছর আগে। তার বাপ ওদেশের একজন রাজা, মহাযুদ্ধের সময় লণ্ডনে তাকে দেখি ও মূঢ়ের মতো তার সঙ্গে পালিয়ে যাই। জানা ছিল না ওদেশের সমাজ কেমন। যে অপমান পেয়েছি তার ইতিহাস গেয়ে কী হবে? খেয়াল ছিল না যে হিন্দুদের আইনে ডিভোর্স নেই। আমাদের আইন অনুসারে রাজা আমাকে বিয়ে করতে পারেন না। তাঁর অন্য রানী ছিল। ভুল যা করলুম তার থেকে নিস্তারের আর কী উপায় ছিল— ছেলেকে তার জন্মভূমিতে রেখে চিরকালের

মতো চলে আসা ব্যতীত?"[৩১] এই ছেলের সংবাদ মিস মার্স সুধির কাছে জানতে চান— কোথায় আছে, কেমন আছে? রাজকুমারের মতো না অনাথ বালকের মতো।

বাদল ঘোড়ায় চড়ে আঘাতপ্রাপ্ত হলে আবারও বুড়ি মেলভিল ল্যান্ডলেডির অতিথি আপ্যায়ন ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়। 'বুড়ী মেলভিল বাদলের কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে দিল। পরের হাতে খেতে বাদলের বড় ভালো লাগে, বিশেষত সেই পর যদি নারী হয়! নানা ছলে সুধীদার হাতে খেয়েছে, বুড়ী মেলভিলের হাতেও তার এই প্রথম খাওয়া নয়। বুড়ীও এই বালক-প্রকৃতি তরুণটির এদেশে মা নেই বলে মমতায় বিগিলিত।'[৩২] এদিকে বাদল মিস মার্শ থেকে মিসেস উইলস ও মিসেস মেলভিল হয়ে এখন মিসেস গ্রেসের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু শেষটায় আশ্রয় জুটলেও আদর জুটল না। তার পরেও সে সিদ্ধান্ত নেয় "... আমি পার্লামেন্টে যাব, মিস্টার মারউড, আমি ইংলণ্ডের নেতৃত্বে পৃথিবীর সব নেশনকে সঙ্ঘবদ্ধ করব। প্রতিযোগিতার যুগান্তকারী আমি, সহযোগিতার ঋষি। আমরা সবাই মিলে দোহন করব পৃথিবীকে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে, হয়তো যেতেও পারি উড়ে আমরা মঙ্গলগ্রহে কি চন্দ্রে।..."[৩৩] বাদল এটাও প্রত্যক্ষ করে যে, কালো মানুষকে ইউরোপে কোন দৃষ্টিতে দেখে। সেখানকার মানুষেরা ভারতীয়দের বর্ণ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াও সে প্রত্যক্ষ করে। সেখানের একটি দোকানে হাজিরা দিতে দিতে বাদল কাজের লোক হয়ে ওঠে। সে মানুষের মতো কথা বলতে পারে শুনে একটি খুকী তার মাকে বলে, "O mummy, look, look, he can speak like a man." গরীবের ছেলেরা রাস্তায় খেলা করতে করতে রাস্তায় উঁকি মেরে পরস্পরকে আঙুল দিয়ে দেখায়— দ্যাখ, দ্যাখ, নিগার। এমনকি একদিন তাকে দোকান থেকে বেরতে দেখে একদল ছেলে তাকে পিছন পিছন অনুসরণ করতে থাকে। তারা চুপি চুপি বলাবলি করতে থাকে— "Hush, hush, he will eat you up."[৩৪]

কলঙ্কবতী (১৯৩৪):

'সত্যাসত্য' উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড 'কলঙ্কবতী'তে এই উপন্যাসের চরিত্রাবলির নামকরণ সম্পর্কে ভূমিকাংশে লেখক বলেছেন, 'চরিত্রদের নামকরণের সময় আমার অবচেতন মনে কাজ করেছিল বি. সি. সেন, আই. সি. এস. মহোদয়ের নাম। তাঁর পুরোনাম বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন। আমার নায়কের পুরো নাম বাদলচন্দ্র সেন। সংক্ষেপে বি. সি. সেন। সে হতে চায় বিলেতে গিয়ে পার্লামেন্টের মেম্বার। বি. সি. সেন, এম. পি।'

সুধীর যে বিলেতে গিয়ে বিলিতি ডিগ্রি অর্জন করবে না, তা সে অনেক আগেই স্থির করে নিয়েছিল। সে গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিলিতি কাপড় পুরে একবছর জেলে কাটিয়ে আর এক বছর গ্রামে গ্রামে ঘুরে সে কলেজে ফিরে এসেছে। আর ঠিক এমন সময় বাদলকে পেয়েছে বন্ধু হিসেবে। সুধী কলেজে ফিরে এলেও সে গান্ধিজির নির্দেশে গঠন কর্ম করে ও মনে প্রাণে সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হয়। তাই সে বি. এ. পাশ করার পর এম. এ. পড়তে চায় না, পাছে সত্যাগ্রহের আহ্বানে ব্যাঘাত ঘটে। পরিবর্তে সেই সময়টা সে ইউরোপ ঘুরে আসতে চায়, বিশেষ কোনও প্রয়োজনে নয়, জীবন দর্শনকে উদারতর করার জন্যে। সে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী নয়। স্বজাতির চেয়ে মানব জাতিকে সে বড় বলে মনে করে। আর ইউরোপ মানব-জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত। কিন্তু ইউরোপীয় ডিগ্রি চায় না। তাই সে কলেজের পরিবর্তে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়াশুনা করে।

'কলঙ্কবতী' পরিচ্ছেদে উজ্জয়িনীর কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। উজ্জয়িনীর বৈষ্ণব মনোভাবে সমর্পন ও আত্মনিবেদনকে আর বেশি করে ভাবালুতে তাকে পরিণত করে। "... তোমার গরবে গরবিনী আমি, রূপসী তোমার রূপে। আমার সেই গরব, সেই রূপ কি লুকিয়ে রাখা যায় গো! সে কি প্রচার না করে পারি! রসনা যে বিরহে বিরস হবে সখা। না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে।"[৩৫] এই সময়ে আসে তার পাতানো মাসিমা, যাকে অনুরোধ করে শ্বশুরসাহেব বাড়িতে কীর্তন করিয়েছিল। একদিকে বাড়িতে কীর্তন চলবে না বলে শ্বশুরের কড়া নির্দেশ, অন্যদিকে এইসময় তার পিতার মৃত্যু, তাকে গৃহত্যাগে নতুন করে উন্মাদনা জোগায়। তাই সে এবার কাঁচি দিয়ে কেশ কেটে, বাদলের বিয়ের ধুতি

পাঞ্জাবি চাদর পড়ে পুরুষের ছদ্মবেশে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়ে। বাড়ি থেকে বেড়িয়ে প্রথমে ট্রেনে চড়ে কানু আর বাবাকে নিয়ে মন টানাপড়েন শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত সে কানুর সাক্ষাৎ পেতে প্রথমে কাশী, পরে বৃন্দাবনের পথে গেলেন। ভাগ্যক্রমে সেখানে এক বাঙালি গৃহস্থের পরিবারে আশ্রয়ও পেল। একখানা ঘর, তিন টাকা মাসিক ভারা। সেখানে থাকতে থাকতে একদিন রাতে সে স্বপ্ন দেখল, কানু তার বস্ত্রহরণ করছে। স্বপ্ন ভেঙে সে দেখল কানু নয়, এক নরাধম পিশাচ তার ইজ্জত নষ্ট করতে চলেছে। তারপর অনেক চেষ্টা ও বুদ্ধি করে জঙ্গলের ভেতর নিজেকে রক্ষা করে বৃন্দাবনে ফিরে আসে কিন্তু আর গোবিনজীর মন্দিরে যায় না। এবার তার বৃন্দাবনের প্রতি মোহভঙ্গ হয় ও মানসিক উন্মাদনার অবসান ঘটে। এখন তার মনের মধ্যে কেবল সেই নরাধমকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার চিন্তা ঘুরতে থাকে।

ঠিক এমন সময় তার খোঁজে আসেন বিভূতি আর সুধী। উজ্জয়িনীকে সহজে পাওয়ার জন্য তারা বিলেত থেকে একটি বুলডগ এনেছে। সেই বুলডগটি বৃন্দাবনের রাস্তায় একটি বাঁদরকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে, কিছুতেই ছাড়ছে না। এই দৃশ্যের কথা উজ্জয়িনী শোনার পর সেও দৌড়ে যায় সেই স্থানে বাঁদর ও বুলডগকে উদ্ধার করতে। আর তখনই বিভূতি তার পরিচয় জানায়— "আমি বিভূতি। বহরমপুরের বিভূতিদা। সম্প্রতি বিলেত থেকে আসছি। এবার চিনেছ?"[৩৬] এরপর সুধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাদের কাছে বুলডগটি নিয়ে উজ্জয়িনী নিজের কাছে কয়েক দিনের জন্য রেখে দেয়, তার ধর্ষকের উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য। ধর্ষকের শাস্তি উজ্জয়িনী নিজের হাতে দেবার পর বুলডগটিকে বিভূতির কাছে ফেরত দেয় ও সুধীর সঙ্গে প্রথমে মায়ের কাছে কলকাতায় এবং পরে বিলেত রওনা হয়।

দুঃখমোচন (১৯৩৬):

দুঃখমোচনে বাদল বেড়িয়েছে বিশ্বের দুঃখ দূর করতে। সে ছিল বুদ্ধিবাদী, সংশয়বাদী, সে হঠাৎ সুলভ আধ্যাত্মবাদী ও মিস্টিক হয়েছে। এখন তার আর যুক্তির দ্বারা সমর্থন চলে না, অনুভূতির ওপর যার প্রতিষ্ঠা তার প্রতি বাদলের আকস্মিক টান। লেখক ঠাট্টা করে বলেছেন, তাকে বাদল না বলে মাদল বললেও ক্ষতি নেই, দেবকণ্ঠের মাদল। উজ্জয়িনী বলেছিল তার স্বামীর বিশ্বের

ভাবনা। আর এখানে দেখা যায়, বাদলের বিশ্ববাসীর দুঃখের ভাবনা। আজ বিশুদ্ধ মনন নাকি তাকে তৃপ্তি দেয় না। 'মানুষের দুঃখ যদি লেশমাত্র মোচন করতে পারি তবে আমার জীবন সার্থক!' কিন্তু দুঃখ দূর করতে বেড়িয়ে দুঃখ যে কী দুরূহ ও কী জটিল তা সে উপলব্ধি করতে পারে। সে বুঝতে পারে দুঃখমোচনের জন্য রাজনৈতিক পথ না বেছে মিস্টিক পথ বাছার ভুল। তবে মানুষের দুঃখমোচন করতে না পারলেও সেই অভিজ্ঞতা তাকে সমৃদ্ধ করে।

বাদল এবার সুধীর প্রেমিকা অশোকাকে তার জীবনাদর্শের কথা বলতে শুরু করেছেন। সে যে সুধী থেকে কোথায় কতটা আলাদা তা বোঝাতে সে বলে, "... আমি চাই ঝড়ের মতো মুহূর্তে সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করতে, আমারই আবর্তে মানবজাতিকে সুদ্ধ উড়িয়ে নিয়ে চলতে। আমি চাই বেঁচে থাকতে নয়, বাঁচতে।"[৩৭] সুধী চায় গ্রামে বাস করতে, সুধীর মতে প্রাণের রহস্য আছে গ্রামের কৌটোয়, রূপকথার ভ্রমরের মধ্যে। বাদলকে ইউরোপীয় কালচারের মত সঙ্গীতও নাড়া দিয়ে যায়, অশরীরী বেদনায় টনটন করে তার স্নায়ু। সে বলে, "কিন্তু এতেই বা যন্ত্রণা কম কোথায়? যন্ত্রের নয়, বোধ শক্তির? ইউরোপের সঙ্গীত কী জ্বালাময়! কী করুণ!"[৩৮] ইউরোপ বাদলকে নিরাশ করেছে, একথা দে সরকার জানালে বাদলকে বললে, সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানায়— "পাশ্চাত্য সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা। প্রাচ্য সভ্যতা বলে কোনও পদার্থ নেই। যা ভাবে ভাবুক সুধীদা।"

"প্রাচ্য সভ্যতা সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি একমত। প্রাচ্যের আছে অসাধারণ টিকে থাকবার সামর্থ্য। কিন্তু যৌবন নেই। তা বলে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বতঃপ্রমাণিত হয় না। এরাও জ্ঞানবৃদ্ধ, কিন্তু জ্ঞানী নয়। দু'দিনের জীবনকে যারা ফুলে ফলে ভরিয়ে নিতে জানে না, ভরিয়ে তোলে ঘৃণায় বিদ্বেষে ব্যস্ততায় ব্যসনে, তারা মূঢ়াদপি মূঢ়।"[৩৯] এতদিন পরে আমরা দেখি, সামান্য হলেও বাদল উজ্জয়িনীকে নিয়েও ভাবিত।

দে সরকারের কথাবার্তায় উঠে এসেছে ইউরোপ ও ভারতের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও কর্মসংস্থানের কথা। সে নিজে বিলেতে পালিয়ে এসে ডিগ্রি অর্জন করেছে। যদিও এই ডিগ্রিওয়ালা অনেকে দেশে বেকার। দেশে ফিরে সেও বেকারদলকে পুষ্ট করার ভয়ে দেশে ফেরার আশা সে জলাঞ্জলি দিয়েছে। এর থেকে তার মনে হয়েছে একেবারে বিলেতে না এসে

দেশে বেকার থাকা ভাল। তারাপদ উদ্যোগী পুরুষ সিংহ। আই-এ ফেল করে মামার সিন্দুক ভেঙে প্রথমে আমেরিকায় যায়। সেখানে চার বছর থেকে সর্ববিদ্যায়-সিদ্ধ হয়ে মহাবিদ্যার কলঙ্ক মোচন করবে। আর এই মহাবিদ্যার দরুণ তার মামা তাকে মার্জনা করে লেখেন, 'এবার বিলাতি ডিগ্রী নিয়ে ঘরে ফেরো, খরচ আমিই না হয় দেব।' আটলান্টিক ডিঙিয়ে তারাপদ লন্ডনে এসে অবতীর্ণ হয়ে মাসখানেকের মধ্যে একটি দলপতি হয়ে উঠল।

মায়ের সঙ্গে বিলেতে গিয়ে পড়াশোনা করে বেড়ে উঠলেও ভারতের প্রতি অশোকার টান সবসময়ই ছিল। তাই দেশে ফেরার জন্য শুধু সে মাকে বলেই ক্ষান্ত থাকেনি, প্রয়োজনে সে শরীরে অসুখ বাঁধিয়েও দেশে ফিরতে চায়। কিন্তু এই বিলেত ফেরতদের সম্বন্ধে দেশের মানুষের তথা সমাজের বিধিনিষেধের কোপে পড়তে হত। তার উদাহরণ স্বয়ং সুধী, সে বিলেত থেকে তার মামার বাড়িতে দেখা করতে গেলে তা বুঝতে পারে। সে ঘটনার বিবরণ দিয়ে অশোকাকে চিঠি লিখেছে, "মামার ওখানে প্রণাম করতে গেলুম। মামা মামী ও মামাতো ভাইবোনেরা আমাকে নিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, আমি প্রায়শ্চিত্ত না করলে আমাকে কী করে সঙ্গে বসিয়ে খাওয়ান, অথচ আলাদা আসন দিলে হয়তো আমি বেঁকে বসতে পারি। আমি যে নিষিদ্ধ মাংস খাইনি তা আমি শপথ করে বললেও যাঁদের বিশ্বাস হবে না, কেবল আমার মুখ চেয়ে মেনে নেবেন মাত্র। অতএব আমি ও বাড়ীতে অনর্থক বিলম্ব করে তাঁদের পরীক্ষায় ফেললুম না, একটু মিষ্টি মুখ করে মুঙ্গের মুখো হলুম।"[৪০] বিলেতে ফিরে সুধী অশোকার পরিবর্তন লক্ষ্য করে। সুধীর চোখে পড়ল, অশোকা এই কয়মাসে অশোকপুষ্পের মতো বিকশিত হয়েছে। অগ্নিশিখার মতো উর্ধ্বগতি, কেতকীর মতে একাগ্র, বেতসের মতো দৃপ্ত। ঝর্ণার মতো অনর্গল, জ্যোৎস্নার মতো সাহস। প্রজাপতির মতো ভঙ্গিমাময়, অশ্বিনীর মতো অধীর।

এরপর আসে ফরাসী বিপ্লবের কথা। সুধীর জার্মান শেখার প্রসঙ্গ। বিভূতিভূষণ আই. সি. এস. পাশ করেও এখন আইন পড়ছে, আবার দে সরকার স্কুল অফ ইকনমিকসের সুবৃহৎ লাইব্রেরিতে পুঁথি নাড়াচাড়া করছে ডকটর হবার স্পর্ধায়।

সুধী বাদলের স্ত্রী অর্থাৎ উজ্জয়িনীকে বিলেতে নিয়ে এলেও বাদলের সম্মুখে উজ্জয়িনী দাঁড়াতে লজ্জা বোধ করে, নিজের অসহয়তার জন্য। কেবলই তার মনে হতে থাকে বাদলের কাছে অধিকার না কামনা কী নিয়ে দাঁড়াবে। কামনা হলে কী লজ্জা! অন্যদিকে, সুধী যুক্তি দেয় 'উজ্জয়িনী, তুমি হবে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তুমি হবে সহধর্মিণী। ... এর নাম আত্মবলি নয়, ... এ হচ্ছে প্রিয়জনের জন্য অকুণ্ঠিত প্রিয়কৃত্য, এর দরুন নিজের যে অসুবিধা তা উপেক্ষা করতেই ভালো লাগে, যেমন নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন করবার সময় নিজের উদরের তাগিদ।'[৪১] শেষ পর্যন্ত উজ্জয়িনী কয়েকদিন পর সুধীকে আপনা থেকে জানায় সে বাদলের সান্নিধ্যে যেতে চায় তাকে পরিচর্যা করার জন্য, তাকে বই পড়ে শোনাবার জন্য, চিঠি টাইপ করার জন্য, ফাইফরমাশ খাটবার জন্য। এদিকে বাদল পূর্বের আশ্রয় থেকে মিস স্ট্যানহোপের আশ্রমে আশ্রয় নেয়— এই সংবাদ দে সরকার উজ্জয়িনীকে জানালে উজ্জয়িনী বিষম আঘাত পায়। সে ভাবতে থাকে বাদলের কি নারীতে আপত্তি নাকি স্ত্রীতে। এর একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। আবার বাদল যখন উজ্জয়িনীর পিতার মৃত্যুর সমবেদনা জানায়, তখন বাদলের প্রতি কৃতজ্ঞায় মাটিতে লুটিয়ে পড়তে চায়। সে নিজে ভাবতে থাকে তার মন কত ছোট। আসলে সামান্যতম সহানুভূতি, সঙ্গসুখ মন থেকে সে স্বামীর কাছে চেয়েছিল— কিন্তু বাদল তার স্ত্রীত্বকে মর্যাদা না দিয়ে বিশ্বকে দেখতে চেয়েছে, ফলে স্ত্রী থেকে গেছে চিরকালে উপেক্ষিতা সবদিক থেকেই। বাদলের এরকম ব্যবহারে এরজন্য উজ্জয়িনী একসময় মিস স্ট্যানহোপকে সন্দেহ করত। কিন্তু পরে স্পষ্ট বুঝতে পারে আসলে বাদলের প্রকৃতিই অমন।

কলঙ্কবতী ও দুঃখমোচন দুটি খণ্ডের ভাবগত প্রধান হল সুধীর। মানুষটি স্বভাব সম্পূর্ণ, প্রিয়ব্রতী, অন্যের কল্যানকামী। যে কখনও ত্রাতা, কখনও বন্ধু, কখনও প্রেমিক এবং সর্বদাই লক্ষ্যে ও উপায়ে উভয়ত জীবনশিল্পী। নিখুঁত, নিটোল অনবদ্য। তার লাবণ্য স্নিগ্ধ নয়, শিশিরসিক্ত। সুধীকে অশোকা তার পড়ার কথা জানতে চাইলে সে জানায়, "পড়ি আমার যা পড়তে মন যায়। দর্শন, সাহিত্য, একটু আধটু বিজ্ঞান! কলেজ পড়িনে, পড়ি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরীতে।"[৪২] সেই সুধী এবার নিজের জীবনের কথা, ফেলে আসা গান্ধীবাদী আদর্শের কথা ও ভবিষ্যতের কথা নিয়ে ভাবতে থাকে। জমির বর্গাদার, চাষীর উপযুক্ত ব্যবস্থা—

স্বদেশী চিন্তা— মিলের কাপড় বনাম খদ্দর কাপড় ইত্যাদি। মনে পড়ে ভারতের অসহায় কারুশিল্পীদের কথা— তাঁতি, কুমোর, কামার, ছুতোর কাঁসারি, মুচি— ইত্যাদি স্বদেশী চিন্তা। তার চিন্তায় আসে ইউরোপ ও ভারতের ঐশ্বর্যের তুলনা। আর এই স্বাদেশিকতার জন্যই সুধীর বিলেতি সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব সদাজাগ্রত। এদিকে সুধীর প্রেমিকা অশোকা সুধীকে চাইলেও আশোকাকে চাইত স্নেহময়। এই নিয়েও সুধীকে ভাবায়। ইউরোপের কলকারখানার সঙ্গে আমাদের দেশের সংস্কৃতি বিশেষত গ্রাম্য-সংস্কৃতিকে আবারও মনে মনে শ্রদ্ধা জানায়।

উজ্জয়িনী এবার সুধীর কল্যাণময় তথ্যের বিরোধিতা করতে শুরু করে। কারণ হিসেবে বলে নারীর স্বাধীনতা নেই কেন? নারীকে তার ভালবাসার কথা না জেনেই দেশে ও বিদেশে বিয়ে দেওয়া ও সন্তানের জননী হতে বাধ্য করায় কেন? ইত্যাদি।

মর্ত্যের স্বর্গ (১৯৪০):

অন্নদাশঙ্কর তাঁর রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় বলেছেন, 'পাপ পুণ্য, স্বর্গ নরক সম্বন্ধে প্রাচীনদের বিশ্বাস আধুনিকদের কাছে যুক্তিসহ নয়। আধুনিকরা সাধারণত সংশয়ান্বিত। কেউ কেউ সংশয়বাদী। আমিও ক্রমে ক্রমে সংশয়ান্বিত হই। যুগটা বিশ্বাসের পরিবর্তে মতবাদের। ইডিওলজির। মতভেদ থাকলেও সোশিয়ালিস্ট, কমিউনিস্ট, গান্ধিপন্থী প্রভৃতি সকলেই চান মর্তভূমিতেই স্বর্গ গড়ে তুলতে।' উপন্যাসের এই খণ্ডে বাদলের সত্যান্বেষণের প্রয়াসের সমাপ্ত হয়। বাদলের বহু বিশ্বাস একে একে যায়, এখানে যায় তার রাজনৈতিক বিশ্বাস।

এই খণ্ডে এসে আমরা দেখি, উজ্জয়িনী ও তার মা অনেক বেশি স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে থাকে। উজ্জয়িনীর মা সুজাতা গুপ্ত প্রায় প্রতিদিনই নেমন্তন্নে যান, ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা হয়ে যায়। এদিকে উজ্জয়িনীও কোনো দিন থিয়েটারে, কোনো দিন সিনেমায় আবার কোনোদিন বা নাচের আসরে যায়।

সুধীর প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল সে ইউরোপে গিয়ে দুই বছর কাটিয়ে ফিরে এসে সোজা গ্রামে গিয়ে বিষয় সম্পত্তি বুঝে নিয়ে সংসার জীবনে প্রবেশ করবে। তার 'প্রথম কাজ জীবনের জন্যে মনের বনিয়াদ গভীর করা, ভিতরের ভিত্তি গাঁথা। দ্বিতীয় কাজ জীবনবরণ।'[৪৩] কারণ

আধুনিক জীবন তার কাছে অকল্পনীয় ও জটিল। সেই জট খুলতেই তার যৌবনের চার বছর কেটে যায়। তার সিদ্ধান্ত ছিল বি. এ.-র পরেই কলেজ ছেড়ে কাজে নামবে। তারপর বাদলেরই আগ্রহে ইউরোপে দু-বছর প্রবাস কাটাবে। কারণ তার মতে, 'পশ্চিম থেকে না দেখলে দেশকে পুরোপুরি চেনা যায় না এবং আধুনিক জীবনের গ্রন্থি যেখানে জটিলতম গ্রন্থিমোচনের গ্রন্থপঠন সেইখানেই প্রকৃষ্ট। ইউরোপে এসে সুধী বাদলেরই খাতিরে ইংলণ্ডে বাস করল, বাদলেরই টানে লণ্ডনে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিখ্যাত পাঠাগারে দেশবিদেশের অসংখ্য পাঠকের মধ্যে এই ভারতীয় খনিক দিনের পর দিন জ্ঞানের খনিজ আহরণ করল। ... প্রবাসে মানুষের দেশবোধ তীব্র ও দেশদৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। সুধীরও তাই হয়েছিল। দেশ তার চোখে নতুন ঠেকল, দেশের মতিও সে যেন এই প্রথম আবিষ্কার করল।'[৪৪] সুধী ইংলন্ডের ইতিহাস, ইউরোপের ইতিহাস পড়ে। রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি ঘেঁটে দেখে আর সুযোগ পেলে ভাবুকদের সঙ্গে কথা বলে। তার মনে হয় ভারতের সমস্যা সৃষ্টিছাড়া নয়, অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনীয় ও সংশ্লিষ্ট। সুধী ভারতের পটভূমিকায় পৃথিবীকে দেখতে চায়। আসে মহাযুদ্ধের প্রসঙ্গ, ভারতীয়দের ইংরেজদের সাহায্য করা নিয়ে যৌক্তিকতার প্রশ্ন, সুধীর গান্ধীর অহিংস ও সংশয় নিয়ে কথা। "গান্ধীজীর অহিংসবাদ সম্বন্ধে। ওর মূল্য আছে নিশ্চয়, কিন্তু ও জিনিস স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, ওর সম্পূর্ণতা ন্যায়সাপেক্ষ।"[৪৫] অন্যদিকে, ইংল্যান্ডে বসবাসকারী ব্লিজার্ডের ছেলে জন সুধীকে জানায়— "আশা করি ইংলণ্ডের উপর বীতশ্রদ্ধ হননি। কিন্তু সাধারণ ইংরাজের অসহায়তা আপনাদের চেয়ে কম নয়, এদেশের শাসক শ্রেণী আপনাদেরও শাসক আমাদেরও শাসক। আপনারা ভাগ্যবান, আপনারা বিদ্রোহ করতে পারেন, আমাদের সে স্বাধীনতাও নেই। আজ রাশিয়ার জুজু, কাল জার্মানীর জুজু এইরকম জুজুর পর জুজু আমাদের ঘুমপাড়ানী মাসিপিসির ইচ্ছামতো আমাদের ঘুম পাড়ায়।"[৪৬]

উজ্জয়িনী বিলেতের আবহাওয়ায় এসে নিজেকে খুব হাল্কা বোধ করছে। প্রথমে সে ইংলন্ডের মেয়েগুলোর ধরন দেখে তার গা জ্বলতে থাকে। তখন তার জানতে কৌতূহল হয় এরা 'মেয়ে না মর্দ্দা'। কিন্তু কিছুদিন পরেই, সে ইংরেজ মেয়েদের মতই এখন ব্যাগে আয়না রাখে, পথে ঘাটে লুকিয়ে মুখ দেখে। স্টেশনে কি অন্য কোথাও বড় আয়না দেখতে পেলে সেকেন্ডের

জন্য দাঁড়ায়, নিজেকে একঝলক দেখে নেয়। তার শাড়ি সংক্ষেপ হয়েছে, ঘোড়ায় চড়েছে, বরফের মরশুমে স্কেট করতে চলবে, নাচের জন্য ফ্রক পড়বে কিনা— এই নিয়ে তার অমীমাংসিত সমস্যা। সে কেবল বাড়িই ছাড়েনি, মনে মনে সে এখন স্বামী বাদলকেও ছেড়েছে। এখন তার ইংরেজ বান্ধবীদের দিকে দেখলে নিজেরই উপর অবজ্ঞা জন্মায়। তারা কেমন স্বাস্থ্যবান, সতেজ, কেমন আত্মনির্ভর, স্বাবলম্বী। তুচ্ছ মান-অভিমানে তাদের জীবন বিরস নয়। পুরুষের খুশির উপড় তাদের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে না— পুরুষ তাদের জীবনে থাকলেও পারে, না থাকলেও পারে। এই নিয়ে তারা সাধেও না, কাঁদেও না। তার মনে হয় 'শোষণ এবং সেবা ছেড়ে শাসন এবং প্রজারঞ্জন, এই হবে নারীধর্ম।'[৪৭] তাই সে এখন রাত জেগে তাস খেলে, রাতে বিছানায় শুয়ে ডিটেকটিভ নভেল পড়ে। কিন্তু উজ্জয়িনীর এই স্বামী বিষয়ক এখনকার মতকে দে সরকার কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

রবিবারে লন্ডন শহরের জনস্রোত ও সেখানকার রাজা-উজির থেকে গরিবদুঃখী-ভিখারি সকলের নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখে উজ্জয়িনীর দেশের রাজপথের কথা, সেখানকার বিশৃঙ্খল জনতার কথা মনে পড়ে। এরপর উজ্জয়িনীর সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে কথা ওঠে মেয়েদের স্বাধীনতা থেকে যুদ্ধ, জেলে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা— স্বাজাত্যবোধ ইত্যাদি। উজ্জয়িনীর মনে হয়— "আমরা যে পরাধীন জাতি তার একটা প্রধান কারণ আমরা পরের কাছে পরীক্ষা দিতে অদ্বিতীয়। এই যে এত ছেলে বিলেত এসেছে এদের প্রায় প্রত্যেকের ভাবনা কী করে ইংরেজের মতো নিখুঁৎ উচ্চারণ করবে, নিখুঁৎ পোশাক পরবে, নিখুঁৎ ছুরিকাঁটা চালাবে। একটু খুঁৎ ঘটলে এমন এক ক্ষমাকাতর ভাব দেখায় যে কী একটা অমার্জনীয় অপরাধ করেছে। যেন সভ্যতার পরীক্ষায় ফেল!"[৪৮] উজ্জয়িনী ও ক্রিস্টিনের আলোচনায় উঠে আসে লেবার পার্টির কথা, ভারতের স্বরাজ সংগ্রামের কথা, নারীর ভোটাধিকারের কথা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ। ক্রিস্টিন উজ্জয়িনীকে জানায় তার শ্বশুর বিশ্বযুদ্ধের আগে বড়ো লোকের মতোই ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় সেই বিপর্যয় হয়, তারপরে আর সুদিন আসেনি। ব্যক্তি ইংরেজ আর জাতি ইংরেজ যে এক নয় তা আমরা ললিতার কথায় দেখতে পাই। "যে কয়জন ইংরেজের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সকলেইতো ভালো, ব্যক্তি হিসেবে তাঁদের একটুও দোষ নেই। অথচ জাতি হিসাবে ইংরেজ আমাদের স্বাধীন হতে দিচ্ছে না।"[৪৯]

এদিকে বাদল এবার তারাপদ-র দ্বারা মার্ক্সবাদে আস্থাশীল হয়ে শোষিতদের দৈনন্দিন সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে চায়। শ্রমিকের স্বার্থই এখন তার একমাত্র মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। সে কমিউনিজমের কাছে আশা করে মানবের দুঃখ মোচনের। তার মতে, “কমিউনিজম হবে এমন এক ব্যবস্থা যায় দৌলতে উৎপাদন সহস্রগুণ বাড়বে, অথচ মুনাফা কারো পকেটে যাবে না। বন্টন প্রয়োজন অনুসারে হবে। কেউ বেকার থাকবে না, কেউ অভুক্ত থাকবে না, সকলের সুচিকিৎসা জুটবে।”[৫০] এরপর আমরা দেখতে পাই, বাদলের বার বার রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তন। “বাদলের এখানে দিনে দু-খানা করে ইস্তাহার জারি হয়। তাতে থাকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষণ, কমিউনিজমের অবশ্যম্ভাবিতা, লেবার পার্টির কুৎসা, টেরি পার্টির মুণ্ডপাত, লিবারল পার্টিকে উপহাস। সেসব ইস্তাহার ঘুরে ফিরে বাদলের হাতে আসে, তার স্বাক্ষর না হলে চলবে না। বাদল দ্বিধায় পড়ে।”[৫১]

উজ্জয়িনী এবার বিলেত ছেড়ে আমেরিকা যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিতে থাকে। সেই সময় দে সরকার উজ্জয়িনীকে পরামর্শ দেন সে যেন ফরাসি জাহাজ-এ ওঠে। কারণ ফরাসিরা ভালো রাঁধে, পানও করায় ভালো করে। এতে উজ্জয়িনীর মা সম্মতি দেয় না, এ নিয়ে মা-মেয়েতে মনোমালিন্য হয়, কিন্তু উজ্জয়িনী তাতেও অবিচল থাকে নিজের সিদ্ধান্তে। সুধীর চেষ্টায় বাদলের সঙ্গে আবারও উজ্জয়িনীর কথা হলে সে স্পষ্টত জানায় “মুক্তিদান চাইনে। আমার যেদিন প্রয়োজন হবে সেদিন আমি আপনি মুক্ত হব। আমার কাছে মুক্তি আপাতত মুখ্য নয়। আমি চাই য়্যাকশন, আমি আমার নারীবাহিনী নিয়ে সংগ্রাম করতে চাই। আমার ব্যক্তিগত জীবন কোথায় তলিয়ে গেছে! হয়তো দশ বছর পরে ভেসে উঠবে। হয়তো তার আগে আমার মরণ হবে।[৫২] উজ্জয়িনী স্বপ্ন দেখে নারীবাহিনী গঠন করার। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র দেবে– ভারতকে স্বাধীন করতে, নারীকে স্বাধীন করতে। এবিষয়ে নারীবাহিনীর একটা কাজের তালিকা প্রস্তুত করে। যেখানে ধর্ষক, বিশ্বাসঘাতক, শাসক ও শোষকের দমনের কথা বলেছে।

সুধীর সঙ্গে মিটেল হলৎসারের কথাবার্তায় আসে দেশে ও ইংল্যান্ডে শিল্পের প্রসঙ্গ। আমাদের দেশের শিল্পকে আরও জোরে চালনা করা উচিত। কারণ আমাদের দেশ এখনো পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে আছে। যে-কোনো মূল্যে শিল্পকে টিকিয়ে রাখতেই হবে। সুধী জানায় সে মনে করে "আমাদের শত্রুতা যন্ত্রপাতির সঙ্গে, ক্যাপিটালের সঙ্গে, mass production-এর সঙ্গে। ওসব জিনিস বিদেশী হলেও শত্রু, স্বদেশী হলেও শত্রু। আমাদের মিত্র made in the village."[৫৩] সুধীর প্রেমিকা অশোকা সুধীকে অনুরোধ করে সে যেন সামনের সেশনে পি এইচডি ডিগ্রিতে ভর্তি হয়। তা না হলে তার মায়ের মনোনীত পাত্র স্নেহময়কে সে বিয়ে করতে বাধ্য হবে। এ বিষয়ে সুধীর কাছে কথা চাইলে সুধী কথা দিতে পারে না। পরিবর্তে তার মায়ের দেওয়া হাতের নোয়া দিয়ে তাকে রানির মতো প্রণাম করে তখনকার মতো চলে যায়। কিন্তু ফিরে গেলেও উজ্জয়িনী মনে মনে আশা করতে থাকে সুধীর চিঠি। সুধী চিঠি লেখে না, কিন্তু মায়ের মনোনীত স্নেহময়কেও মন থেকে মেনে নিতে পারে না। ফলে অশোকা তীব্র মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে নিজে নিজে।

অপসরণ (১৯৩৩):

অশোকা জ্বলতে থাকে স্বকল্পিত প্রত্যাখ্যানের জ্বালায়। 'ছি ছি। কী অপমান! কেনই বা সে উপযাচিকা হয়ে এত কাল সুধীর পায়ে পায়ে ঘুরল। মেয়েরা কি কখনো উপযাচিকা হয়? উপযাচক হয় পুরুষে। ছি ছি। পুরুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যান! 'ইহার চেয়ে মরণ ভালো।"[৫৪] অশোকা ভাবতে থাকে তার অতীত জীবনের কথা। তার বাবা কলকাতায়। মা কেবলমাত্র তাদেরকে পড়াশোনার জন্য বিলেতে প্রবাসী। মা ভবিষ্যৎ কোন আপদে-বিপদে পরতে পারে সেজন্য তিনি দেশি-বিদেশি একাধিক মানুষকে মাসে মাসে পার্টি দিতেন। এমনই এক পার্টিতে পরিচয় হয় সুধীর সঙ্গে। কিন্তু তার মা আজ পর্যন্ত এবিষয়ে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানেন না। আর জানলে নিশ্চয়ই বাধা দিতেন। কেননা স্নেহময়ের সঙ্গে সুধীর তুলনাই হয় না। সুধীকে নিয়ে অশোকার একাধিক চিন্তা আসতে থাকে; সুধী কি তাকে সত্যিই ভালোবাসে, সুধীর পাষাণ নাকি? না কি সুধীর অন্য কোন পরিকল্পনা আছে ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত অশোকা একরকম ভাবে স্নেহময়কেই

গ্রহণ করার জন্য মনকে প্রস্তুত করতে থাকে। বাদলের শরীর খারাপ হলে উজ্জয়িনীকে চিঠি লিখে ফিরে আসতে বলে, আবার স্বামীর দেখাশুনার দায়িত্ব নিতে বলে সুধীকে। এবার উজ্জয়িনী জানায়, "আমার জীবন আমার একার। এ জীবন আমি যাকে খুশি উপহার দেব। তুমি শুনে অবাক হবে যে আমি তাঁর পদস্খলন প্রার্থনা করি। তা হলে আমি সেই অজুহাতে ডির্ভোস আদায় করে নেব। না, আমি যাব না লণ্ডনে! যা করবার তা তুমিই কোরো, তিনি তোমারই বন্ধু। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছি।"[৫৫] এই অভিমান অবশ্য উজ্জয়িনীর বেশি দিন থাকেনি। সে লন্ডনে ফিরে আসে। সে এবার বাস্তবিকই সঙ্গ সুখ চায়, অনেকটা সরল যুক্তিতেই। সে জানায়, 'আমি তোমার মানসী নারী নই। আমি মানবী। বাদলকে একদা আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি, কার্পণ্য করিনি। সে ভালোবাসা আজ নেই, এ কি আমার অপরাধ! এখন যাকে ভালোবাসি তাকে কোনো দিন ভালোবাসতে চাইনি, কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই আমার প্রিয়। এ কি আমার অপরাধ ! আমার এইটুকু জীবনে আমি অনেক আঘাত পেয়েছি, যাতে নতুন আঘাত না পেতে হয় সেইজন্য আমি প্রতিদানের প্রত্যাশাও ছেড়েছি। আছে কেবল একটি দুর্বলতা— একটুখানি সঙ্গতৃষা...।'[৫৬] আর এজন্যই সে বাদলের কাছে ডির্ভোস চায়। উজ্জয়িনী সুধীকেই বেশি ভরসা করে। তাই একসময় উজ্জয়িনী ও সুধী একই ঘরে ভাড়া থাকতে চায়, কিন্তু তাতে সুধী আপত্তি জানায়। তার মতে সমাজ আছে, আর তা ছাড়া উজ্জয়িনীর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা বিষয়টিকে ভালোভাবে মেনে নাও নিতে পারেন।

শেষপর্যন্ত আমরা দেখি, সুধী বাদলের মতো ইংলন্ডকে গ্রহণ করেনি, কিন্তু স্বদেশের মতো ভালোবেসেছে। এদেশের প্রকৃতি যেমন, তার কাছে এদেশের মানুষও তেমন— দুই তার কাছে আপন; কাকে বেশি পছন্দ করে প্রকৃতি না মানুষকে, তা সে বলতে পারে না। কিন্তু কাউকেই ছাড়তে চায় না। ইংলন্ড থেকে বিদায়ের দুঃখ থেকেও তার বড় দুঃখ বিদায়ের পর সেই ইংলন্ডের সঙ্গে সংঘর্ষ। এত ভালোবাসা, এত সদ্ব্যবহার, আতিথ্য, আলাপ, সম্পর্ক স্থাপন, দিদি বলে ডাকা— সংঘাতের দিনে এসব থাকবে কোথায়?

ইংরেজরা সব বিষয়ে ভারতীয়দের তুলনায় অনেক বেশি ওয়াকিবহাল। আমাদের দেশের মানুষেরা যেমন প্রকৃতির সম্পর্কে উদাসীন, বিলেত ঠিক তেমন নয়। ইউরোপের মানুষ পশুপাখি শিকার করে বলেই তাদের খবর রাখে, চেনে ও যত্ন করে। আর আমরা অহিংস বলে উদাসীন।

এদিকে বাদল দিনের পর দিন খোলা আকাশের টেমস নদীর চড়ে থেকে একসময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন 'সুধী নিজেই বাদলকে রেঁধে খাওয়ায়, মাসাজ করে, চব্বিশ ঘন্টা চোখে চোখে রাখে। ফাঁক পেলেই বাদলের সঙ্গে বাগানে বসে, ... সুধী সাহায্য করে।'[৫৭]

একেবারে উপন্যাসের শেষে এসে আমরা দেখতে পাই, বাদল ও উজ্জয়িনী একই বিছানায় পাশাপাশি ঘুমায়। উজ্জয়িনীকে দেখলে এখন আর বালিকা সুলভ মনে হয় না। এখন মনে হয় পূর্ণ যুবতী। সে এখন ধীর, স্থির, শান্ত, সমাহিত সহিষ্ণু। বাদলের জন্য সেও কম চিন্তিত নয়। আজ তার মায়া, মমতা দরদ বিনয় সবই তার স্বভাবে বিকশিত হয়েছে। অথচ যে গুণ না থাকলে সমস্ত গুণ না থাকার সমান হয়, সেই গুণটি নেই। নেই তার সতীত্ব। সুধী অবশ্য তার জন্যে প্রার্থনা করে।

দে সরকার উজ্জয়িনীর প্রতি আকৃষ্ট, উজ্জয়িনী তাতে সম্মতিও জানিয়েছে। কিন্তু উজ্জয়িনী সাফ জানিয়ে দেয় সে ঘর করবে না, মাও হতে পারবে না। শুধু "দেশের কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করবে, আমিও মাঝে মাঝে দেখা করতে যাব তবে তোমার আশ্রমে না আস্তানায়। তুমি যদি আমাদের মিলতে না দাও তবে সে বৈষ্ণবী হয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবে, আর আমি যদি পারি তো তার সহচর হব।"[৫৮]

শেষ পর্যন্ত বাদলের জীবনের ভবিষ্যৎ হয়ে দাঁড়ায় 'বিলিতী ডিগ্রী নেই, প্রোফেসারি জুটবে না। তা হলে বাকি থাকে সম্পাদক, মাস্টারি ও ডেপুটিগিরি, যদি না আসছে বছর পাস করে ব্যারিস্টারি। আই সি এস'-এর বয়স নেই, বোধ হয় ডেপুটিগিরির বয়সও উত্তীর্ণপ্রায়। বাদলের জন্যে সুধী উদ্বিগ্ন হয়। High thinking বেশ ভালো কথা, কিন্তু plain livingএরও একটা ব্যবস্থা চাই।'[৫৯]

উজ্জয়িনী বাদলকে জানায় সে একজনকে ভালোবাসে। আসলে এটা যেন উজ্জয়িনীর বাদলের প্রতি নিঃশব্দে প্রতিবাদ, বাদলের উজ্জয়িনীকে সঙ্গ না দেওয়ার, মর্যাদা না দেওয়ার। এরপর বাদলের আদর্শ কমরেড জেসী মারা যাওয়ার খবর পায় সেই সুধীর কাছে। কিন্তু তাতে বাদলের বিশ্বাস হয় না। সে চেঁচিয়ে বলে "মিথ্যে কথা। জেসী কখনো চলে যেতে পারে না। ..."[৬০] বাদলও শেষ পর্যন্ত বিকারগ্রস্থ হয়ে পিতার আগমনকালেই ইহজগৎ ছেড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আর উজ্জয়িনী কুমারের জন্য নয় স্বামী বাদলের জন্যই বিকল হয়ে কাঁদতে থাকে। এইসবের মধ্যে ছয়টি খণ্ডে 'সত্যাসত্য' মহাকাব্যোচিত উপন্যাসটি সমাপ্ত সমাপ্ত হয়েছে।

অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবন চেতনায় সাংস্কৃতিক প্রবাহ বিদ্যমান। উজ্জ্বয়িনী বিলেতে থাকা স্বামী বাদল সেনকে উপলক্ষ্য করে স্বামীবন্ধু সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লেখে— "পশ্চিমের মেয়েদের সম্বন্ধে উল্টো পাল্টা কত কথাই না শুনি। কোনোটাই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। আমার জানাশুনার মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা এত বেশী আমাদের মতো যে তাঁরা কী পরেন ও কী খান সেই প্রমাণের উপর তাঁদের সরাসরি রায় দেওয়া যায় না। বিচার করবই বা কেন ? পারি তো ভালোবাসব। না পাড়ি তো ছায়া মাড়াব না। আমার বাবারও এই মত। মিস্টার সেন কী বলেন জানতে ইচ্ছা করে। মিস্টার সেন গোঁড়া ইংরেজ বলে জানি। তাই জানতে ইচ্ছা করে তিনি কি তাঁর স্বজাতীয়দের প্রতি পক্ষপাতিত্বশত আমাদের মতো বিজাতীয়দের প্রতি বিমুখ? তাঁর বান্ধবীদেরকে আমার প্রণাম জানাবেন কি?"[৬১]

বাদল ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে সত্যের পরিচয়ের বিপরীতে ইংল্যণ্ডের দৃষ্টিতে সত্যকে জানার চেষ্টা করেছে। তাই সে উজ্জ্বয়িনীর পতিব্রতকে প্রশ্রয় দিতে চায়নি। বাদল বলেছে— "তুমি ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে সত্যের পরিচয় নেবে, ঠিক করেছ। ওর বিপরীত হচ্ছে ইংল্যান্ডের দৃষ্টি। ইংরেজের চোখে জীবনকে কেমন দেখায় তাই জানবার জন্যে আমার ইংরেজ হওয়া। নইলে তুমি কি মনে কর, সুধীদা, যে ইংরেজী পোশাক ও ইংরেজী চালের প্রতি vulgar অনুরাগবশত আমি বিলিতি বাঁদর সেজেছি? ... ওসব মেয়েলি বাংলা চিঠি পড়বার সময় বা শখ নেই আমার। জবাব যখন লিখতে পারব না তখন শুধু পড়েই বা করব কী! একটা কথা তোমাকে বলি, সুধীদা; আমি ওঁর পাতিব্রতেকে প্রশ্রয় দিতে চাইনে। বরঞ্চ উনি আমার উপর

রাগ করে আমাকে ত্যাগ করুন ও ভুলুন এই আমার মনোবাঞ্ছা।"[৬২] তার মতে দেশের মাটিতে অবাধে সিগারেট, মদ সেবন বা খাওয়া বাঙালিদের পক্ষ্যে অসুবিধাজনক। আর যদি ইউরোপ হয় তাহলে সেটা জীবনেরই একটা ধরণ। বাদল তাই মনে প্রাণে এখানেও ইউরোপীয়। দে সরকার বাদলকে সিগারেট খেতে বারণ করলে বাদল ইউরোপীয় সংস্কৃতির দিক থেকে বোঝাতে চেষ্টা করে। সে বলে— "ইউরোপে এতদিন আছি কাঁদতে কাউকে দেখিনি কান্নাটা এঁদের ধাত বিরুদ্ধ।"[৬৩] এরই ফলশ্রুতিতে ইংরেজ বন্ধু কলিন্সের চরিত্র বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের নায়ক বাদল বলেছে— "এই যে ইংরেজ, এর মতো হতে পারবে কি? এরই মতো প্রাণপূর্ণ অথচ মৃত্যুভয়শূন্য। একদিন কলিন্স বলেছিল— যুদ্ধ? আবার বাধুক না। ভয় কি? সে সুযোগে এরোপ্লেন চালানো শিখে নেওয়া যাবে। দেশও দেখা হয়ে যাবে বিস্তর।"[৬৪]

আসলে 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে লেখক প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক যুগের প্রায় সমস্ত জটিল সমস্যা, সমস্ত নতুন অনিশ্চয়তামূলক পরীক্ষা, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ, মানবকল্যাণের পরস্পর বিরোধী আদর্শ অতিসূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন।

'আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৩০):

ইংরেজের জাতীয় সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইউরোপ প্রবাসী লেখক বলেছেন— "সবচেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতি কাজে সংযুক্ত থেকে নারী ও নরের এক স্রোতে ভাসা।"[৬৫] তিনি আরও জেনেছেন— "ইংরেজ নারী চিরদিনই স্বাধীন মনস্ক, শক্ত মনস্ক। ইংরেজ পুরুষও তাই। গুরুজনের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলিয়ে দেওয়া তার দ্বারা কোন যুগে হয়নি।"[৬৬] এই পটভূমিতেই তিনি জেনেছেন– "মহাযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপে cult of joy এর চর্চ্চা বেড়েছে। যুবকরা জেনেছে যেকোন দিন দেশের ডাকে প্রাণ দিতে হবে ... । সুতরাং যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ হাস। যুবতীরা জেনেছে পুরুষ সংখ্যার স্বল্পতা বশতঃ মাতৃত্ব অনেকের ভাগ্যে নেই। সুতরাং যতটুকু পাই, হেসে লব তাই।"[৬৭]

এই উপলব্ধির ফসল তাঁর 'আগুন নিয়ে খেলা'(১৯৩০) উপন্যাসটি। যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সমাজে অবক্ষয়ের মধ্যে সে দেশের নরনারীর প্রেমে প্রকাশ পেয়েছে শুধু যৌবন চাঞ্চল্য। কিন্তু সে প্রেম একেবারেই সুষমাহীন। 'আগুন নিয়ে খেলা' এই প্রেমেরই রূপরেখা। ইউরোপ প্রবাসী লেখক বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পরাধীন ভারতবাসীর, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের সঙ্গে সমকালীন ইংরেজদের মানসিকতার যে পার্থক্য দেখেছিলেন তারই প্রতিফলন ঘটেছে এখানে। এই প্রসঙ্গে লেখক এক স্থানে বলেছেন, "একটা সহজ অনুভূতি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সমস্কন্ধের মতো মেশা। কোন ব্রাহ্মণের কাছে নত শির থাকতে হয় না, কেন দারোগার কাছে বুকের স্পন্দন গুনে চলতে হয় না, কোন মনিবের কাছে মাটিতে মিশে যেতে হয় না, মানুষ্য মর্যাদা গর্বে প্রত্যেকটি মানুষ গর্বিত। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলে এই মুক্ত মানসিকতার অভাব সমস্ত মন দিয়ে বোধ করব।"[৬৮]

অসমাপিকা:

বিলেতে যারা গেছেন পোশাক সাজসজ্জায় এসেছে অনেকেরই সাহেবিয়ানা। শীত বেশি থাক আর না থাক শরীরে কাপড় বেশি পরিধান করা প্রগতির পরিচায়ক। সুচারু বিলেত থেকে সাহেবি পোশাকে ফিরলেও সে বঙ্গদেশেরই ছেলে। বাঙালি সংস্কৃতি জগতে পিতৃভক্ত সন্তান— "ট্রেন থেকে যখন তার বাবা নামলেন সুচারু সাহেবি পোশাক বাঁচিয়ে কোনোমতে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। বাবার গাম্ভীর্য্য অর্দ্ধেক কমে গেলো। না, ছেলে এখনো তেমনই পিতৃভক্ত আছে, সাহেবদের মতো হাত বাড়িয়ে দেয়নি।"[৬৯]

কন্যা:

ভারতের অনেক বাঙালি পরিবার বিলেতে থাকেন। বিলেতে ভারতীয় ছাত্রদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য পার্টির আয়োজন করা হয়। সকলে মিলে মিশে আনন্দ করবে। বিলেতে অনেক ভাষাভাষীর বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ। বাঙালি মেয়েরা বাংলাদেশে যেমন পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে দূরত্ব বজায় রাখতে চায়

ইংল্যান্ডে এই দূরত্বের গণ্ডী থাকে না। ‘কন্যা’ উপন্যাসে ইংল্যান্ডে বড় হওয়া ঊর্মিলা অবাধে সকলের সঙ্গে মিশেছে। সুজনও তিনজন মেয়ের সঙ্গে মন দেওয়া নেওয়া করেছে, শিখেছে বিদেশি ভাষাও— “সুজনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় তাঁদের তিনজনের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ক্রমে মন জানাজানির পর্যায়ে পৌঁছিল। মন দেওয়া নেওয়া নয় কিন্তু। তার বেলা সুজন অতি সজাগ। ঊর্মিলা তাকে সোজাসুজি সুজন বলে ডাকত। বরাবরই ইংল্যান্ডে মানুষ হয়েছে। বাঙালী মেয়েদের মতো দূরত্ব বজায় রেখে চলতে জানে না। সিভিয়া তাকে আরও ছোট করে জন বলে ডাকে। সেও বলে সিল্‌ভি। ইংরেজের মেয়ে, কিন্তু বাংলাদেশে জন্ম। বেশ বাংলা বলে। অনেকটা বাঙালি মেয়ের মতো হাবভাব। এরা দু’জনে কুমারী। আর ম্যাদলীনা বিবাহিতা। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে থিয়েটারে দেখা হত। ফরাসী মহিলা, বয়সে বড়। ভদ্রতা করে সুজন তাঁকে তাঁর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিতেন। তাঁর স্বামী দরজা খুলে দিতেন। তাঁর সঙ্গে এক পেয়ালা কালো কফি না খেলে তিনি ছাড়তেন না। তাঁর ধনুর্ভঙ্গ পণ তিনি ইংরেজি বুলি বলবেন না, আর কেউ বললে বুঝবেন না। অগত্যা সুজনকে ফরাসী শিখতে হয়।”[৭০]

অন্নদাশঙ্করের প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলি হল ‘অসমাপিকা’ (১৯৩০), ‘আগুন নিয়ে খেলা’ (১৯৩০) ও ‘পুতুল নিয়ে খেলা’ (১৯৩৩)। এই উপন্যাসগুলিতে আমরা মানব জীবনের ছোটখাটো সুখদুঃখ, সমস্যা ও অসঙ্গতির চিত্র প্রতিফলিত হতে দেখি। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালের অবক্ষয় ও মানুষের মনের দ্বিধা-সংশয়ের সংহত ও ব্যাপক ছবির প্রথম প্রকাশ তাঁর ‘আগুন নিয়ে খেলা’ উপন্যাসে দেখা গেলেও তার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে ‘সত্যাসত্য’ (ছয়টি খণ্ড) উপন্যাসের মধ্যে। সত্যের বা সত্য সন্ধানের কোন সুনির্দিষ্ট দেশকাল থাকতে পারে না। তাই ‘সত্য’ ও ‘অসত্যে’র রহস্য সন্ধানে আগ্রহী লেখক তাঁর উপন্যাসের সীমা বঙ্গদেশকে অতিক্রম করে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তার করে দিয়েছেন। কারণ ব্যক্তি-মানুষের চিন্তা ভাবনা ও মননের সম্যক পরিচয় পরিস্ফুটনে ইউরোপের পরিবেশ অধিকতর উপযোগী ছিল। আর এই পটভূমিকায় উপন্যাসে এসেছে যুগ্ম নায়ক— বাদল ও সুধী এবং নায়িকা উজ্জয়িনী।

বাদলকে দেখি, সমগ্র উপন্যাসে জুড়ে সে মুক্ত জীবনের সন্ধান করেছে বুদ্ধিবাদীদের মত নেতি নেতি বিচারের মধ্য দিয়ে। কখনও গণতন্ত্র, কখনও আনারকিজম্, কখনও মিষ্টিসিজম, কখনও বা কম্যুনিজম্— একেকটি বিশ্বাসকে একেকবার সে আকড়ে ধরতে চেয়েছে, কিন্তু পরক্ষণে সে নিজেরই আর একটি বুদ্ধি ও বিচারের আঘাতে পূর্বের বিশ্বাসকে ভেঙে ফেলে দিয়ে নতুন বিশ্বাসের জগতের সন্ধানে ছুটেছে। শেষ পর্যন্ত কোন বিশ্বাসেই সে গভীর নিষ্ঠায় সঙ্গে আত্মস্থ করতে পারেনি, জীবনের দ্বন্দ্বেরও অবসান ঘটেনি। বাদল তাই জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে স্বীকার করেছে— 'আমার বাইরে দ্বন্দ্ব, ভিতরে দ্বন্দ্ব, আমি ভাসতে ভাসতে কোথায় গিয়ে পড়ছি নিজেই জানিনে। ... drift করছি অচিহ্নিত সাগরে।'[৭১] বাদলের কল্পিত সমাজ-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রগতি পথের প্রায় সব বিশ্বাসই একে একে লুপ্ত হলে তার বেঁচে থাকা অসম্ভব ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাই উপন্যাসের শেষ খণ্ড 'অপসরণ'-এ বাদলে মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে। লেখক মৃত্যুর কারণ নিয়ে বলেছেন— 'বাদলের মতো ইন্টেলেক্টসর্বস্ব মানুষের পক্ষে নেতিবাদই মরণের হেতু। একে একে যার সব বিশ্বাস গেছে সে কী নিয়ে বাঁচবে!'[৭২] বাদল ইন্টেলেক্টের পথ গ্রহণ করাই শেষ পর্যন্ত কোন আশ্রয় খুঁজে পেল না।

উপন্যাসের অপর নায়ক সুধী তার জীবন ও চেতনায় অনেকাংশে বাদলের বিপরীত কোটিতে অবস্থান নিয়েছিল। সে স্থিরপ্রজ্ঞ সমগ্রতার সাধক ও দারুণভাবে আশাবাদী। তাই বাদল যখন হতাশায় ভেঙে পড়ে অবিশ্বাসের সুরে বলে—'সমাজ সংসারে মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব', তখন সুধী বাদলের কাঁধে গভীর প্রত্যয়ের বলেছে—'কিছুই মিছে নয়। সমাজ সংসার জীবন আত্মা পরলোক সবই সত্য।' এই কল্পনা ও বাস্তবের, সত্য ও অসত্য উভয়েরই আকর্ষণে অনবরত দ্বিধায় দোলে উপন্যাসের নায়িকা উজ্জয়িনী। তাই উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক বলেছেন— 'সে যেন সংকটারূঢ় মানবাত্মা।'

পরিশেষে বলতে পারি, 'সত্যাসত্য' প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের মানুষের জীবন জিজ্ঞাসার সুদীর্ঘ আলেখ্য। আর এই জীবনের তাৎপর্য ও রহস্য সন্ধানে বাদল, সুধী ও উজ্জয়িনী যে যাত্রা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আশা-হতাশার বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তা আসলে এ যুগের সমস্ত জীবনসন্ধানী সকল মানুষেরই অভিজ্ঞতা।

উৎস নির্দেশ:

১. মল্লিক, সন্দীপন, *অন্নদাশঙ্কর রায় সাহিত্য ও প্রসঙ্গিক ভাবনা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ৪

২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫

৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৭

৪. রায়, অন্নদাশঙ্কর, *পথে প্রবাসে,* পেপার ব্যাক সংস্করণ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা- ১৬৬

৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭২

৬. রায়, অন্নদাশঙ্কর, *পথে প্রবাসে,* পেপার ব্যাক সংস্করণ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা- ২৯

৭. রায়, অন্নদাশংকর, *অন্নদাশংকর রায়ের রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড),* বাণী শিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, সত্যাসত্য, যার যেথা দেশ, ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত।

৮. তদেব

৯. রায়, অন্নদাশংকর, *অন্নদাশংকর রায়ের রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড),* বাণী শিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, সত্যাসত্য, পৃষ্ঠা- ২৫

১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭

১১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১

১২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৯

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬২

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৬২-৬৩

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৩

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৫

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৪

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৮

২০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৯

২১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৬

২২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০১

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৬

২৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৩

২৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩২

২৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪১

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৩

২৮. রায়, অন্নদাশংকর, *অন্নদাশংকর রায়ের রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড),* বাণী শিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, সত্যাসত্য, পৃষ্ঠা- ২৪৯-৫০

২৯. তদেব, পৃষ্ঠা-২৫৯

৩০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২

৩১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৪৪

৩২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৫৫

৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮৬

৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮৯

৩৫. রায়, অন্নদাশংকর, *অন্নদাশংকর রায়ের রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড),* বাণী শিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, সত্যাসত্য, পৃষ্ঠা- ২২

৩৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯১

৩৭. রায়, অন্নদাশংকর, *অন্নদাশংকর রায়ের রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড),* বাণী শিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, সত্যাসত্য, পৃষ্ঠা- ২৩০

৩৮. তদেব, পৃষ্ঠা-২৪৩

৩৯. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬২

৪০. তদেব, পৃ ২৮৬

৪১. তদেব, ৩৪২

৪২. তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৬

৪৩. রায়, অন্নদাশংকর, *অন্নদাশংকর রায়ের রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড),* বাণী শিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, সত্যাসত্য, পৃষ্ঠা- ৩৮

৪৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮

৪৫. তদেব, পৃ ৪৩

৪৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৩

৪৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৬

৪৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৮

৪৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৩

৫০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৩

৫১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৬

৫২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৬

৫৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৮

৫৪. রায়, অন্নদাশংকর, *অন্নদাশংকর রায়ের রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড),* বাণী শিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, সত্যাসত্য, পৃষ্ঠা-১৯৬

৫৫. তদেব, পৃষ্ঠা-২২৯

৫৬. তদেব, পৃষ্ঠা-২৪১

৫৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১

৫৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩০

৫৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩৩

৬০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩৬

৬১. সত্যাসত্য, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৫

৬২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৭,১২৮

৬৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২

৬৪. রায়, অন্নদাশংকর, *অন্নদাশংকর রায়ের রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড),* বাণী শিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, সত্যাসত্য, ১ম খণ্ড, যার যেথা দেশ, পৃষ্ঠা- ১৭১

৬৫. রায়, অন্নদাশঙ্কর, *পথে প্রবাসে,* পেপার ব্যাক সংস্করণ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা- ২৯

৬৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩১

৬৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৮-৬৯

৬৮. রায়, অন্নদাশঙ্কর। *পথে প্রবাসে* । পেপার ব্যাক সংস্করণ। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা- ২৯

৬৯. রায়, অন্নদাশংকর, *অন্নদাশংকর রায়ের রচনাবলী (প্রথম খণ্ড),* বাণী শিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১২৯

৭০. রায়, অন্নদাশংকর, *অন্নদাশংকর রায়ের রচনাবলী* (ষষ্ঠ খণ্ড), বাণী শিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, 'কন্যা', পৃষ্ঠা- ১৪৭

৭১. রায়, অন্নদাশংকর, *অন্নদাশংকর রায়ের রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড),* বাণী শিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, সত্যাসত্য, অপসরণ, পৃষ্ঠা-২৮৪

উপসংহার

উপসংহার

সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে বাংলা কথাসাহিত্যে ইউরোপীয় প্রভাবের ধরণ ধারণও। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে বাঙালির মানসপটে যে পরিবর্তন শুরু হয় তা পূর্ণতা পায় বিশ শতকের প্রথমদিকে বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে। উনিশ শতকের প্রচলিত মূল্যবোধ ও বিশ শতকের সংশয়, সন্দেহ, জীবন জিজ্ঞাসা ও যুক্তির দাবি ইত্যাদির বাঙালির মন ও মানসিকতায় প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্র বিরোধী হলেও শতাব্দীর শেষ নাগাদ সমাজের চোখে তা মোটামুটি গ্রহণ যোগ্য হয়ে ওঠে এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে থেকে বিলাত যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ বিলাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে বিশ শতক বা এই শতকের মাঝামাঝি সময়ে শুধু বাঙালি পুরুষরা নন, বাঙালি মেয়েরাও বিলাত প্রবাসী হয়ে সেখানে পড়াশুনার শেষে সেদেশেরই সহপাঠীর সঙ্গে ঘরও বেধেছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিলেত তথা ইউরোপ আর সাত সমুদ্রের দূরত্ব বলে মনে হয়নি। কারণ বিলাতে বাঙালি পড়াশুনা ও চাকরির পাশাপাশি বিভিন্ন জীবিকার্জনের জন্য নিয়মিত যাতায়াত করেছেন।

অন্যদিকে, এই সময়ে বিশ্বযুদ্ধের নানা পরোক্ষ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ভারতভূমিতে পড়ে কারণ ভারত তখন ব্রিটিশ শাসিত উপনিবেশ। এই সময় ইউরোপীয় রাজনীতি ও বিশ্বযুদ্ধ বাঙালির রাজনৈতিক জীবনে কালান্তরের আভাস বয়ে আনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সমগ্র ইউরোপের জনমানসে হতাশা, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা নিয়ে এসেছিল। এরই প্রতিফলন ঘটেছিল যুদ্ধোত্তর ইউরোপের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। এর পরোক্ষ প্রভাবে ব্রিটিশ ভারতের তরুণ বাঙালির মনন-মেজাজে ঘনীভূত হয় হতাশা ও অস্থিরতা, অথচ রোমান্টিক আবেগদৃপ্ত যুদ্ধোত্তর ইউরোপে শিল্পী মনে এনেছিল নতুন সৃষ্টির প্রেরণা। ফলে ইংল্যান্ডের এতদিনের প্রচলিত পুরনো উদারনৈতিক চিন্তাধারা, পার্লামেন্টারী শাসন প্রণালী, ব্যক্তিজীবন, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, শ্রমিকদল, কমিউনিজিম্ ইত্যাদি একাধিক তত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সহচর্যে বাঙালির

ব্যক্তিসত্তা আন্দোলিত বিবর্তিত হয়েছে। ইউরোপীয় রাজনীতি, প্রথমবিশ্বযুদ্ধ এবং অব্যহিত পরে রুশ বিপ্লবের ফলে ইউরোপের বুর্জোয়া সমাজের ভিত টলে যায় ও অর্থনীতিতে প্রবল চাপ পরে। এই অর্থনীতি কাঠামোর সঙ্গে সেখানকার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হওয়ায় মানুষের মনে দেখা দেয় সংশয়, হতাশা, দোলাচলতা। তাই দোলাচলতার মধ্যে থেকে তাদের লড়াই চলতে থাকে, সারাজীবনে ভিতরে ও বাইরে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে আমরা বিশ্বযুদ্ধ অভিঘাতের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ প্রত্যক্ষ করি।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, ইউরোপের প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য তার সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে বাইরের বিশ্বকে প্রাণভরে স্বাগত জানিয়ে বাঙালিত্ব বনিয়াদের উপরে গড়তে তুলতে চেয়েছিল নতুন ধরনের ইমারত।

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ:

আনিসুজ্জামান (সম্পা.)। *ত্রৈলোক্যনাথ রচনা সংগ্রহ* (ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)। সাহিত্য প্রকাশ। ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ২০০১

চক্রবর্তী, যোগজীবন (প্রকাশক)। *বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ,* (দ্বিতীয় খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৮২

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। *কৃষ্ণকান্তের উইল*। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৪৭

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। *রজনী* । সজনীকান্ত দাস (সম্পা.)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৪৭

চৌধুরী, প্রমথ।*গল্পসংগ্রহ*। সুনীলকুমার সরকার (প্রকাশক)। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৪১২

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ।*গল্পগুচ্ছ*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৪১৮

দাশগুপ্ত, ধীমান (সম্পা.)। *অন্নদাশংকর রায়ের রচনাবলী* (১-৬ খণ্ড)। বাণীশিল্প। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭

দাশগুপ্ত, সুরজিৎ(সম্পা.)। *প্রেমেন্দ্র মিত্র শতবার্ষিকী সংকলন* । মিত্র ও ঘোষ পার্বলিশার্স প্রা: লি:। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৪১০

দে, সুধাংশুশেখর (সম্পা.)। *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড)। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০৬

দে, সুধাংশুশেখর (সম্পা.)। *বঙ্কিম রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড)। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০৬

দেবী, স্বর্ণকুমারী। *কাহাকে*। সুদক্ষিণা ঘোষ (ভূমিকা)। দে'জ। কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২

বসু, রাজশেখর। *পরশুরাম গল্পসমগ্র* । দীপংকর বসু (সম্পা.)। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৯

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পা.)। *কল্লোল গল্পসমগ্র-৩*। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০১০

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পা.)। *কল্লোল গল্পসমগ্র-৪*। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪১৮

মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ। *ত্রৈলোক্য রচনাবলী – ২*। সাহিত্যম্। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০৫

মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রনাথ। *সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী* (চতুর্থ ভাগ)। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির। কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩২২

রায়, দিলীপকুমার। *তরঙ্গ রোধিবে কে?* । গ্রন্থম্। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬

রায়, দিলীপকুমার। *দোলা* । গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫

রায়, দিলীপকুমার। *দু-ধারা* । গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪২

রায়, দিলীপকুমার। *বহুবল্লভ* । গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪২

রায়, দিলীপকুমার। *মনের পরশ* । ভারতবর্ষ, পত্রিকা প্রকাশ ১৩৩২

সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার। *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী,* (দ্বিতীয় খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯

বাংলা সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

আলী, সৈয়দ মুজতবা। *চাচা কাহিনী* । নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৮১৭

আলী, সৈয়দ মুজতবা। *দেশে বিদেশে* । নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৪২২

গঙ্গোপাধ্যায়, উজ্জ্বল। *পরশুরামের গল্প: দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়* । পুস্তক বিপণি। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ: ২০১১

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। *সাহিত্যে ছোটগল্প* । মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা। সপ্তম মুদ্রণ ১৮২৩

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। *বাংলা গল্প বিচিত্রা* । প্রকাশ ভবন। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৪২১

গরাই, মদন মোহন। *রামমোহন সময় জীবন সাধনা*। মানসী প্রেস। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৭৩

গুপ্ত, ক্ষেত্র। *কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী* । গ্রন্থ নিলয়। কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৭০

গুপ্ত, ক্ষেত্র। *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (১-৬খণ্ড)। গ্রন্থ নিলয়। কলকাতা। চতুর্থ সংস্করণ ২০১৩

ঘোষ, বিনয়। *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০*। প্রকাশ ভবন। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮

ঘোষ, বারিদবরণ। *রচনা সংগ্রহ দিলীপ কুমার রায়*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ১৯৯৭

ঘোষ, শঙ্খ। আচার্য, নির্মল। *সতীনাথ ভাদুড়ী গ্রন্থাবলী- ৪* । অরুণা প্রকাশণী। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৭৯

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার। *ইউরোপ* । মিত্রালয়। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০১

চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পা.)। *দিলীপ কুমার রায় স্মৃতি বিস্মৃতির শতবর্ষ* । ধূপদ। কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

চক্রবর্তী, স্বপন। *বাঙালির ইংরেজি সাহিত্যচর্চা* । অনুষ্টুপ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০৬

চৌধুরী, অমিতাভ। *অদ্বিতীয় রাজশেখর*। এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০১

চৌধুরী, নাজমা জেসমিন। *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*। চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮০

চৌধুরী, প্রমথ। *আত্মকথা*। দি বুক এম্পরিম লিমিটেড। কলকাতা। ১৯৪৬

চৌধুরী, ভূদেব। ছোটগল্পের কথা। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৪

চৌধুরী, ভূদেব।*বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার*। মর্ডান বুক এজেন্সি। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৬২

চৌধুরী, ভূদেব। *বাংলাসাহিত্যে নবজাগরণ ও রামমোহন*। সাহিত্যশ্রী। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৮৪

চৌধুরী, রাজীব। *বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা পাঠ ও পরিগ্রহণে*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০১৪

জানা, নরেশ চন্দ্র (সম্পা.)। *আত্মকথা* । অন্যান্য প্রকাশন। কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৮১

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *কালান্তর* । বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। কলিকাতা। পুনর্মুদ্রণ ১৩৯০,

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতি। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। কলকাতা। তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৬

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *ভারত পথিক রামমোহন রায়* । রেডিয়্যান্স। কলকাতা। রবীন্দ্র সার্ধশত বর্ষ সংস্করণ ২০১০

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সাহিত্য* । বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। কলকাতা। ১৩৪৪

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সংগীত চিন্তা*। কলিকাতা। বিশ্বভারতী, ১৩৭৩

ত্রিপাঠী, অমলেশ। *ইতালীর র‍্যনেশাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪

ত্রিপাঠী, অমলেশ।*স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাভেট লিমিটেড। কলকাতা। প্রথম সংস্করণ ১৩৯৭

দত্ত, বীরেন্দ্র। *বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ* । পুস্তক বিপণি। কলকাতা। প্রকাশ ১৯৮৫

দাশগুপ্ত, অশীন। *প্রবন্ধ সমগ্র* । ইতিহাস ও সাহিত্য। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০১

দাশ, বুদ্ধদেব। *শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়* । পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৩

দাশ, শিশিরকুমার। *বাংলা ছোটগল্প (১৮৭৩-১৯২৩)*। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩

দাশগুপ্ত, প্রফুল্ল কুমার। *উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম* । প্রজ্ঞাবিকাশ। কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ ২০১০

দাশগুপ্ত, ধীমান (সম্পা.)। *ইউরোপের চিঠি*। অন্নদাশংকর রায়ের রচনাবলী। (প্রথম খণ্ড) অন্নদাশংকর রায়। বাণীশিল্প। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭

দাশগুপ্ত, ধীমান(সম্পা.)। *প্রবন্ধ সমগ্র (১-৬খণ্ড)*। অন্নদাশঙ্কর রায়। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রঃ লিঃ। কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৪০৫

দাশগুপ্ত, রাহুল। *উপন্যাসকোশ* (১৮২৫-২০১৫)। প্রতিভাস। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০১৫

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *বাঙালা সাহিত্যের একদিক*। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৫১

দাস, সুনীল। *ভারতী ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী* । সাহিত্যলোক। কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪

দে, সত্যব্রত। *রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা* । প্রজ্ঞাবিকাশ।কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ ২০১৫

নন্দী, রতনকুমার। *রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা*। বঙ্গীয় সাহত্য সংসদ। কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ ২০১৫

পালিত, চিত্তব্রত। *ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ চিত্র* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০৭

পাল, রবিন। *উপন্যাস তত্ত্ব কিছু কথা* । এবং মুশায়েরা। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০১৯

পাল, রবিন। *কল্লোল কালিকলমের ছোটগল্প* । আশাদীপ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০১৪

পাল, রবিন। *কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ* । শ্রীভূমি পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৮০

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। *চিন্তা বিচিন্তা* । পুস্তক বিপণি। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। *পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন (প্রথম খণ্ড)* । মঞ্জুসা। কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবদ্যুতি। *মণীশ ঘটক*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র। *জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী- ২,* (স্বস্তি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত)। বাগর্থ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৭১

বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র। *রবিরশ্মি* । দে বুক স্টোর। কলকাতা। প্রকাশ ১৯৩৯,

বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর। *পলাশি থেকে পার্টিশন আধুনিক ভারতের ইতিহাস* । ওরিয়েন্ট লংম্যান। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* । মডার্ণ বুক এজেন্সি। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৫৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। *সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১-৫ খণ্ড)।* সজনীকান্ত দাস (সম্পা.)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০১৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ২০১২

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত। *গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে* । বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৪১২

বসু, দেবকুমার। *কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য* । করুণা প্রকাশনী। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৮০

বসু, বুদ্ধদেব। *আমার ছেলে বেলা*। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৬০

বসু, বুদ্ধদেব। *সাহিত্যচর্চা* । দে'জ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪

বিশ্বাস, দিলীপ কুমার। *রামমোহন সমীক্ষা*। সারস্বত লাইব্রেরী। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮৩

বিশী, প্রমথনাথ। *বাংলা সাহিত্যের নরনারী*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬

ভট্টাচার্য, জগদীশ। *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প*। বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলকাতা। প্রথম সংস্করণ ১৩৫৯

ভট্টাচার্য, জগদীশ। *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী*। ভারবি। কলকাতা। তৃতীয় প্রকাশ ২০১৮

ভট্টাচার্য, দেবীপদ। *উপন্যাসের কথা*। জি. এ. ই. পাবলিশার্স। প্রথম প্রকাশ মে ১৯৬১

ভূইয়া, মোঃ শিহাব উদ্দিন। *বংলার নবজাগরণ*। দি ইউনিভার্সেল একাডেমি বাংলা বাজার। ঢাকা প্রথম প্রকাশ ২০১৬

মজুমদার, রমেশচন্দ্র। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। (তৃতীয় খণ্ড, আধুনিক যুগ)। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮১

মজুমদার, সমরেশ। *বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর*। রত্নাবলী। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬

মিত্র, প্রেমেন্দ্র। *কল্পবিজ্ঞান সমগ্র*। সুরজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা.)। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০১৩

মিত্র, প্রেমেন্দ্র। *বাংলা ছোটগল্পের সূচনা ও প্রেমেন্দ্র মিত্র* (সম্পা. সুরজিৎ দাশগুপ্ত)। দে'জ পাবলিশার্স। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০৬

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। *বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০৪

মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ। *আমার ইউরোপ ভ্রমণ* । পরিমল গোস্বামী (অনুবাদ)। নব গ্রন্থনা। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৮২

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। *রবীন্দ্র-জীবনী* ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক (তৃতীয় খণ্ড)। বিশ্বভারতী। শান্তিনিকেতন। প্রথম প্রকাশ ১৩৪৩

মুখোপাধ্যায়, মীনাক্ষী। *উপন্যাসের অতীত ইতিহাস ও কল্পইতিহাস*। থীমা। কলকাতা। প্রকাশ ২০০৩

মুখোপাধ্যায়, সুখময়। *রবীন্দ্রসাহিত্যে নবরাগ*। ভারতী বুক স্টল। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৬১

মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রনাথ। *পরদেশী*। (প্রকাশক শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়)। ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩২৪

মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রনাথ। সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী (চতুর্থ ভাগ)। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির। কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩২২

মুখোপাধ্যায়, শক্তিসাধন। *ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস*। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০৫

মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমার। *আবার ইউরোপ* । মেঘমল্লার। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩

মণ্ডল, স্বস্তি। *মণীন্দ্রলাল বসু* । পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

মল্লিক, সন্দীপন। *অন্নদাশঙ্কর রায় সাহিত্য ও প্রসঙ্গিক ভাবনা* । বাংলা একাডেমী। ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪

মুরশিদ, গোলাম। *আশার ছলনে ভুলি* । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ। কলকাতা। পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৬

মুরশিদ, গোলাম। *কালাপানির হাতছহানি বিলেতে বাঙালির ইতিহাস* । অবসর। ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ২০০৮

মৈত্র, সুরেশচন্দ্র। *মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবন ও সাহিত্য* । ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। নয়াদিল্লি। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ ২০১৭

রায়, অলোক। *বাংলা উপন্যাসের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি* । অক্ষর প্রকাশনী। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০০

রায়, অলোক (সম্পা.)। *সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য* । সাহিত্যলোক। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ-২০১৫

রায়, অন্নদাশঙ্কর। *পথে প্রবাসে*। পেপার ব্যাক সংস্করণ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৩১

রায়, অন্নদাশঙ্কর। *বাংলার রেনেসাঁস* । ডি এম লাইব্রেরী। কলকাতা। প্রথম প্রকশ ১৯৭৪

রায়, তীর্থংকর। *ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস* । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। প্রথম আনন্দ সংস্করণ ২০১৩

রায়, দিলীপকুমার। *স্মৃতিচারণ* । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৬

রায়, বিনয়ভূষনণ। *জেমস্ লঙ ও তৎকালীন বাঙালি সমাজ* । অনুষ্টুপ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০১৩

রায়, রথীন্দ্রনাথ। *বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী* । জিজ্ঞাসা। কলকাতা। ১৯৬৯,

রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ। *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৮০

রায়চৌধুরী, তপন। *ইউরোপ পুনদর্শন* । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০১৫

শাস্ত্রী, শিবনাথ। *ইংল্যান্ডের ডায়েরি* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। সেপ্টেম্বর ২০০৩

শাস্ত্রী, শিবনাথ। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* । বারিদবরণ ঘোষ, (সম্পা.)। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি.। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ- ১৯০৪

শ্রীপান্থ। *শ্রীপান্থের বিলাত দর্শন* । গ্রন্থ প্রকাশ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৭৭

সান্যাল, প্রবোধ কুমার। *পর্যটকের পত্র* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭

সান্যাল, হিরণকুমার। *পরিচয় এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতি*। প্যাপিরাস। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৮২

সেন, দীনেশচন্দ্র। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (প্রথম খণ্ড)। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। কলকাতা। চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৭

সেন, দীনেশচন্দ্র। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (দ্বিতীয় খণ্ড)। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (সম্পা.)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ ২০০২

সেন, দীনেশচন্দ্র। *বৃহৎবঙ্গ* (প্রথম খণ্ড)। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫

সেন, সীমন্তী। *কৃষ্ণভাবিনী দাসের ইংল্যাণ্ডে বঙ্গমহিলা* । স্ত্রী। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (পঞ্চম খণ্ড)। আনন্দ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮

সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার। *কল্লোল যুগ* । এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭,

সমাদ্দার, ডঃ ভাস্বতী। *বাংলা উপন্যাসের পালাবদল (১৯৬৬-১৯৭৮)* । পুস্তক বিপণি। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪

সরকার, সুমিত। *আধুনিক ভারত(১৮৮৫-১৯৪৭)*। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫

সিংহরায়, জীবেন্দ্র। *কল্লোলের কাল* । কথাশিল্প। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩

সিংহরায়, জীবেন্দ্র। *প্রমথ চৌধুরী* । মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ। কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ ২০১২

হাসান, বদরুল। *উনিশ শতক: নবজাগরণ ও বাঙ্‌লা উপন্যাস*। জগৎমাতা পাবলিশার্স। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯০

হালদার, গোপাল। *বাংলা বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা* (দ্বিতীয় খণ্ড)। অরুণা প্রকাশনী। কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ ১৪০৪

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

Das And Chattopadhyay, Suranjan Basudeb. ‘EUROPE AND THE HUGHLI: The European Settlements on The West Bank of the River’, K P Bagchi & Company: 2014, Kolkata 12

Mukharji, T. N. ‘A visit to Europe’, Third Edition, Bangabasi Steam Machine Press, Calcutta, 1902.

Sen, Simonti. ‘Travels To Europe: Self and Other in Bengali Travel Narratives 1870-1910’, Orient Longman: First published 2005, New Delhi 110002.

পত্র-পত্রিকা পঞ্জি

অবভাস, (প্রবন্ধ সংকলন), পার্থ চক্রবর্তী (সম্পা.), কলকাতা, জানুয়ারি – মার্চ ২০০৫

কোরক, (বাংলা পত্রপত্রিকা), তাপস ভৌমিক (সম্পাদক ও সম্পাদনা), কলকাতা, সংখ্যা ২০১৭

পরিকথা, (সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা), দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), কলকাতা, দশম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ২০০৮

ভারতবর্ষ, (সচিত্র মাসিকপত্র), রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর (সম্পা.), ত্রয়োদশ বর্ষ- ১ম খণ্ড – ১ম সংখ্যা

পরিকথা, (বিশ শতাব্দীঃ বাঙালির মননচর্চা), (সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা), দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), কলকাতা, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ২০০১

ঐ, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০০২

প্রমা-৩২, (ত্রৈমাসিক পত্রিকা), অষ্টম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর

নবপর্যায় জিজ্ঞাসা, (বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ সংখ্যা), শিবনারায়ণ রায় (সম্পা.), চতুস্ত্রিংশ বর্ষ, প্রথম দ্বিতীয় সংখ্যা, রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৬ - ২০১৭

কথাসাহিত্যঃ (রাজশেখর বসু), ভট্টাচার্য, গৌরীশঙ্কর(সম্পা.), সংবর্ধনা সংখ্যাঃ শ্রাবণ, ১৩৬০